প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিন্টার্স
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীমনোজ বিশ্বাস

পনেরো টাকা

উৎসর্গ

শ্রীলা রমা চৌধুরী (ডি লিট্)

যে-যুগে বরণ করে অভিমানী বুদ্ধি সংশয়েরে
সত্যতীর্থপথে নিত্য পাথেয় ও পথিকৃৎ বলি',
বিজ্ঞানের আশীর্বাদে ভোগতন্ত্রী মন্ত্রণামোহেরে
শিবসুন্দরের দীক্ষা গণি' করে প্রণাম উচ্ছলি',

সে-যুগে বরবর্ণিনী তুমি, রমা, অন্তরে তোমার
করেছ অভিনন্দন পরমার্থ জানি', ভারতের
ভক্তি-জ্ঞানকর্ম সমন্বয়—আদর্শের অঙ্গীকার,
গাহিয়া দেবভাষায় : "দেবতাই পূজ্য আমাদের,

"জনে জনে তাঁরি পুণ্য বন্দনার প্রাপ্তি অধিকার,
নহে মায়া 'অল্পসুখ'—সুলভ ইন্দ্রিয়-উত্তেজন
জীবনের লক্ষ্য—ভূমানন্দ চিরপিপাসা আত্মার,
প্রাণ-আরোহিণী অভঙ্গুর, অন্তহীন, চিরন্তন।"

সার্থক তোমার নাম, শ্রীকরে তোমার উপহার
দিই তাই আমারো এ-কল্পনার কিঙ্কিণিঝঙ্কার ॥

তোমার নিত্যাশীর্বাদক দিলীপদা

(হরিকৃষ্ণ মন্দির, পুণা)

ভূমিকা

এ-রমন্যাসটি আমি লিখেছিলাম হরিদ্বারে আমার "গান প্রেম দেশ ভগবান্" উপন্যাসটির পরেই—১৯৪৬ সালে। এর পরে আমি আর একটি রমন্যাস লিখেছি "গল্প কিন্তু গল্প নয়" ১৯৪৭ সালে। পাঠকেরা অনেকে আমার রমন্যাস ভালোবাসেন ব'লে মনে হ'ল জীবনসন্ধ্যায় একটা পূর্ণ তালিকা দিলে হয়ত তাঁদের একটু সুবিধা হবে আমার দৃষ্টিভঙ্গির মর্মপরিগ্রহ করতে। (আমার রমন্যাসগুলির মধ্যে কয়েকটি ছাপা নেই, তবে আশা করি অদূর ভবিষ্যতে পুনর্মুদ্রিত হবে আমার জীবদ্দশায়ই।)

১) আমি প্রথম লিখি "অঘটন আজো ঘটে।" এর ইংরাজী ও গুজরাতী অনুবাদ বেরিয়েছে, মারাঠী অনুবাদ হচ্ছে।

২) অতঃপর লিখি "অঘটনের ঘটা।" এটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ।

৩) "অভাবনীয়।" প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ।

৪) "অঘটনের শোভাযাত্রা।" এতে বস্তুতঃ একখণ্ডে দুটি রমন্যাস পরিবেষিত হয়েছে, দ্বিতীয়টির নাম "অঘটনের সূত্রপাত।" শেষে "করুণা অলৌকিকী"-র আশ্চর্য ইতিহাস বিন্যস্ত হয়েছে।

৫) "অঘটনের সূত্রপাত।"

৬) "অঘটনের পূর্বরাগ।"

৭) "অঘটনী গল্পমালা।" নয়টি গল্পের শেষে "স্বামী প্রেমানন্দ" নাটকটি বিন্যস্ত হয়েছে একই খণ্ডে।

৮) "স্বামী প্রেমানন্দ।"

৯) "অশ্রুহাসি—ইন্দ্রধনু।"

১০) "ছায়াপথের পথিক।"

১১) "পতিতা ও পতিতপাবন।" (যন্ত্রস্থ)

১২) "গান প্রেম দেশ ভগবান্।" (ছাপা হবে)

এটি "ভাবি এক হয় আর"-এর উত্তরার্ধ। "ভাবি এক হয় আর" উপন্যাস। এটি রমন্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে। উপসংহার বলা চলে।

১৩) "প্রেম অভয়।" প্রথমার্ধ "অমৃত" পত্রিকায় বেরিয়েছিল।

১৪। "পাখা ও বাঁধন।" (ছাপা হবে)

এ-কথিকাগুলিকে রমন্যাস না ব'লে ধর্মোপন্যাস বললেও চলত, কিন্তু ভেবে চিন্তে আমি রমন্যাস উপাধিটিই মঞ্জুর করেছি কেন এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ধর্ম বলতে সাধারণতঃ মানুষ বোঝে আনুষ্ঠানিক ধর্ম যার ভিৎ লোকাচার বা জনশ্রুতি। কিন্তু ধর্ম বলতে বৈদিক ঋষিরা বুঝতেন আত্মিক উপলব্ধি— Spiritual experience: উপনিষদে আনুষ্ঠানিকতা বা আচারিপনার নাম গন্ধও নেই। গীতায় অল্প-স্বল্প আছে কিন্তু সেখানেও মুখ্যতঃ আত্মিক ধর্মেরই পাঠ দেওয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিকতার শাখা প্রশাখার প্রতিষ্ঠা হয় উত্তর বৈদিক যুগে, পুরাণে ও তন্ত্রে। ধর্মের এ-বাহ্য ধরাকাঠের মধ্যে ক্রমশঃ আচারনিষ্ঠতার বিকাশ হওয়ার ফলে অনেক দার্শনিক তথা সাধুসন্ত আনুষ্ঠানিকতার নানা চালচলনের বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ান যার ফলে জ্ঞানী ও অবধূতদেরই সবচেয়ে বেশি মান দেওয়া হ'ত যাঁরা কোনো শাস্ত্রীয় বিধান লোকাচার বা সংস্কারকেই মানতেন না কারণ এ-সব বিধিবিধানের সঙ্গে আত্মিক উপলব্ধির কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই। কিন্তু তাহ'লেও ধর্মের এই বাহ্য আইনকানুনেরও কিছু প্রয়োজন আছে। আচারিপনা শুচিবাই হ'য়ে দাঁড়ালে আত্মিক বিকাশের বাধা হ'য়ে দাঁড়ালেও আচারনিষ্ঠতার মধ্যে দিয়ে ধর্মের আত্মিক সৌরভ তথা গৌরবের আভাষ মেলে—বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে আচারী সাধক আচারের মাধ্যমে কিছুটা সংযমের দীক্ষা পেয়ে থাকেন যার মূল্য অনস্বীকার্য। ধর্মের এই বাহ্য প্রতিষ্ঠাকে খর্ব করা অনুচিত, যদিও আচারিপনা যখন শুচিবাই হ'য়ে দাঁড়ায় তখন তাকে সমর্থন করা চলে না, কারণ এ-যুগে মানুষ উত্তরোত্তর যে তীর্থলক্ষ্যের দিকে চলেছে তার অধিনায়ক প্রেমের তারক, আচারের শাসক নন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "সাবিত্রী" মহাকাব্যে গেয়েছেন:

My god is love and sweetly suffers all,
A traveller of the million roads of life

আমার ঈশ্বর প্রেম যে এ-জীবনের অগণন
পন্থে চলে চিরদিন হাসিমুখে সহিয়া সকলি।

আমার রমন্যাসগুলিতে আমি আমার বিবেকের গুরুনির্দেশে সাধ্যম'ত চেষ্টা করেছি আমার সাধনালব্ধ এই উপলব্ধিটিকে ফুটিয়ে তুলতে যে, আমাদের জীবনদেবতা "প্রেমনাথ" আত্মার পরমাত্মীয়, তাই তাঁকে সর্বান্তঃকরণে

ভালোবেসে তাঁর শ্রীচরণে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে না পারলে রকমারি যোগ-বিভূতি লাভ ক'রে যশস্বী হওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাঁর করুণার কোলে ঠাঁই পেয়ে সফল সাধন হওয়া যায় না যার কথা প্রহ্লাদ বলেছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ) :

কৃতকৃত্যোঽস্মি ভগবন্ ! বরেনানেন যৎ ত্বয়ি।
ভবিত্রী ত্বৎপ্রসাদেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥

আমি আজ ভগবান্, কৃতকৃত্য লভি' বরে তব
শুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তি বিষ্ণুমুখী, অব্যভিচারিণী।

পূর্ণ আত্ম-নিবেদনের এই নিটোল উপলব্ধিটিকেই বেদ ভূমার আনন্দ নাম দিয়েছেন, বৈষ্ণব মহাভাগবতেরা "বস্তুলাভ" ব'লে বর্ণনা করেছেন, গীতায় মহত্তম লাভ ব'লে বরণ করা হয়েছে : "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—অর্থাৎ যে-মহাপরিণতির পরে আর কোনো কিছুকেই মহত্তর ব'লে চিহ্নিত করা যায় না, যে-লাভের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়েছেন শিবশান্ত মহাপুরুষেরা —গেয়েছেন শঙ্করাচার্য তাঁর অনুপম "বিবেকচূড়ামণি"-তে :

শান্তো মহান্তো নিবসন্তি সন্তো বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তঃ
তীর্থা স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ ॥

মহাজন যাঁরা আসেন জুড়াতে তাপিতে মধুবসন্তবায়,
এ-ভবার্ণব তরি' আর্তেরে তারিতে অহৈতুকী কৃপায়।

এ কথার কথা নয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নানা বাণীমন্ত্রে—বিশেষ ক'রে তাঁর মহাকাব্য "সাবিত্রী"-তে—অপরূপ ঝঙ্কারে গেয়েছেন যে, ভগবান্‌কে পেয়ে শুধু ব্যক্তিগত জীবন্মুক্তিবর লাভ করলেই হবে না, চাইতে হবে ক্লিষ্ট জীবের শোকতাপের নিরসন ক'রে মর্ত্য জীবনকে "দিব্যজীবনে" (life divine-এ) রূপান্তরিত করতে। আমার প্রতি রমন্যাসেই পার্থিব জীবনের এই মহা উত্তরণকেই আমি দৈবী শক্তির সর্বোত্তম বরদান ব'লে ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াস পেয়েছি ভক্ত ভক্তিমতী তথা সাধুসন্তদের বরণীয় চরিত্র চিত্রণে।

* * *

স্নেহভাজন শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়ের কল্যাণেই "প্রেম অভয়" এত শীঘ্র প্রকাশিত হ'ল। তাঁকে সাধুবাদ দেই। ইতি।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

॥ এক ॥

সাধন চক্রবর্তীকে সবাই বলত "অজাতশত্রু"। একটু আশ্চর্য বৈ কি। ধনী পিতার ধনী পুত্র, বণিক্ মহলে খ্যাতিমান। থাকতেন উত্তর কলিকাতায় একটি রম্য নিলয়ে একমাত্র পুত্র প্রসাদ ও পুত্রবধূ নির্মলাকে নিয়ে। নানা কোম্পানির উপদেষ্টা হ'য়ে যখন আয় আরো বেড়ে গেল তখন দক্ষিণ কলিকাতায় গঙ্গার কাছে একটি ত্রিতল আরামনিলয় গড়লেন। উপরের তলায় পূজার ঘরে দুটি অনিন্দনীয় মর্মর-বিগ্রহ শ্বেত পাথরের—রাধা কৃষ্ণ। তেজস্বী পুরুষ, গুরুবাদে বিমুখ। বিপত্নীক হ'য়ে যেন আরো স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠলেন। পূজারী কী দরকার—নিজেই যখন ভক্ত পূজারী? "ভক্ত" অভিমানও দৃঢ়মূল। বলতেন প্রায়ই: "কী পেয়েছি ঠাকুরের কাছ থেকে? যা পাওয়া সবচেয়ে কঠিন—অভয়। জীবজন্তু ভয় পায় কথায় কথায়। তাই চেয়েছিলাম আমি সব আগে অভী হ'তে। ঠাকুর কল্পতরু—দিলেন বর, পেলাম অভয়।" মনভোলানো আত্মপ্রসাদ নয়, সত্যিই হ'য়ে উঠেছিলেন তিনি অকুতোভয়।

প্রসাদ পিতৃদেবকে দেবতার ম'ত ভক্তি করত। তাকে তিনি বললেন: কান্ত কবির একটি গান আছে—'ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়!' ঠিক কথা। সব আগে চাইতে হয় অভয়। কিন্তু শুধু চাইলেই হয় না, ক্রমাগত জপ করা চাই—ঠাকুরকে ভালোবাসলে শুধু অভয় নয়, মিলবে তাঁর বরাভয়। মানে, বর ও অভয়। বর—শরণাগতি, জ্যেষ্ঠ; অভয়—শরণাগতির ফলশ্রুতি, কনিষ্ঠ। প্রসাদ সানন্দেই জপ করত ত্রিসন্ধ্যায় বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের সুভাষিত:

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে
মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরান্তকাদি
ভয়ামি সর্বাণ্যপযান্তি তাত!

শ্লোকটি এত চমৎকার যে অনুবাদে একটি গান বেঁধে গুন গুন ক'রে গাইত :

যিনি) করেন আলোয় তাঁর দূর সব ভয়ের অন্ধকার,

হয়) যাঁর স্মরণে জন্মজরামরণভয়ও লয়,

তিনি) প্রেমের ঠাকুর যার হৃদয়ে করেন বিরাজ—তার

মনে) আসবে আবার বলো দেখি কেমন ক'রে ভয় ?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ত পিতৃদেবের উঠতে বসতে বলা : "গীতায় ঠাকুর বলেছেন তিনি 'পৌরুষং নৃষু'—মরদের মর্দানি। যে পুরুষের মধ্যে পৌরুষ নেই তার নাম কাপুরুষ, 'কাওয়ার্ড'—যেমন যে-মেয়ের মধ্যে পতিভক্তি নেই তার নাম অসতী।" সাধন চক্রবর্তী যাই বলতেন এমনি গাজোয়ারি ঢঙেই বলতেন। শেষে একদিন কথায় কথায় প্রসাদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল—সত্যিই কি তিনি ভয়কে জয় করেছেন ? উত্তর পেয়েছিলেন : "একশোবার।"

প্রসাদ : এক আধটা দৃষ্টান্ত দিন না বাবা !

সাধন : চোখ খুলে রাখলে দেখতে পাবিই পাবি।

প্রসাদ : কিন্তু কাপুরুষের কলঙ্ক কি অসতীর কলঙ্কের চেয়েও সাংঘাতিক বলতে চান আপনি ?

সাধন : নিশ্চয়ই। কারণ ভগবান নিষ্ঠুর নন—তাই কলঙ্কিনীকেও আত্মশোধন করার সুযোগ দেন, কিন্তু কাপুরুষের গ্লানির কাটান নেই নেই নেই।

এ-হেন পিতার সুপুত্র হ'য়ে প্রসাদ দিনে দিনে নির্ভীক হ'য়েই গ'ড়ে উঠেছিল। অবশ্য ছেলেবেলায় সে ভয় পেত বৈকি। কিন্তু সাধন ঠাকুর আদৌ আমল দিতেন না পুত্রের ত্রস্তভাবকে। নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেন নানা গ্রামের শ্মশানে মশানে রাতের অন্ধকারে—বিশেষ যেখানে ভূতের ভয়। বলতেন সব্যঙ্গে : "যে-সব গুজব শুনিস ভূত প্রেতের—সব ভয়কাতুরে কল্পনার প্রলাপ। এ-সংসারে রোগ শোক অপঘাত আছে কিন্তু ভূত প্রেত দৈত্য দানা হ'ল মেঘে-গড়া হাতী ঘোড়া। ঐ দেখ্—ঐ গাছটার ডালপালা চক চক করছে চাঁদের একফালি আলোয়। কাপুরুষের দল এর মধ্যে দেখে পেত্নীর শাড়ী। আর একটা কথা : আমি তোকে এর পরে একলাই শ্মশানে মশানে পাঠাব—তোকে সঙ্গে ক'রে আনাটা হ'ল তারই মহলা—ভয়-কাটানোর দীক্ষা। আরো একটা কারণ—ভয়ের মতন সাহসও ছোঁয়াচে। আমার সাথী হ'লে ক্রমশ অভয়ও নিজে থেকে তোর সাথী হবে। না, শোন্ আরো আছে : ছোট ছোট ঘটনায় বারবার সাহস পেলে ক্রমশ তিলপ্রমাণ

সাহস তালপ্রমাণ হ'য়ে উঠবে—পাটীগণিতের নির্ভুল দুই-আর-দুয়ে-চার-এর বিধানে। সাহসও বাড়ে এই বিধানেই, যেমন ছোট বীজ বড় হ'য়ে গাছ-এ রূপ নেয়। এরই নাম বিকাশ। শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য—এই বড় হ'য়ে ফুটে ওঠা। অথচ আমরা এ প্রত্যক্ষ সত্যকে মেনেও মানি না, তাই বলি স্বভাব না যায় ম'লে। কিন্তু স্বভাবের কয়েকটি মূল ধারা না বদলালেও মানুষের নানা অভাবনীয় পরিণতি হ'তে পারে শিক্ষা দীক্ষা অভ্যাসে। তাই একথা বলা মানুষকে অপমান করা: যে, যারা স্বভাবে ভীতু তাদের সঙ্কটে বুক ধুক ধুক করবেই করবে। মানি—স্বভাবের মধ্যে কিছুটা উপাদান থাকে যার মেরামৎ সুকঠিন, কিন্তু আবার অনেক উপাদানকেই এমন ঢেলে সাজানো যায় যার ফলে তাকে আর চেনাই যায় না।"

প্রসাদ পিতৃভক্তির টানে তথা তাঁর তেজস্বিতার প্রভাবে সত্যিই হ'য়ে উঠল সাহসী—রাতে একলা শুধু শ্মশান মশানেই নয় বনে জঙ্গলেও যেত অকুতোভয়ে—পিতৃনির্দেশে।

প্রসাদ যে-দৃষ্টান্ত চেয়েছিল মিলে গেল কয়েকমাস পরেই। সাধন ঠাকুর (এই নামেই তাঁকে সবাই ডাকত) একদা প্রসাদ, তার স্ত্রী নির্মলা ও উনিশ বৎসরের ছেলে শ্রীমন্তকে নিয়ে ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গায় নৌকাযোগে রওনা হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর। প্রতি পূর্ণিমায়ই তিনি যেতেন এই মহাতীর্থে।

সেদিন পাশে একটি ছোট ডিঙিতে একটি দম্পতি তিন চারটি শিশুকে নিয়ে চলেছিল পানিহাটি। হঠাৎ পাশ দিয়ে একটি স্টীমার হু হু শব্দে শৃঙ্গধ্বনি ক'রে এগিয়ে গেল। একটু পরে তার অভিঘাতে-ওঠা ঢেউয়ে আশপাশের নানা ভড় নৌকা ডিঙি দুলতে লাগল। হঠাৎ সেই ছোট্ট ডিঙিটি কাৎ হ'য়ে ডোবে আর কি! হৈ হৈ শব্দ! কিন্তু ডিঙিটি টাল সামলে নিলেও একটি সাত আট বছরের মেয়ে জলে প'ড়ে গেল। সাধন ঠাকুর তৎক্ষণাৎ মাঝদরিয়ায় ঝাঁপ দিলেন।...স্রোত প্রবল কিন্তু তিনি প্রাণপণে সাঁতার দিয়ে চেপে ধরলেন মেয়েটির চুলের মুঠি। সাধন ঠাকুরের নৌকাটি এগিয়ে এল। প্রসাদ ঝুঁকে পিতৃদেবের হাত চেপে ধরল। মাঝিরা টেনে তুলল তাঁকে আর মেয়েটিকে। কিন্তু সাধন ঠাকুরের থ্রম্বোসিস ছিল, তার উপর বয়স পঁচাত্তরের কোঠায়। নৌকায় উঠে "জয় রাধেশ্যাম" ব'লেই নিঃসাড়। নৌকা তটে ভিড়োনো হ'ল। এক ডাক্তারও মিলল। কিন্তু বৃথা! ধন্যজন্মা বৃদ্ধ অন্তিমলগ্নে মৃদু হেসে "জয় রা—"ব'লেই নিশ্চুপ। প্রসাদ চোখের জলে আবৃত্তি করলেন: "পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ..."।

॥ দুই ॥

প্রসাদ সুন্দরী বউ নির্মলাকে বিবাহ ক'রে মোটের উপর সুখীই হয়েছিলেন। দাম্পত্য কলহ বাধত কেবল শ্রীমন্তকে নিয়ে। নির্মলা শ্রীমন্তকে পেয়েছিল এক সাধুর আশীর্বাদে বিবাহের সাত বৎসর পরে—যখন সকলেই ধরে নিয়েছিল সে বন্ধ্যা। তাই নির্মলা চাইত তার বহুবাঞ্ছিত নয়নমণিকে আগলে রাখতে, কিন্তু প্রসাদ পিতৃদেবের অভয়মন্ত্র জপ ক'রে চাইতেন শ্রীমন্ত বীরবালক হ'য়ে উঠুক। বলতেন প্রায়ই—"দেখতে সুপুরুষ হ'লে কী হবে যদি স্বভাবে কাপুরুষ হয়?" নির্মলা শ্বশুর ও স্বামীর নানা সাংঘাতিক নির্দেশে ভয় পেয়ে চাইত অঞ্চলের নিধিকে আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে। ফলে শ্রীমন্ত হ'য়ে উঠল বিষম ভীতু। প্রসাদ তাকে রাতে শ্মশানে মশানে ঘুরিয়ে আনতে চাইলে শ্রীমন্ত মা-কে আঁকড়ে ধ'রে বিপদকে এড়িয়ে চলত। সাধন ঠাকুর নির্মলাকে দুএকবার টুকেছিলেন, কিন্তু নির্মলা কান না দেওয়ায় তিনি প্রসাদকে টিপেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন। বৌমার সঙ্গে তর্কাতর্কির কথা তিনি ভাবতেই পারতেন না। প্রসাদ নির্মলাকে পটিয়ে শ্রীমন্তকে মানুষের মতন মানুষ ক'রে তুলতে চাইলে হবে কি, নির্মলা এমনি কান্না জুড়ে দিত যে, সাহসের দীক্ষা দিয়ে ছেলেকে পিতৃদেবের আদর্শে গ'ড়ে তোলা হ'য়ে উঠেছিল অসম্ভবের কাছাকাছি।

শ্রীমন্ত পড়াশুনায় ভালো ছাত্রই ছিল। তাই নির্মলা আরো বড় গলা ক'রে বলত: "ছেলে ঠিক পথেই চলেছে—কী দুঃখে ডানপিটে হ'য়ে পাকে পড়তে যাবে শুনি? ও কি সঙিন উঁচিয়ে লড়াই করবে না কি? ভদ্র ও মান্য-গণ্য হ'লেই চলবে ওর। খেটে খেতে তো হবে না—তবে কেন এ সেকেলে অভয়বুলির পাঠ দেওয়া?" শেষে যখন বি-এ পরীক্ষায় শ্রীমন্ত দর্শনশাস্ত্রে অনর্সে প্রথমে শ্রেণীতে পাশ করল তখন তিনি আরো তারস্বরে ছেলের গুনগান সুরু করলেন: "এরি তো নাম মানুষের মতন মানুষ হওয়া। শ্মশানে মশানে গিয়ে কাপালিক ব'নে কে কবে মহাপুরুষ হয়েছে?…"

এই সময়েই সাধন ঠাকুরের ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল গঙ্গাতটে। মধুপাত্রে পড়ল ছাই।

অতঃপর প্রসাদ ভেবেচিন্তে স্থির করলেন শ্রীমন্তকে বিলেত পাঠাতেই হবে। কারণ শ্রীমন্ত এ কয়বৎসরে বড় বেশি ভয়কাতুরে হ'য়ে উঠেছিল। ঘরে

চামচিকে উড়লেও ভয়ে লেপমুড়ি দিত। এক মনস্তত্ত্ববিৎ এসে রায় দিলেন—স্নায়বিক দৌর্বল্য, ঘরের ছেলেকে পরের কাছে না পাঠালে মা-র প্রশ্রয়ে ও আরো আদুরে গোপাল হ'য়ে উঠবে, ফলে ভয় ওকে আরো পেয়ে বসবে। প্রসাদ একদিন একলা শ্রীমন্তকে নিয়ে বটানিকাল গার্ডেনে গিয়ে বললেন এক গল্প কথা!—"শুধু অনর্স পরীক্ষায় পাশ করলেই মানুষ কৃতকৃত্য হয় না। সব আগে হ'তে হবে পুরুষ। কাপুরুষকে শেষ পর্যন্ত অমৃতবঞ্চিত হ'য়েই কাটাতে হবে। ধন্যজন্মা হ'তে হলে চাই পৌরুষের জয়তিলক···ইত্যাদি ইত্যাদি।"

শ্রীমন্ত ছিল একদিকে যেমন ভীতু, অন্যদিকে তেমনি উচ্চাশী। মাকে সে ভালোবাসত মনে প্রাণেই, কিন্তু মুষড়ে পড়ত যখন কানে আসত পাড়াপড়শির টিটকিরি: "সাধন ঠাকুরের নাতি কেমন ক'রে এমন ভীতু হ'য়ে উঠল গো!" নির্মলা শুনে তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠত, বলত ওকে: "সব হিংসে, ধন! নির্জলা হিংসে। তোর রূপ গুণ বিদ্যা ওরা সইতে পারছে না। তুই ওদের কথায় কান দিস নি—এম এ পড়।"

প্রসাদ এ-প্রসঙ্গে বললেন: "তোর মা ভুল বলেছে বাবা! এ ওদের হিংসে নয়—এর নাম 'কোদালকে কোদাল বলা'। বিশেষ এমন ঠাকুর্দার নাতি হ'য়ে তুই ভয়কাতুরে হবি কী দুঃখে? সাহসী তোকে হ'তেই হবে।"

শ্রীমন্ত: মানি বাবা, কিন্তু মা যে আমাকে চোখে চোখে রাখতে চান।

প্রসাদ: তা কি আমি জানি না—যা সকলেরই চোখে পড়েছে? তাই আমি স্থির করেছি—তোকে তোর মা-র কাছ ছাড়া করতেই হবে। এর এক-মাত্র উপায় হচ্ছে তোকে বিলেত পাঠানো—যেকথা ডাক্তারেও বলল সেদিন।

শ্রীমন্ত (খুশী): বিলেত যেতে আমার খুব ইচ্ছে করে বাবা। কিন্তু (মুখ নিচু ক'রে) ভয়ও করে যে একলা যেতে। তুমিও চলো না।

প্রসাদ: কেমন ক'রে যাই বল্ তোর মাকে ফেলে? সে হয় না। তোকে একলাই যেতে হবে। এতে ভয়ের কী আছে? শোন্ বলি। লণ্ডনে আমার এক প্রিয় বন্ধু আছেন সুবোধ শাস্ত্রী তাঁকে তুই তো জানিস।

শ্রীমন্ত: জানি বললে বেশি বলা হয় তবে নানা লোকের মুখে শুনেছি তিনি মহাপণ্ডিত।

প্রসাদ: শুধু পণ্ডিত নয়—সত্যিকার ধার্মিক ও মহৎ। "বসুধৈব কুটুম্বকম্" তাঁর মুখের শ্লোক নয়—প্রাণের মন্ত্র। এমন উদার স্নিগ্ধ মানুষকে ক্ষণজন্মা উপাধি দেওয়া চলে। তাঁকে আমি তোর কথা লিখেছিলাম মাসখানেক আগে। তিনি সাগ্রহে আমার প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন—তোর তদারক করতে

তিনি রাজী আছেন। তিনি তোকে লণ্ডনে কোনো কলেজে ঢুকিয়ে দেবেন —হয়ত যে-কলেজে তিনি দর্শন পড়ান সেই কলেজেই। কিন্তু সে পরের কথা। আমি বলি কি—তুই আগে সোজা তাঁর ওখানে গিয়ে ওঠ। তাঁর স্ত্রী মেমসাহেব বটে, কিন্তু তিনি তাকে পরিপাটি বাংলা শিখিয়ে বঙ্গবালা দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর স্নেহাশ্রয়ে তোর লাভ হবে সমূহ। এখন কেবল তোতে আমাতে মিলে তোর মাকে পটাতে হবে যাতে সে তোকে বিলেত যাবার অনুমতি দেয়।

শ্রীমন্ত: হুঁম্। সন্দেহ।

প্রসাদ: বেগ পেতে হবে বৈ কি। কিন্তু যদি আবদার ধরিস যে, তুই যাবি একবৎসরের জন্যে তাহ'লে সে তোকে ছেড়ে দেবেই দেবে।··· কী? বিলেত যেতে তোর ইচ্ছে নেই?

শ্রীমন্ত: ইচ্ছে করে তো খুবই বাবা। কিন্তু ভয় করে যে—সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে—

প্রসাদ: ভয় কী রে? আকাশে পাখা মেলে দুদিনে লণ্ডন পৌঁছে যাবি। অবিশ্যি প্রথমে হয়ত মন খারাপ হবে "হোমসিক" হ'য়ে, কিন্তু ওদেশের প্রাণশক্তির ইঞ্জেকশনে দুদিনেই তুই চাঙ্গা হ'য়ে উঠবি।

শ্রীমন্ত (হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে): থাক বাবা—আমি পারব না। আকাশে উড়ব কি—ঐ দুর্দান্ত গরুড়ের গর্জনে বুক কেঁপে ওঠে মাটিতেই।

প্রসাদ: কী পাগল! গরুড়চন্দ্রের অন্দরে কেবল শান্তি—গর্জনের হরির লুট ছড়ায় বাইরেই। বিশ্বাস না হয় একবার উড়ে যা না পাটনায়—পরখ করতে।

শ্রীমন্ত (কান্না কান্না স্বরে): আমি পারব না বাবা! কাগজে যখন পড়ি হঠাৎ এঞ্জিন অচল হয়ে পড়বার সময় জ্ব'লে উঠেছে আর একশোজনের মধ্যে একজনও বাঁচে নি···

প্রসাদ: বুদ্ধিমান হ'য়ে এমন বোকার মতন কথা বলে? প্রতিদিন জগতে বোধহয় দুতিন লক্ষ গরুড় ওড়ে। বছরে দুর্ঘটনা ঘটে কটা? সুবোধ একবার আমাকে বলেছিল যে, গুনে দেখলে দেখা যাবে যে, আকাশ গরুড়ের দুর্ঘটনা গোনাগুন্তিতে রেল মোটর জাহাজের দুর্ঘটনার সিকির সিকিও নয়। দিনের পর দিন হাজার হাজার মেয়েরাও উড়ে চলেছে আর তুই পারবি না—যার যেমন স্বাস্থ্য তেমনি রূপ?

শ্রীমন্ত (হেসে): রূপ তো এক্ষেত্রে অবান্তর বাবা। আর নিটোল

স্বাস্থ্য কি দুর্ঘটনায় কম জখম হয়? না বাবা, আমার মনে হয় আকাশে ওড়া কোনো কাজের কথা নয়—গান্ধিজি কিছুতেই রাজী হন নি উড়তে।

প্রসাদ: তাঁর নজির দিচ্ছিস কেন শুনি? তাঁর কোন্ নীতিটা আমরা নিয়েছি? চরকা, অহিংসা, দারিদ্র্যবরণ—সত্যি, তুই আমাকে দুঃখ দিলি আজ।

শ্রীমন্ত (একটু চুপ ক'রে থেকে): আচ্ছা বাবা, আমি যাব। কেবল মাকে রাজী করার ভার তোমার—ব'লে রাখছি।

প্রসাদ: তথাস্তু। শুধু তুই নন কোঅপারেট করিস নি গান্ধিজির নজিরে। বেশ বেশ, এরি তো নাম—সুবুদ্ধি। দিনরাতি কেবল তোর বীর ঠাকুর্দার পুণ্য মন্ত্র জপ কর্—পৌরুষং নৃষু, পৌরুষং নৃষু, পৌরুষং নৃষু। এ ঠাকুরের কথা—কাটবার জো নেই।

শ্রীমন্ত: ঠাকুরের কথা অকাট্য হ'তে পারে বাবা, কিন্তু কেবল মন্ত্র জপ ক'রে কেউ কি বীর হয়েছে কোনোদিন? অর্জুন যে অর্জুন মহারথী, তাঁকেও বোঝাতে কি ঠাকুরের গলদ্‌ঘর্ম হ'তে হয় নি?

প্রসাদ: সে শুধু আদর্শটাকে খাড়া ক'রে ধরতে সকলের জন্যে। কিন্তু এ তর্ক রেখে তুই একবার পৌরুষমন্ত্র জপ ক'রে দেখই না ছাই—তার বীজে সিদ্ধির ফল ফলে কি না। না শোন্ বাবা, লক্ষ্মীটি! আমি সত্যিই তোর মুখ চেয়ে আছি—ক'বে তুই তোর ধন্যজন্মা ঠাকুর্দার নজির মেনেই দেশের দশের একজন হবি। মিথ্যে ভয়কাতুরেদের পথে চ'লে মিইয়ে যাস নি। মনে রাখিস তিনি উঠতে বসতে আওড়াতেন গীতার মহাবাক্য যে ভীতু ক্লীব হ'য়ে চললে মানুষ দ-য়ে মজবেই মজবে—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"।

শ্রীমন্ত (একটু পরে): আচ্ছা, আমি মা-কে ধরব বাবা, কথা দিচ্ছি। কেবল একটা কথা: মা যদি বেশি কান্নাকাটি করেন তাহ'লে আমি তাঁর মনে কষ্ট দিয়ে বিলেতে যেতে পারব না।

প্রসাদ (উষ্ণ সুরে): বাবা, এরই নাম "ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি"। তার চেয়ে সাফ জবাব দেনা তুই মা-র অঞ্চলের নিধি হ'য়েই থাকতে চাস ব্যর্থ জীবনের ভার ব'য়ে? আসলে তুই ভয় পাচ্ছিস যেতে, কবুল কর—মিথ্যে ওজর দিয়ে কাপুরুষতার ওকালতি করিস নি। (সব্যঙ্গে) এই জন্যেই বাঙালী আজ মিইয়ে গেছে—মানুষ হ'তে না চেয়ে। রবীন্দ্রনাথ কি সাধে খেদ করেছিলেন:

> সাত কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গজননী,
> রেখেছ বাঙালী ক'রে, মানুষ করো নি।

॥ তিন ॥

নির্মলা বড় কান্নাই কাঁদল। কিন্তু শ্রীমন্ত টলল না—কারণ তার মনের কেমন যেন হঠাৎ মোড় ফিরে গিয়েছিল, ভয়ের কুয়াশা পুরোপুরি না কাটলেও বেশ একটু ফিকে হ'য়ে এসেছিল। এর একটা কারণ—ঠাকুর্দাকে সে সত্যিই গভীর ভক্তি করত। আজ যেন স্পষ্ট দেখতে পেল তার মনে শক্তিসঞ্চার করেছে সেই ভক্তিই বটে। তাই ঠিক করেছিল—জপ ক'রে দেখবে এ-শক্তি তাকে সত্যি সত্যি শক্ত করতে পারে কিনা। এখন সব আগে দরকার শক্ত হওয়া—নৈলে দিনের পর দিন মার কান্নাকাটির তোড়ের সামনে ভেসে যাবেই যাবে, সংকল্পের ভিৎ-এ দাঁড়াতে পারবে না। মনে পড়ল সাধন ঠাকুরেরি একটি প্রায়োক্তি: "বল আসে ভালোবাসা থেকেই। দেখ না তোর মাকেই —তোর জন্যে তাঁকে কত দুঃখই না সইতে হচ্ছে, কিন্তু একটিবারও কি তিনি বলেছেন—তুই তাঁর কোল জুড়ে না এলে তিনি বেঁচে যেতেন?" সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল একটি শিশুকে বাঁচাতে তাঁর প্রাণ তুচ্ছ ক'রে গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া— বৃদ্ধ বয়সেও। এ-ত্যাগিদের উৎসও তো ঐ একই প্রেম প্রীতি দরদ যার মূলে আছে "আহা" বলার বেদনা। মনে পড়ল তাঁর একটি স্বরচিত গান:

প্রেম মম সাধনং প্রেম সঞ্জীবনং
বন্ধনে মুক্তিমণি তারা।
বিরহ উদ্দীপনং মিলন উন্মাদনং
নিদাঘে শ্যামঘনধারা॥

মনে পড়ল—গানটির অনুবাদ ক'রে প্রসাদ গাইতেন চোখের জলে:

প্রেম আমার সাধনা জানি, প্রেম আমার জীবন মানি,
বন্ধনে সে মুক্তিমণিতারা।
বিরহে প্রেম উদ্দীপন, মিলনে প্রেম উন্মাদন,
নিদাঘে প্রেম স্নিগ্ধ জলধারা॥

শ্রীমন্ত গাইতে পারত—শাদামাটা। এ-গানটি পিতৃদত্ত সুরে মাঝে মাঝে গাইত ভাবোচ্ছ্বাসে। গাইবার সময় চোখে জল আসতও প্রায়ই। কিন্তু মা-র চোখের জলের স্রোতে যখন সে ভেসে যাবার জো হ'ত তখন পূজার ঘরে

একলা ব'সে এ-গানটি প্রার্থনার সুরে গাইতে গাইতে সে স্পষ্ট অনুভব করত —বল আসত পিতৃদেবের প্রেমল আশীর্বাদের ঝর্নাধারায়। দুর্বলতা ও বল দুয়েরি মূলে ভালোবাসা, কিন্তু কী আশ্চর্য—প্রকাশ তথা বিকাশ উল্টোমুখী! সৃষ্টি এমনি বিচিত্র বটে—অসঙ্গতিতে ভরা! শ্রীমন্ত সাহসে আতুর হ'লেও বুদ্ধিতে দেউলে ছিল না তো! তাই ঠিক করল—এ-অসঙ্গতির নিদান খুঁজে বার করতেই হবে। এর ওর তার মধ্যে নানা উল্টোপাল্টামি দেখলে হকচকিয়ে যেতে হয় বৈকি—কিন্তু তার সাফাই এই যে, আর সবার সঙ্গে পুরো পরিচয় হয় নি। কিন্তু যে আমির সঙ্গে অষ্টপ্রহর ঘরকন্না করছি খাতিয়ে সেও থেকে যাবে চির-অজানা, এ কি দুঃসহ পরাজয় নয়? আমি আমি করি চলতে ফিরতে হাসতে কাঁদতে অথচ আমি বাবুটি কে তাই জানি না! ধিক্! ইংরাজ কবি বলেছেন:

"Know then thyself, presume not God to scan,
The proper study of mankind is man."

প্রসাদ এ-শ্লোকটির মর্মবাণী একদিন বাংলায় তর্জমা ক'রে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তার কৈশোরে:

আপনারে লও চিনি' অভিমানী!—জানিতে চেও না শ্রীভগবানে।
যথার্থ জ্ঞানী তারি নাম—চায় মানবে জানিতে যে সন্ধানে।

॥ চার ॥

নির্মলা ছিল ঝাঁঝালো মেয়ে কিন্তু রোখালো বলতে যা বোঝায় তা নয়। সে নিজে একথা জানত না, কিন্তু প্রসাদ জানতেন। তাই তিনি স্ত্রীর তীব্র প্রতিবাদেরও প্রতিবাদ না ক'রে একান্তে বললেন শ্রীমন্তকে: "এ-ঝাঁঝ ধোপে টিকবে না বাবা। কেবল ফের মনে করিয়ে দিচ্ছি যে তুমি আমাকে কথা দিয়েছ।"

শ্রীমন্তের অভিমান ছিল সে সত্যনিষ্ঠ। তাই আরো প্রসাদ ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছিলেন ওর অভিমানকে উস্কে দিয়ে। ফল ফলেছিল—নির্মলা শেষে বাধ্য হ'য়ে অনুমতি দিয়েছিল শ্রীমন্তকে এক বৎসরের জন্য বিলেত যাবার। কেবল বারবার বলেছিল চোখের জলে: "দেখিস ধন, ওখানে

গিয়ে মদ খাস না আর মেম বিয়ে করিস নি শাস্ত্রীজির মতন। তাই তো আমার আরো বুক কাঁপে—তুই রেঁ তাঁর ওখানেই উঠছিস···”

প্রসাদ : আহা, ওঠা মানে তো কায়েম হওয়া নয়। মনে রেখো শ্রীমন্ত মাত্র ছ'মাস আগে সাবালক হয়েছে। ওকে সুবোধ যক্ষের ধনের মতন আগলে রাখবে প্রথম দিকে। পরে ও লণ্ডনে কোনো কলেজে ঠাঁই পেলে ওকে সে কোনো ভালো বোর্ডিং হাউসে ভর্তি ক'রে দেবে। আর মেম বিয়ে করবে কী দুঃখে শুনি? দেশে কী সুলক্ষণা সুন্দরী পাত্রীর অভাব আছে?

নির্মলা (চোখ মুছে): সে কথা ঠিক। আর এমন পাত্রকে না চাইবে কোন পাত্রী শুনি? ঈশ্! মনে রেখো সাধুর আশীর্বাদ নিয়ে ও জন্মেছে।

শ্রীমন্ত (মার পায়ে মাথা রেখে): না মা, তোমার অমতে আমি এক পাও এগুব না।

নির্মলা : আর আমিও তোর পথ চেয়ে থাকব মনে রাখিস।

॥ পাঁচ ॥

বিমানে শ্রীমন্ত ভয় পেয়েছিল কেবল যখন রথ দুলতে দুলতে অন্তরীক্ষ থেকে নামে। কিন্তু ওর পাশের এক মেমসাহেব বলল: “কোনো ভয় নেই”—তখন লজ্জা পেয়ে জপ করা সুরু করল: “পৌরুষং নৃষু”।

লণ্ডনে বিমানঘাঁটিতে নামতেই সাম্নে সুবোধ শাস্ত্রী হাসিমুখে ওকে জড়িয়ে ধরলেন। ও প্রণাম করল: “আপনি কষ্ট ক'রে এতদূর এলেন কেন কাকাবাবু?”

শাস্ত্রীজি : কষ্ট আর কি? কয়েক মাইল মোটরে হু হু ক'রে এসে পৌছলাম এখানে বহাল তবিয়তেই। তা এখন চলো। তোমার কাকিমা উৎসুক হ'য়ে অপেক্ষা করছেন।

শ্রীমন্ত : মার্থা কাকিমা?

শাস্ত্রীজি (হেসে): আমার যখন একটিই ঘরণী তখন তোমারো একটি কাকিমাতেই তুষ্ট থাকতে হবে বাবা।

শ্রীমন্ত (হেসে): বাবা বলেছিলেন আপনি সুরসিক। তাই আরো ভরসা পেয়েছি।

শাস্ত্রীজি : আশা করি তোমার কাকিমাকে দেখে ফের উল্টোমুখে নির্ভরসা হ'তে হবে না। কিন্তু কোথায় তোমার মালপত্র?

শ্রীমন্ত : আমার এই একটি মাত্র স্যুটকেস আর হাতে এই ব্রীফকেস।

শ্রীমন্ত প্রসাদের কাছে শাস্ত্রীজির গুণাবলি সম্বন্ধে অনেক কিছুই শুনেছিল। তিনি দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে বি এ পাশ ক'রেই লণ্ডনে প্রয়াণ করেছিলেন দর্শনে আরো কিছু তত্ত্ব সংগ্রহ করতে। তারপর কী করবেন ঠিক করেন নি কারণ তাঁর মনে আকৈশোর কিছুটা উদাসী রঙের ছোপ লেগেছিল। তাই দর্শন-শাস্ত্র থেকে তিনি কেবল পাণ্ডিত্যের মুক্তামণি আহরণ করতে নয় জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছুটা দিশা পেতেও চেয়েছিলেন।

শাস্ত্রীজির পাশে মোটরে চুপ ক'রে ব'সে শ্রীমন্তর মনে একের পর এক রকমারি উড়ো চিন্তা এসে ভিড় জমাতে থাকে। শাস্ত্রীজির সম্বন্ধে শ্রদ্ধা তার ছিল প্রথম থেকেই, কিন্তু লণ্ডনের "হীথ রো" বিমানঘাঁটিতে তাঁর-উজ্জ্বল অভ্যুদয়ে শ্রদ্ধা মোড় নিয়েছিল ভক্তির দিকে। নির্মলা শাস্ত্রীজির মেম বিবাহ করার জন্যে নানা তীব্র মন্তব্য করলেও শ্রীমন্তের মনে পিতৃদেবের নানা উচ্ছ্বাসের স্মৃতি উড়ে আসে :

"সুবোধ সত্যিই একটি অবিস্মরণীয় মানুষ রে শ্রীমন্ত! যাকে বলে—স্বাবলম্বী, গীতার 'জিজ্ঞাসু' থাকের মনীষী। শুধু বিদ্যায় অসামান্য নয়—যে সব পরীক্ষায়ই প্রথম হয়—স্বভাবে নির্বিবাদী, আলাপে স্নিগ্ধবাক্‌, সমাজে অনাড়ম্বর ··" ইত্যাদি।

হঠাৎ চমকে উঠল তাঁর আঙুলের স্পর্শে : "A penny for your thought, my boy!"

প্রসাদ (সলজ্জ হেসে) : এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধবে না কাকাবাবু—আপনার কথাই ভাবছিলাম—বিশেষ ক'রে বাবার নানা গুণগান আপনার চরিত্র সম্বন্ধে।

শাস্ত্রীজি : ওহ্‌! প্রসাদ স্বভাবে উচ্ছ্বাসী তো, তার ওপর বন্ধু বৎসল। তাই আমার সম্বন্ধে একবার মস্ত প্রবন্ধই লিখে বসল প্রমাণ করতে যে আমি শুধু প্রিয়দর্শন নই, তার উপর গুণবান্‌, মনীষী, প্রেমিক পুরুষ। ভাগ্যে সে-প্রবন্ধটি প্রবাসীতে বেরোয় নি—বেরুলে আমার আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো ভার হ'ত।

শ্রীমন্ত (সকৌতুকে) : আপনি প্রবাসীর সম্পাদককে ব'লে ক'য়ে সেটি ফেরৎ নিয়ে এসেছিলেন শুনেছি।.

শাস্ত্রীজি : কী করি বলো বাবা? ভদ্রসমাজে চলাফেরা করতে হ'লে একটু করিৎকর্মা না হ'লে চলে না তো।

শ্রীমন্ত : কিন্তু আমাকে বলতে বাধা কি ?

শাস্ত্রীজি : সে-প্রবন্ধটির খসড়া প্রসাদ তোমাকে দেখায় নি ?

শ্রীমন্ত : না তো।

শাস্ত্রীজি : আঃ! বাঁচলাম।—ও কি ? দেখ দেখ, কী কাণ্ড!

ওদের চোখে পড়ল অদূরে দুটি মোটর কাৎ হ'য়ে প'ড়ে। পুলিশ, জনতা, হৈ হৈ···রক্ত আর রক্ত···

শ্রীমন্তর বুক কেঁপে ওঠে।

ওদের মোটর চলল হু হু ক'রে জনতাকে ডাইনে রেখে। শ্রীমন্ত বলল : "এখানেও দুর্ঘটনা কাকাবাবু ?"

শাস্ত্রীজি হেসে বললেন : "বাবা, দুর্ঘটনা এড়াবে কেমন ক'রে বলো ? এমন কি খেলার মাঠেও কি যুদ্ধ বাধে না দুপক্ষের ? আমার মনে আছে দর্শকেরা এক রেফারির কোনো রায়ে রেগে আগুন হ'য়ে তার ওপর চড়াও হ'তে পুলিশ এসে হাজির দেয় খেলার মাঠে। পরদিন কাগজে পড়লাম—চার-পাঁচজনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। বিশ্বলীলায় তো শুধু নাচগানেরি নূপুরবাঁশি বাজে না, শুম্ভনিশুম্ভের তালঠোকার আওয়াজও শোনা যায়···"

শ্রীমন্ত : কিন্তু সুরের লীলালোকে বেসুর কেন এত বেশি উৎপাত ক'রে কাকাবাবু ? বিশেষ ক'রে ভয় এসে হানা দিল কোত্থেকে ?

শাস্ত্রীজি : আমি না সুরজ্ঞ, না দ্রষ্টা, কেমন ক'রে এ-দারুণ প্রশ্নের উত্তর দেব বাবা ? কেবল একটা কথা আমার মনে হয় বারবারই : যে, লীলাময় রহস্যের সৃষ্টি করেন আমাদের সমাধানের আগেও তদন্ত করার আনন্দ পরিবেশন করতে। তবে ভয়ের সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়ল। আমি নানা সাধুসন্তের খোঁজ ক'রে বেড়াতাম ছুটিতে। একবার দাক্ষিণাত্যে এক দীপ্যমান সাধুর শান্তিময় কান্তি দেখে তাঁর কাছে মন্ত্র নিয়েছিলাম "বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।" মন্ত্র নিয়ে কিছুদিন জপ ক'রে উল্টো উৎপত্তি হ'ল—মনের মধ্যে এক অনামা বিষম ভয় এসে হানা দিল। গুরুর কাছে যেতে তিনি বললেন এ-সব বাধা আসে আমাদের সংকল্পকে দৃঢ় করতেই। আর ভয়ের সম্বন্ধে বললেন যে, রিপু ছয়টি মাত্র নয়, সপ্তরথী—অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্যের পরেও আছে ভয়। তাই—বললেন তিনি—যতদিন না মানুষ অভয় হচ্ছে ততদিন সে নানা বিভূতি লাভ ক'রে কীর্তিমান্ হ'তে পারে কিন্তু ধন্যজন্মার শিরোপা পাবে না। আমি চমকে উঠলাম। কারণ নানা শাস্ত্রেই পড়েছিলাম আচার নিষ্ঠাকে বরণ না করলে বস্তুলাভ অসম্ভব। কিন্তু আচারীর মনেও যে

আবার এক বিষম ভয় গজায়—পাছে পান থেকে চূন খসে। অর্থাৎ ঐ একই সর্বগামী ভয় নানা ছদ্মবেশে। ফলে আমি হ'লাম (হেসে) দুরাচারী না হোক অনাচারী—বিলেতে এসে বিয়ে ক'রে বসলাম এক ইংরাজ প্রফেসরের মেয়েকে⋯এই যে।

মোটর শ্-শ্ শব্দে শব্দে ঢুকল একটি সুন্দর গেটে—গোলডার্স গ্রীন অঞ্চলে।

॥ ছয় ॥

শ্রীমন্ত প্রসাদের কাছে আগেই শুনেছিল কাকিমার কথা। তিনি ছিলেন লণ্ডনে দর্শনের এক অধ্যাপকের মেয়ে। নাম মার্থা। শাস্ত্রীজি মার্থার সঙ্গে একই কলেজে দর্শন সম্বন্ধে একই অধ্যাপকের ক্লাসে তাঁর নানা ব্যাখ্যা ভাষ্য টীকা শুনতেন, বৎসরখানেক পরে মার্থার সৌন্দর্যে—বিশেষ ক'রে চরিত্রের সুষমায়—মুগ্ধ হ'য়ে তাকে বিবাহ করেন নানা বাধা সত্ত্বেও। বিবাহের পরে আরো উজিয়ে উঠলেন দেখে তার আশ্চর্য সাহস। বলতে কি, মার্থার সাহস তাঁদের রোমান্সের স্বর্ণশিখার যেন এক নবজাত ইন্ধন হ'য়ে উঠল। শুনলেন তার এক বোনের কাছে যে মার্থা কখনো ভয়ে পিছোতো না। একবার ছুটিতে বনভোজনে এক সাপ দেখে সে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা হাতের কাছে লাঠি না পেয়ে ছাতা নিয়েই ছুটেছিল সাপের পিছনে। তার সঙ্গিনীরা আতঙ্কে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বহুকষ্টে ঠেকায়! দেখতে যেমন মৃদুলা প্রাণশক্তিতে কি তেমনি বিপুলা! অনেকেই এ-অসঙ্গতি দেখে বিস্মিত হ'য়ে বলাবলি করত।

বিবাহের পর যখন শিশু এল ঘর আলো ক'রে তখন মার্থা তার নাম দিতে চেয়েছিল এমা। কিন্তু শাস্ত্রীজি তার নামকরণ করলেন প্রতিমা। প্রতিমা মা-র মতন অত ফর্সা ছিল না কিন্তু রূপের এমন জৌলুষ ছিল যে প্রতিমা নাম তাকে মানাত বৈ কি। মার্থা বাংলা শিখেছিল ব'লে প্রতিমা নামটির ব্যঞ্জনা উপলব্ধি ক'রে খুশী হ'য়েই সায় দিল এই মধুর সংস্কৃত নামে—আরো এই জন্যে যে, সংস্কৃত ভাষাকে সেও ভালোবেসেছিল স্বামীর ভালোবাসার ছোঁয়াচে। তাই প্রতিমারও শিখতে হ'ল সংস্কৃত তথা বাংলা। সে প্রায়ই বলত হেসে: "তিনটি

ভাষায় ছেলেবেলায়ই আমার হাতে খড়ি হয়েছিল: ইংরাজী, বাংলা আর সংস্কৃতে—যেমন সুইসদের হয়: জর্মন ফরাসী ও ইতালিয়ানে।" ব'লে প্রায়ই হাসিমুখে জুড়ে দিত: "ইংরাজী আমার মাতৃভাষা, বাংলা পিতৃভাষা আর সংস্কৃত তো দেবভাষা।"

শ্রীমন্ত লণ্ডনে অতিথি হয়েছিল তিনজনেরই। শাস্ত্রীজিকে দিয়েছিল পিতার পদবী, মার্থাকে—মা-র, প্রতিমাকে সতীর্থের। উভয়ে একসঙ্গে এক ক্লাসে দর্শনের পাঠ নিত। শ্রীমন্ত প্রতিমার কাছে প্রতীচ্য দর্শনের নানা গ্রন্থিমোচন করত; প্রতিদানে শ্রীমন্ত প্রতিমার কাছে ব্যাখ্যা করত গীতার ও তন্ত্রের নানা দুরূহ শ্লোক। প্রতিমা খুশী হ'য়ে বলত প্রায়ই যে, সে চেয়েছিল এমনই একটি সতীর্থ যার মাধ্যমে সে ভারতবর্ষের তীর্থযাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা অন্তত খবর পাবে। খবর পাওয়া দরকার কারণ ভারতবর্ষে ও যাবেই যাবে দুদিন পরে।

নির্মলা কলকাতা থেকে শ্রীমন্তকে লিখত দক্ষিণা দিয়েও কারুর "অতিথি" হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—তাই ও যেন কালবিলম্ব না ক'রে কোনো বোর্ডিং-এ প্রয়াণ করে। শ্রীমন্তেরও মনে হত মা ঠিকই নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু শুধু যে শাস্ত্রীজি বাদ সাধতেন তাই নয়, মার্থা ও প্রতিমা উভয়েই ওকে ধ'রে রাখতে চাইত। প্রথম প্রথম শ্রীমন্ত প্রতি মাসে পেইং-গেস্ট-এর মতন খরচ দিত। কিন্তু পরে এ-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এমন সহজে গ'ড়ে উঠল যে মার্থা নিত না ওর দক্ষিণা। ওর কুণ্ঠাকে নাকচ করল সব আগে প্রতিমা, বলল: "মা তাঁর এক নিঃসন্তান বিপত্নীক কাকার কাছ থেকে বিবাহে উপহার পেয়েছিলেন দশ হাজার পাউণ্ড। বাবাও নিঃসম্বল নন। তাছাড়া তুমি হ'লে (মুখ টিপে হেসে) আমার সতীর্থ—তোমার কাছে নিখর্চায় বাংলা বোলচালের দীক্ষা নিই দিনের পর দিন। তুমি যখন শিক্ষক হবার জন্যে মাইনে নাও না, তখন আমরাই বা কোন্ মুখে তোমার কাছে হাত পাতব খাই খরচ চেয়ে? আরো, এ-বাড়িটিও মা-র কাকা মা-র নামে লিখে দেন। তিনি ছিলেন দিলদরিয়া, স্ত্রীর মৃত্যুর পর আরো বেশি চাইতেন আত্মীয় স্বজনের স্নেহসঙ্গ। তাই তিনতলায় দুটি বাড়তি ঘরের ব্যবস্থা করেছিলেন। একটিতে তুমি আছ, অন্যটিতে নানা অতিথি আসবে যাবে—কাজেই আমাদের অসুবিধার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।"

শ্রীমন্ত সব কথা খোলাখুলি প্রসাদকে লিখে নির্দেশ চাইল। তিনি লিখলেন খুশী হয়ে যে এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কী হ'তে পারে? বন্ধুকে লিখলেন ধন্যবাদ দিয়ে এক দীর্ঘ পত্র। শেষে লিখলেন পুনশ্চ দিয়ে: "শ্রীমন্তের ভয়

বড় বেশি, তোমরা যদি পারো তো এর একটা বিহিত কোরো।" শাস্ত্রীজি উত্তরে লিখলেন: "ভয়ের সংস্কার অনপনেয় না হ'লেও একবার মনে ঠাঁই পেলে সহজে প্রস্থান করতে চায় না। তবে এক্ষেত্রে বাঁচোয়া এই যে মার্থা আর প্রতিমা দুজনেই সাহসী—এ বলে আমাকে দেখ ও বলে আমাকে। তাই আমার মনে হয় যে মা ও মেয়ের সংস্পর্শে শ্রীমন্ত ক্রমশ ভয়ের সংস্কার কাটিয়ে উঠবে, কারণ ভয়ের মতন সাহসও সংক্রামক।"

প্রসাদ বন্ধুকে লিখেছিলেন শ্রীমন্তকে না জানাতে তাঁর অনুরোধের কথা। অর্থাৎ কন্‌ফিডেনশিয়াল। কিন্তু হ'লে হবে কি, নির্মলা না ভেবে চিন্তে শ্রীমন্তকে লিখে দিল শাস্ত্রীজি কী লিখেছেন প্রসাদকে।

শ্রীমন্ত সে-চিঠি পেয়ে ক্ষুণ্ণ হ'ল প্রতিমার চোখে ছোট হ'য়ে যাওয়ার জন্যে। প্রতিমার প্রতি ও আকৃষ্ট হয়েছিল ষোলো আনাই, কিন্তু এর পরে প্রতিমা আর ওকে কেমন ক'রে শ্রদ্ধা করবে?

সারারাত ঘুম হ'ল না। শেষ রাতে জ্বর। ও ব'লে পাঠাল কিছু খাবে না। মার্থা প্রতিমাকে পাঠাল খবর নিতে।

প্রতিমা শ্রীমন্তর দোরে টোকা মেরে জবাব না পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখল সে ঘুমচ্ছে—মুখ রাঙা। সন্তর্পণে কপালে হাত দিয়ে দেখল প্রবল জ্বর। ফিরে গিয়ে মার্থাকে বলতেই টেলিফোনে আহূত ডাক্তার টমসন ওকে পরীক্ষা ক'রে বললেন: "ব্রংকাইটিস দুতিন দিনেই সেরে যাবে।" ব'লে এ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে প্রস্থান করলেন।

শ্রীমন্তর ঠাণ্ডা লেগেছিল দুদিন আগে হঠাৎ রাস্তায় বৃষ্টিতে ভিজে। কিন্তু মন খারাপ হওয়ার দরুণ সামান্য জ্বরকাশি বেশ একটু ঘোরালো হ'য়ে উঠল। ১০৪ ডিগ্রি জ্বরের তাড়শে প্রলাপ বকা সুরু করল। শাস্ত্রীজি ও মার্থা ওকে ডাক্তার টমসনের নার্সিং হোমে পাঠাতে চাইলেন, কিন্তু প্রতিমা সঘনে আপত্তি ক'রে বলল —এখন ছুটি, শ্রীমন্তের শুশ্রূষার ভার ও-ই নেবে, নার্সিং হোম বা নার্স নামঞ্জুর।

তারপর ঘটা ক'রে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা সুরু হ'ল। কলকাতায় মা-র অত্যধিক আদরযত্নের আওতায় থেকে ওর সহজেই অসুখ করত। ব্যায়াম ক'রে স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হ'লেও বলিষ্ঠ নওজোয়ান বনতে ও পারে নি। শাস্ত্রীজি প্রসাদকে ট্রাঙ্ক কলে ডাকতে তিনি বললেন এ্যান্টিবায়োটিক্‌স্ ওর সয় না—হোমিওপ্যাথি ওষুধেই ও অভ্যস্ত। তৎক্ষণাৎ এক দক্ষ হোমিওপ্যাথকে ডাকতে তিনি বড়ি দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ছেড়ে গেল। শাস্ত্রীজি টেলিফোনে প্রসাদকে জানিয়ে দিলেন এ-সুখবর।

॥ সাত ॥

শ্রীমন্তর জ্বর ছেড়ে গেল বটে কিন্তু দুর্বলতা কেটেও কাটতে চায় না। শাস্ত্রীজি ভেবেচিন্তে বললেন—কাছে লী-অন্-সী অতি চমৎকার জায়গা। সমুদ্রের হাওয়া—Ozone—মানুষকে দেখতে দেখতে চাঙ্গা ক'রে তোলে। কিন্তু শ্রীমন্ত কিছুতেই রাজী হ'ল না; বলল সামান্য দুর্বলতা দুদিনেই কেটে যাবে।

সেদিন সূর্যদেব পাটে নেমেছেন, কিন্তু আকাশে হাল্কা মেঘে নানা রঙের উৎসব; আশে পাশে তরুলতা ফুলে সে-দীপ্তির প্রতিচ্ছায়া। থেকে থেকে পাতায় পাতায় আনন্দের সোনালি করতালি! শ্রীমন্তর কী যে ভালো লাগে —নিদাঘে বিলেতের আলো অম্লান থাকে সূর্যাস্তের পরেও তিন চার ঘণ্টা! সে বাগানে এসে বসে একটি কাশ্মীরী শাল মুড়ি দিয়ে। ঝির ঝির ক'রে বাতাস বইছে। নানা ফুলের হাসির অভ্যর্থনা। হঠাৎ এক বুলবুল গান গেয়ে ওঠে। শ্রীমন্তের চোখে জল আসে, মনে প'ড়ে যায় কোকিলের কু··· কু··· কু···। অনেক দিন বাদে বুলবুলের কলকণ্ঠে যেন তারই প্রতিধ্বনি। স্বরগ্রামে নয়—মাধুর্যে। চোখ মুছতেই বাহু মূলে প্রতিমার স্পর্শে চমকে চেয়ে হাসে। প্রতিমা বলে: "একলা থাকতে চাও, না আমি বসব?" শ্রীমন্ত বলে: "বোসো আর বলো গল্প।" প্রতিমা উঠে একটি বাস্কেট চেয়ার তুলে আনতে যেতেই শ্রীমন্ত লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে ওর হাত থেকে চেয়ারটি ছিনিয়ে নেয়। প্রতিমা মৃদু তিরস্কারের সুরে বলে: "ডাক্তার বলেন নি কি বিশ্রাম করতে?"

শ্রীমন্ত: না, আমি তো সেরে গেছি, ছাড়ো চেয়ারটা···

প্রতিমা: ঢের হয়েছে বীরপুরুষ! বাবা-মা গেছেন এক বন্ধুর বাড়ি—তাঁর অসুখ। আমাকে বিশেষ ক'রে ব'লে গেছেন তোমার তদারক করতে।

শ্রীমন্ত চেয়ার ছেড়ে দিয়ে এসে বসে ওর নিজের আরাম কেদারায়।

প্রতিমা: ফে—র মুখ ভার?

শ্রীমন্ত: অমন ঠাট্টা করলে কেন?

প্রতিমা: ও। কিন্তু সত্যি বলছি ভাই আমি কিছু ভেবে "বীরপুরুষ" বলি নি। এম্‌নি মুখ ফস্‌কে—

একেবারেই মিশিনি—ভয় করত পাছে তারা ঠারে ঠোরে ঠাট্টা করে। কিন্তু তোমাকে দেখে প্রথম আমার ভয়-ভয় ভাব সমীহের দিকে মোড় নেয়। তারপরে ক্লাসে একসঙ্গে পড়া—দর্শন ধর্ম কাব্য কত কি আলোচনা···ফলে যা হবার তাই হ'ল। কিন্তু তবু মনে হত এ আমার দুরাশা, কারণ আমার মতন কাপুরুষকে তোমার মতন শক্তিময়ী কখনই শ্রদ্ধা করতে পারবে না। আর শ্রদ্ধাই সব অন্তরঙ্গতার ভিত্তি। কিন্তু তারপরে আমি স্বপ্নে দেখা সুরু করলাম যে, তুমি আমার খুব কাছে এসে গেছ। নিজেকে বলতাম—সেই old old story—যা জীবনে পাইনি তাকে মধুর স্বপ্নে পেতে চাওয়া আর কি—ফ্রয়েড সাহেব বলেছেন না ?

প্রতিমা : সাহেবি নজির ছেড়ে দাও, বলো তুমি কী চেয়ে কী পেলে।

শ্রীমন্ত : কী চেয়েছি বলতে পারি প্রতিমা, কিন্তু কী পেয়েছি তার পুরোপুরি হদিশ পাইনি তো।

প্রতিমা : শ্রীমন্ত, কে কবে কোনো সন্ধানে আগে থাকতে জানতে পেরেছে পরে কী পাবে না পাবে ? বাবার কাছে শুনেছি, যেমন জাহাজের যে-অংশ জলের মধ্যে ডুবে থাকে সে আমাদের ভার বয় ব'লেই আমরা জাহাজের উপরতলায় চলাফেরা করতে পারি, তেমনি পাওয়ার বেলায় : আমরা যা-ই কেন না পাই তার না জানি সূচনা না পরিশেষ। তাই তুমি তত্ত্ব ছেড়ে তথ্যের খবরই দাও আজ—সেন্টিমেন্টাল মতন শোনায় শোনাক না—বলছ তো জজ বা জুরির কাছে নয়, সহপাঠিনী শুভার্থিনীর কাছে।

শ্রীমন্ত : তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির চেয়েও আমাকে চম্‌কে ··· তোমার এই দরদী রূপ—যে-রূপের পূর্ণিমা-প্রকাশ আমাকে মুগ্ধ করেছিল আমার অসুখে। কাকাবাবু চেয়েছিলেন আমাকে নার্সিং হোম-এ পাঠাতে। কিন্তু তুমি, প্রতিমা, এগিয়ে এসে ভার নিলে আমার শুশ্রূষায়। তুমি জানো না এজন্যে আমি কতবার তোমাকে মনে মনে বলেছি যে তুমি আমার কাছে এসেছ বিধাতার আশীর্বাদ হ'য়ে।

প্রতিমা (গাঢ় কণ্ঠে) : এবার কিন্তু সত্যিই সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠেছ।

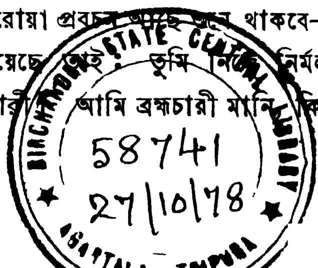
শ্রীমন্ত (উদ্দীপ্ত) : মোটেই না, আর কেন ,আমি তোমাকে কৃপার দেবদূতী ব'লে বরণ করেছিলাম জানো ? যখনই আমার মনে ভয় আসত—তোমার চাহনিতে, মৃদু হাসিতে, স্নেহস্পর্শে সব উবে যেত, মনে হ'ত যে, অসুখে যে ভাগ্যবান্ তোমার মতন ধাত্রী পেয়েছে তার শেষরক্ষা হবেই হবে।

প্রতিমা (ওর হাত টেনে নিয়ে) : আর তুমি আমার কাছে এসেছিলে সেই দেশের প্রতিনিধি হ'য়ে—যে- দেশকে আমি ছেলেবেলা থেকেই ভালোবেসে এসেছি বাবার কাছে মহাভারত রামায়ণ পুরাণের নানা কাহিনী শুনে। কিন্তু আমাকেও রেখে ঢেকে বলতে হবে—নৈলে তুমিও শেষে শোধ তুলবে আমাকে সেন্টিমেন্টাল নাম দিয়ে।··· কী জানো শ্রীমন্ত, আমি ছেলে-বেলা থেকেই সাড়া দিতে পারিনি এদেশের প্র্যাক্‌টিক্যাল সুবুদ্ধির "যা পেয়েছি তাকেই ভাঙিয়ে খাওয়ার" মন্ত্রে, যাকে সবাই বলে : to make the best of what one has—অর্থাৎ নাস্তিক ইহলৌকিকতার উপদেশ। আমার মনে হয়েছে বরাবরই যে, যে-সত্যকে পেলে মন ভ'রে টইটুম্বুর হ'য়ে ওঠে সেই সত্যের লোভই কেবল আমাদের ঠিক পথে চালায়। বাবার কাছে গীতার পাঠ নিতে আমার কী যে ভালো লাগত—(উচ্ছ্বাসকে দাবিয়ে) বিশেষ ক'রে একটি শ্লোক—"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" আমার অন্তর যেন হাততালি দিয়ে উঠত : "এই এই এই—যা পেলে মন আর কিছুর কাছেই হাত পাতে না সেই পরশমণিকেই সব আগে পেতে হবে।" তোমাকে দেখে মনে হ'ল—বাবা আমার জন্যেই তোমাকে এখানে ধ'রে রেখেছেন ; মনে হ'ল—এপথে আমি একলা চলতে পারতাম না। তাই তুমি এলে সহপাঠীর ছদ্মবেশে—না, ঠিক বলা হ'ল না, আমি বলতে চাইছি—এ ভবিতব্য তোমাকে এখানে আসতেই হ'ত আমার সহযাত্রী হ'য়ে আমাকে বল দিতে, পথ দেখাতে।

শ্রীমন্ত (গাঢ় কণ্ঠে) : বাড়াবাড়ি করো না প্রতিমা। আমি তোমাকে বল দেব—যে-আমি কথায় কথায় ভয়ে কেঁপে উঠে লজ্জায় মুখ ঢাকি ?

প্রতিমা : সে তোমার বাইরের ঠাট। অর্থাৎ তুমি বাইরে দুর্বল হ'লেও অন্তরে সবল। নৈলে আজ পর্যন্ত এমন শুচি সবল পবিত্র থাকতে পারতে না কখনই। একটা কথা বলব ? তোমার হয়ত একটু আশ্চর্য ঠেকবে—যে, একদিক দিয়ে ভয় তোমাকে কিছুটা বাঁচিয়েই দিয়েছে। তাই হাল্কা মেয়েদের মহলে তুমি উঁকি দাওনি, শুধু দেহেই নয়, মনেও র'য়ে গেছ নির্মল, শুচি, ব্রহ্মচারী।

শ্রীমন্ত (হেসে) : আমাদের একটা ঘরোয়া প্রবচন আছে জান থাকবে— যে, ন্যাবা রুগী হলদে দেখে। তোমার হয়েছে তাই : তুমি নিজে নির্মলা "ভার্জিন", তাই সবাইকেই দেখ নির্মল ব্রহ্মচারী। আমি ব্রহ্মচারী মানি, কিন্তু



শুচি নই ভাই। শুচি হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়, ঠাকুরের বিশেষ করুণা না থাকলে কেউ পারে না চারদিকের অশুচি চিন্তার ছোঁয়াচ কাটাতে। আমি কতবার পড়বার মুখে দৈবী কৃপায় বেঁচে গেছি তার আভাস দিতেও লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়। কিন্তু তুমি আমাদের থাকের মানুষ নও প্রতিমা! তোমার সংযম দেখে, তোমার আশ্চর্য ভারতপ্রীতির কথা শুনে, তোমার প্রতিপদেই বাস্তবকে পাশ কাটিয়ে আদর্শকে বরণ করার মধ্যে আমি চাক্ষুষ করেছি এক জন্মশুদ্ধার প্রতিমা। তোমার নামটি নাম নয়—উপাধিই বলব। কেবল আমি হ'লে আর একটু জুড়ে দিতাম—অমলা প্রতিমা। আমার অনেক সময়েই মনে হয়েছে যে, তোমার মতন মেয়ে এদেশে জন্মায় ব'লেই ইংলণ্ড এত বড হয়েছে।

প্রতিমা (হেসে): ভেবে দেখেছ কি—তোমার উচ্ছ্বাসকে সত্য ব'লে মঞ্জুর করলে বলতে হয়—তোমাদের দেশও বড় হয়েছে ইংরাজ মা-র গর্ভেও আমার মতন ভারত পূজারিনী জন্মায় ব'লে? (থেমে) এ কথার কথা নয় শ্রীমন্ত, কারণ এদেশের আবহে আমি গ'ড়ে উঠলেও তোমাদের দেশকেই আমার অন্তর বরণ করেছে আমার জন্মভূমি ব'লে। কিন্তু তোমার যুক্তির কু-প্রয়োগের কথা যেতে দাও—

শ্রীমন্ত: কু-প্রয়োগ!

প্রতিমা: নয়? আমি যদি অমলা কুমারী হই তবে মানতেই হবে—বাঙালী ও ইংরাজের রক্ত মিশিয়ে তবে সে-অমলতা গ'ড়ে উঠেছে। কিন্তু সে যাক। তোমার সেন্টিমেণ্টাল স্তুতি শুনতে শুনতে আমার হাসি এসেছিল—জানো?

শ্রীমন্ত (ক্ষুণ্ণ): হাসি!

প্রতিমা: রাগ কোরো না ভাই, তুমি আমাকে যে-তপমাই দাও না কেন—আমি তো হাড়ে হাড়ে জানি—আমি এদেশের মাটিতে গজালেও আসলে পরদেশী। বিশ্বাস না হয়, কলেজে আমার যে-কোনো সখীকে জিজ্ঞাসা কোরো—সে বলবেই বলবে যে, আমি exotic—এদেশের আবহাওয়ায় থাপ খাই না—যেমন নিবেদিতা থাপ খেতেন না।

শ্রীমন্ত: কিন্তু নিবেদিতার বাপ মা সখীরা তাঁকে ভালো তো বাসতেন?

প্রতিমা: ভালোবাসবেন না কেন? কিন্তু ভালোবাসা এক, স্বজন মনে করা আর। না, তাঁর নিজের নানা খেদ পড়তে পড়তে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া

যায় যে, তাঁর আত্মীয় বন্ধুরা সবাই তাঁকে উদ্ভট নাম দিত। (হেসে) না শ্রীমন্ত, সব দেশেই এমন মানুষ জন্মায় যারা কিছুতেই জন্মভূমিকে স্বদেশ ব'লে বরণ করতে পারে না। আমার কথাই নাও না কেন: আমি আশৈশব তোমাদের দেশকে কেন আপন মনে করতাম বলতে পারো? কেন স্বপ্ন দেখতাম—কবে তোমাদের দেশে যাব নিবেদিতার মতন নিজেকে নিবেদন ক'রে? (হেসে) তবে তাঁর চেয়ে আমার ভাগ্য ভালো—তোমাদের দেশে গিয়ে আমাকে নাম বদলাতে হবে না। আর যখন যাব তখন তুমি আমার কপালে "লেবেল" জুড়ে দিও—অমলা প্রতিমা—আমার অমলতার আদর্শকেও উস্কে দিতে।

শ্রীমন্ত: আমি ফের বাগ্বিতণ্ডায় হার মানছি প্রতিমা। কারণ তুমি শুধু আদর্শে ভারতীয়া নও, বুদ্ধিতেও নৈয়ায়িক—কাকাবাবুর কাছেই বোধহয় ন্যায়শাস্ত্র পড়েছ। কিন্তু যাক সেকথা। আমার বাঁচোয়া এই যে, তুমি অন্তরে পরদেশী হ'লেও দেখতে ইংরাজবালাই বটে। মানে, তুমি হাজার শাড়ী চুড়ি বাজু পায়েল প'রে ভারতনাট্যের নাচ নাচো না কেন, তোমাকে দেখে কেউ বলবে না—বাঙালী।

প্রতিমা (রুখে): বাংলা দেশের সবাই কি বাঙালী ভাই, না বলবে নিবেদিতার জন্মভূমি আয়র্লণ্ড ছিল ব'লে তিনি ছিলেন আইরিশ? মরুক গে। নিবেদিতার প্রসঙ্গ এসে গেছে ঠিক সময়েই। কারণ মেয়েদের মধ্যে তিনিই আমার আদর্শ। এমন কি আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে, ভারতবর্ষকে যে আমি আমার প্রাণের প্রণাম নিবেদন করতে পেরেছি সে তাঁরই আশীর্বাদে। মেয়ে বলে তাঁকে কোন্ মূর্খ? সাক্ষাৎ অগ্নিশিখা ভাই, তাই প্রতিপদে চলতেন দেখিয়ে—কেন বিদেশী ফ্যাশন কালচার খতিয়ে আলেয়া, আর ভারতীয় ভাব আদর্শ ধ্রুবতারা।

শ্রীমন্ত (সানন্দে): এখানে তোমার সঙ্গে আমি একমত, প্রতিমা, কারণ আমারো মনে হয়েছে অনেকবারই যে, আমাদের এ সাহেবিয়ানার ভ্রষ্ট যুগে বিদেশ থেকে এসেছিলেন দুটি মানুষ আমাদের চিনিয়ে দিতে আমাদের পুণ্য-ভূমির শাশ্বত স্বরূপ: প্রথমে নিবেদিতা, তারপরে কৃষ্ণপ্রেম। জানি না তাঁর নামধাম কীর্তিকলাপের তুমি খবর রাখো কি না।

প্রতিমা: বাবার কাছে শুনেছি তিনি এক বাঙালী গুরুমার শিষ্য হ'য়ে বনবাসী হয়েছিলেন শেষজীবনে। কেবল, কিছু মনে কোরো না ভাই, আমি

চাই না বনবাসিনী হ'তে, চাই নিবেদিতার মতন ভারতের মন্ত্রচারণী হ'তে। না, শুধু চারণী নয়—সেবিকা। আমাকে ভুল বুঝো না। বনবাস বা অজ্ঞাতবাস কারুর কারুর স্বধর্ম হ'তে পারে—যাঁরা বিলাস ভোগ আমোদ-প্রমোদ ছেড়ে নিঃস্ব যোগী তপস্বী হ'তে চান, তাঁদের সত্যিই আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি তাঁদের সাধনার জন্যে, নিষ্ঠার জন্যে—বিশ্বাস করি তাঁরাও ভারতের সেবা করেছেন। They also serve who only stand and wait—মিল্টনের এ মহাবাক্যেও আমার মনের পূর্ণ সায় আছে। কিন্তু আমি চাই নিবেদিতার পথে চলতে—তাঁর সখী হ'তে নয়, তাঁর দীক্ষায় যতটা পারি ভারতের আদর্শে ভারতের দরিদ্রনারায়ণের সেবা ক'রে ধন্য হ'তে। তুমি আমার এ আদর্শকে আরো স্পষ্ট ক'রে আরো উজ্জ্বল ক'রে ধরেছ আমার চোখের সামনে—তাই তোমাকে আমি ভালোবেসেছি—কিন্তু তোমার গৃহিণী হ'তে নয়—তোমাকে টেনে আমার সহচারী করতে ভারতেরি দীক্ষায়—সকলের সেবায়। (হেসে) কিন্তু নিয়তির বিধান বড় বিচিত্র—না? কারণ যে এল পথ দেখাতে আমি চাই তাকেই পথে বসাতে…ঐ যে—

মোটর শ্-শ্ শব্দে গেটে মোড় নেয়, ওরা উঠে দাঁড়ায়।

॥ আট ॥

মার্থা মোটর থেকে নেমেই প্রতিমাকে বলে তিরস্কারের স্বরে: "তোকে বলিনি শ্রীমন্তর তদারক করতে? এর নাম তদারক—ঠাণ্ডায় ওকে বাইরে বাগানে বসিয়ে রেখে গালগল্প?"

শ্রীমন্ত: ঠাণ্ডা কোথায় কাকিমা? মাসটা যে জুন। আকাশে এখনো আলোর দোললীলা চলেছে।

মার্থা: কবিত্ব থাক—হিম পড়ছে, চলো ঘরে। ফের জ্বর আসে নি তো?

শ্রীমন্ত: জ্বর আসবে কেন? আমি দিব্যি শাল মুড়ি দিয়ে…

শাস্ত্রীজি: কম্বল—কম্বল—অন্তত কম্বল মুড়ি দেওয়া উচিত ছিল। এইমাত্র যাকে দেখতে গিয়েছিলাম তার হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগেই নিউমোনিয়া হয়েছে—চলো চলো ওঠো। প্রতিমা, গরম কফি নিয়ে আয় এক দৌড়ে।

শ্রীমন্ত (উঠে): কফি আনতে হবে না কাকাবাবু। প্রতিমা আসর সরগরম রেখেছিল নিবেদিতার আগুন জেলে।

শাস্ত্রীজি (হেসে): হ্যাঁ—ঐ এক মেয়ে! কোথায় বিকেলে পিং পং টেনিস খেলবে—না কলেজ থেকে ফিরেই ফের বই মুখে ক'রে বসা! আর কী সব বই! বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, শ্রীঅরবিন্দ এঁদের বক্তৃতা কবিতা—কী নয়?

মার্থা: এবার তুমি লেকচার স্বরু করলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তবে আর প্রতিমা কী অপরাধ করল?

শাস্ত্রীজি: অপরাধ নয়? মেয়ের কথা স্বরু হলে যে ফুরোতে চায় না।

শ্রীমন্ত: কথা নয় কাকাবাবু, আলোচনা আলোচনা।

মার্থা: এত কী আলোচনা শুনি?

প্রতিমা: শুনবে মা শুনবে। আমরা মুখিয়ে আছি তোমাকে বলতে। কেবল সাবধান—শুনে থ হ'য়ে যেও না। আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হ'য়ে গেছে। এখন শুধু তোমাদের অনুমতির অপেক্ষা। চলো···

॥ নয় ॥

সব শুনে শাস্ত্রীজি বললেন: "শ্রীমন্তর মতন জামাই পেতে কোন বাপ মা-র অসাধ? কেবল মুস্কিল—বৌদিকে নিয়ে। তিনি বিষম আচারী—প্রায় শুচিবাই। আর একটা কথা ভাববার আছে: প্রতিমা আমাদের দেশকে দূর থেকে যে-রঙিন দূরবীনের মধ্যে দিয়ে দেখেছে কাছ থেকে দেখলে কি সে-রঙ মিলিয়ে যাবে না?"

প্রতিমা: নিবেদিতার—

শাস্ত্রীজি: ভাগবতে বলেছে একটি লাখ কথার এক কথা মা: যে, অসামান্য তীর্থযাত্রীদের গুণগান করা সহজ হ'লেও তাঁদের পথে চলা মোটেই সহজ নয়। শুকদেব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন রুদ্রদেবের—যিনি বিষ খেয়ে হজম ক'রে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। কিন্তু তাই ব'লে যেন গড়পড়তারা বিষ খেয়ে অমর হ'তে না ছোটে—বলেছিলেন মুনি।

মার্থা : কিন্তু গড়পড়তাদের নাম উল্লেখ করছ কেন? তোমার মেয়ে আর যাই হোক গড়পড়তা নয়।

শাস্ত্রীজি : মানি। কিন্তু তাই ব'লে নিবেদিতা—

শ্রীমন্ত : কিছু মনে করবেন না কাকাবাবু—কিন্তু নিবেদিতা যখন এদেশে ছিলেন তখন কেউ কি ভাবতে পারত পরে তিনি অগ্নিশিখা তপস্বিনী হ'য়ে দাঁড়াবেন? ব্যারিষ্টার গান্ধিজিকে দেখে কেউ কি কল্পনা করতে পারত তিনি পরে কীভাবে মহাত্মা দেশনায়ক হ'য়ে বিশ্বের প্রণামী পাবেন?

শাস্ত্রীজি (হেসে) : প্রেমে পড়লে মুখ ফোটে শুনেছিলাম। কিন্তু ভয় কাটে কি?

প্রতিমা : এতে ভয়ের কী আছে বাবা—বিশেষ যখন আজ সব দেশেই মেয়েরা কাঁটাবনে পথ কেটে চলেছে অসাধ্য সাধন করতে? পাছে শেষরক্ষা না হয় এই ভয়ে কি পাহাড় দেখে ঘরে ফিরে আরামবাগে সস্তা ফুলের চাষ ক'রেই কাল কাটাব?

মার্থা : উপমাটি শ্রুতিমধুর। কেবল একটি কথা : সবাই কিছু উঁচু পাহাড়ে নিশ্বাস নিতে পারে না। তাছাড়া অনেকের মুখেই শুনেছি যে ভারতবর্ষে এত রোগ বিশৃঙ্খলা অনাচার আছে যে বিদেশীরা বড় আশা ক'রে গিয়ে নিরাশ হ'য়ে কেবল দিন গোনে—কবে দেশে ফিরে জুড়োবে।

শাস্ত্রী : কিন্তু এ ধরণের যুক্তি দুদিকেই কাটে। কৃষ্ণপ্রেমের মতন অনেক বিদেশীরই আবার মনে হয় য়ুরোপ ডেকেডেণ্ট—ধুমধামের ডামাডোলে দেহ মন প্রাণ কিছুটা খোরাক পেলেও অন্তরাত্মা থাকে উপবাসে। ভারতবর্ষে গিয়ে তাদের মনে হয়—এই এই এই—এরি নাম স্বদেশ। তবে উল্টোদিকে আরো একটা কথা ভাববার আছে। কথাটা এই যে, নিবেদিতার বেলায় ভুললে চলবে না যে তিনি মহীয়সী হয়েছিলেন মহাগুরু বিবেকানন্দের ডাকে। শ্রীমন্ত সোনার চাঁদ ছেলে, একশোবার,—কিন্তু···

শ্রীমন্ত (মুখ নিচু ক'রে) : আমি মানি কাকাবাবু, আমি বিবেকানন্দও নই, গুরুও নই। আমি শুধু প্রতিমার সহযাত্রী—বন্ধু।

মার্থা : কিন্তু যখন তাকে গৃহিণী ক'রে তুমি সংসারী হবে···

প্রতিমা : সংসারী বলতে যা বোঝায় আমরা তা হ'ব না মা কোনোদিনই। শ্রীমন্তকে একথা খোলাখুলিই বলেছি, সে রাজীও হয়েছে।

শাস্ত্রীজি : ঠিক বুঝলাম না—যখন সন্তান হবে…

প্রতিমা : সন্তান হবে না মা। আমাদের বিবাহ হবে সহযোগ, সহবাস নয়।

শাস্ত্রীজি : কী বলছিস তুই? আমার ধাঁধা লাগছে…বিবাহ হবে অথচ সহবাস হবে না…

প্রতিমা : বিবাহ এখানে নামমাত্র। বিবাহ না হ'লে সমবয়সী ছেলে-মেয়ের মিতালির পথে যেসব দুরন্ত মিথ্যে বাধা আসে সেসব এড়িয়ে চলতে চাই আমরা। অবিশ্যি শ্রীমন্তের মনোভাব আমি পুরোপুরি জানি না, ও বলবে ভেবেচিন্তে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমরা যে পরস্পরকে আপন জন ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছি একথা বলতে বাধবে না আমাদের কারুরই। (শ্রীমন্তকে) এবার বলো তুমি বাবাকে যা তোমার বলবার আছে।

শ্রীমন্ত : আপনার কাছে এর পরে আর কী আমার বলবার থাকতে পারে কাকাবাবু—শুধু এই কথাটি ছাড়া যে আমি প্রতিমার যোগ্য স্বামী নই। তাই আমাকে ও যে স্বামী ব'লে নয় সহযাত্রী ব'লেই বরণ করতে চায় এতে আমি কিছুটা ভরসা পেয়েছি বৈ কি। ভবিষ্যতে কী হবে না হবে এ ভাবনা—পরমহংসদেবের ভাষায়—মনের বাজে খরচ। আমি কেবল চাই খাঁটি থাকতে ভাবের ঘরে চুরি না ক'রে—ঠিক ওর সহায় হ'তে বলব না—আমার কতটুকুই বা সাধ্য বলুন—তবে চাই ওর পথের পথিক হ'য়ে ওর সঙ্গী হ'তে। এর বেশি আর আমার কিছুই বলার নেই। তবে আমাদের এ-প্রস্তাবে যদি আপনাদের এতটুকুও আপত্তি থাকে তাহ'লে আমি কালই ফিরে যাব দেশে। কারণ প্রতিমাকে ছেড়ে এদেশে আমি টিকতে পারব না।

(খানিকক্ষণ সবাই নিশ্চুপ)

শাস্ত্রীজি : মার্থা যদি মত দেয় তবে আমি আপত্তি করব না। তোমরা দুজনেই সুবুদ্ধি আদর্শবাদী পবিত্র চিন্তাশীল। তবে মার্থা…

মার্থা : আমার মন ঠিক অতটা উদার নয়। কিন্তু তোমাদের ভবিষ্যৎ তোমাদেরি হাতে, আমি তো এক্ষেত্রে অবান্তর। কেবল একটা কথা বলি—তোমাদের বিবাহ হবে জেনে আমি উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পেয়েছি। কারণ এ-বিষয়ে আমি একটু সেকেলে—তাই বিবাহে আমার বিশ্বাস টলে নি।

শাস্ত্রীজি : বেশ, আমি আজ রাত্রেই প্রসাদদাকে লিখব সব কথা খোলাখুলি।

॥ দশ ॥

শাস্ত্রীজি প্রসাদকে সব কথাই খুলে লিখলেন, কেবল প্রতিমার বিবাহের পরেও ব্রহ্মচর্যের প্রস্তাবটি বাদ। মার্থাকে চিঠিটি প'ড়ে শোনাতেই সে বলল: "কিন্তু ব্রহ্মচর্যের প্রসঙ্গটি একেবারে চেপে গেলে কেন?" শাস্ত্রীজি হেসে বললেন: "তুমি কি ক্ষেপেছ মার্থা? বিয়ে ক'রে ব্রহ্মচর্য—এ কি একটা কথা হ'ল?" মার্থা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম উল্লেখ করতেই তিনি বললেন নমস্কার ক'রে: "এ-পার্থিব মাটিতে ঐ একজনই জন্মেছিলেন পারিজাত—অঝরা ফুল। আর তিনিও জেনেশুনে বধূবরণ করেননি—শৈশবেই বিয়ে করেছিলেন এক শিশুকে—কেন, তাঁর জীবনভাষ্যে ফুটে ওঠেনি কি—যার নাম অসাধ্যসাধন? বলতে কি, এই অসম্ভবকে সম্ভব করতেই তাঁকে নিজে হাতে গড়েছিলেন নারায়ণ—এ কাড়াকাড়ি লোভ-মোহের জগতে এক নিষ্কামনার নিখুঁৎ অবতার। প্রতিমার মন উড়ুক্কু, তাই সে ভাবে মন উড়তে চাইলেই দেহে পাখা গজায়। তবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না, চিন্তাময়ী! মনে রেখো রবীন্দ্রনাথের গভীর দর্শন—শিবঠাকুর যে শিবঠাকুর, তিনিও পঞ্চশরকে দগ্ধ ক'রে নিশ্চিহ্ন করতে পারেননি, শুধু বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। একথার সেরা প্রমাণ—বিবাহের আগে যিনি উগ্র ব্রহ্মচারী ছিলেন তিনিও পার্বতীকে বিবাহ করার পরে সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি—মৃন্ময়ী কামনা-বাসনা আকাশকুসুমের রঙে রঙিন—কিন্তু অতন্দ্র প্রজাপতির দৃষ্টিবিভ্রম হয় না, তিনি জানেন কিসে কী হয়।"

প্রসাদ শাস্ত্রীজির চিঠি পেয়ে মহা খুশী। কিন্তু হ'লে হবে কি—নির্মলা কপাল চাপড়ে হাহাকার সুরু ক'রে দিল: "এই ভয়েই আমি ছেলেকে মোহিনীদের দেশে পাঠাতে চাইনি গো···যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয় গো···শেষকালে এক ধিঙ্গি মেমসাহেবকে শাঁকঘণ্টা বাজিয়ে বরণ করা গো···

প্রসাদ: মেম কোথায়? সে তো সুবোধেরও মেয়ে···

নির্মলা: তবু মা মেম তো।

প্রসাদ: কিন্তু বাপ কি বাঙালী নয়? কুলীন, তার ওপর শাস্ত্রী···

নির্মলা: ছেলেমেয়েরা গ'ড়ে ওঠে মায়ের প্রভাবেই বেশি।

প্রসাদ: কে বলল? কথায় বলে ছেলেরা মাতৃমুখী, মেয়েরা পিতৃমুখী। তাছাড়া প্রতিমা সুবোধকে ভক্তি করে দেবতার মত।

নির্মলা: রাখো রাখো—মেমসাহেবে কী জানবে শ্রদ্ধা-ভক্তির মর্ম?

এইরকম অশ্রান্ত কথা কাটাকাটি ··শেষটায় বিপন্ন হ'য়ে প্রসাদ আদ্যন্ত সব কথা বন্ধুকে লিখে দিলেন কিছুই গোপন না ক'রে। শেষে লিখলেন: "আমি প্রতিমাকে বরণ করতে চাইলে কী হবে ভাই? নির্মলার ঐ এক ধুয়ো: মেমবউকে কেমন ক'রে কোল দেবে? নবদ্বীপের গোঁসাইঘরের মেয়ে তো···" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শাস্ত্রীজি বিষণ্ণমুখে দীর্ঘপত্রটি শ্রীমন্তকে প'ড়ে শোনালেন, কিন্তু প্রতিমার কাছে কিছু ভাঙলেন না। শ্রীমন্ত শুনে গুম্ হ'য়ে রইল।

শাস্ত্রীজি ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন: "প্রতিমাকে একটু রেখে ঢেকে বলতে হবে বাবা! যে অভিমানী মেয়ে···!"

শ্রীমন্ত মুখ নিচু ক'রে থাকে। শাস্ত্রীজি একটু পরে বললেন: আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী করা উচিত।"

শ্রীমন্ত বলল বিষণ্ণ কণ্ঠে: "কাকিমা কী বলেন?"

শাস্ত্রীজি: তাকে আমি এখনো কিছু বলি নি। ভাবলাম আগে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

শ্রীমন্ত: আমি কী বলব কাকাবাবু? মা আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন···কিন্তু চান আমাকে নিজের দখলে রাখতে। আমাদের দেশে অনেক মা-ই মনে করেন মেয়ে পরের ঘরে গেলেও ছেলেকে রাখতে হবে নিজের কবলে—জানেনই তো।

শাস্ত্রীজি: সব মা না। আমার নিজের মা ছিলেন এ বিষয়ে উদার, তাই এমন কি মার্থার সঙ্গে আমার বিবাহেও আপত্তি করেন নি, যদিও তিনি বেশী খুশী হতেন নিশ্চয়ই যদি আমি বাঙালী বউকে ঘরে আনতাম।...অবিশ্যি আমি জানতাম বৌদির এ-বিয়েতে পুরো সায় থাকতেই পারে না, কিন্তু আশা করেছিলাম তিনি প্রথমে কান্নাকাটি করলেও শেষে বুঝবেনই বুঝবেন—যাকে বলে hoping against hope.

দোরে টোকা মেরে মার্থা ঢুকে বলল: "কী ব্যাপার? শ্রীমন্তের বাপ-মা রাজী নন?"

শাস্ত্রী (একটু চুপ ক'রে থেকে) : প্রসাদ রাজী, কিন্তু বৌদি নারাজ : মেম বউকে কেমন ক'রে বরণ করবেন এই তাঁর ধুয়ো।

মার্থা : কিন্তু প্রতিমার তো চার আনাও মেম নয়।

শাস্ত্রীজি : কিন্তু তিনি তো সেকথা জানেন না...দাঁড়িয়ে কেন? বোসো না।

মার্থা পাণ্ডুর মুখে ব'সে চোখ মোছে।

শাস্ত্রীজি (তার পিঠে হাত রেখে) : কাঁদে না। আমার মনে হয় বিয়ে হ'য়ে গেলে বৌদি বুঝবেন—প্রথমটা গা-সওয়া হ'য়ে যাবে, পরে প্রতিমার রূপে গুণে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে...

মার্থা : Wish father to the thought. ভুলো না—সবদেশেই মেয়েরা বেশি তাকায় পিছন দিকে—পরিবর্তন চায় না—বিশেষ ছেলে মেয়ের বিয়েতে।

শাস্ত্রীজি : সব বুঝলাম, কিন্তু এখন কর্তব্য কী?

মার্থা (ফের চোখ মুছে) : প্রতিমা দারুণ অভিমানী মেয়ে—বিষম ঘা খাবে···তবু···আমার মনে হয় কী করা উচিত না উচিত ওরাই ভেবে ঠিক করুক। যতই বলো না কেন, বাপ মার ধারণার সঙ্গে ছেলেমেয়ের ধারণার অমিল না হ'য়েই পারে না—বিশেষ ক'রে বিবাহের ব্যাপারে। তাছাড়া এ দৃষ্টিভঙ্গির বিবাদে যারা সামনের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে চলে আর যারা পিছু ডাকে সাড়া দিয়ে পিছিয়ে পড়ে তাদের সন্ধি হবে কেমন করে?

শাস্ত্রীজি : সন্ধি হয় বৈ কি—হয় না যা তার নাম মিতালি। তবু 'চলাচলম্ ইদং সর্বং'—সবই চলেছে : কেউ হু হু ক'রে, কেউ গড়িয়ে গড়িয়ে। চলা বন্ধ হ'তে পারে না—তাই শেষটায় রফা হয় আপোষে।

মার্থা (ফের চোখ মুছে) : কিন্তু...প্রতিমা যে-রোখালো মেয়ে—আপোষে রাজী হবে ব'লে আমার মনে হয় না। হয়ত···এর পরে শ্রীমস্তর ছায়াও মাড়াবে না—কে বলতে পারে?

শাস্ত্রীজি : বড় কাঁচা কথা হ'য়ে গেল মার্থা। তুমি ধ'রে নিচ্ছ—মানুষ সব সময়েই চলে নিজের ইচ্ছায় নিজের পথে নিজের মতে। গীতায় পড়ো নি কি—ঠাকুর আড়াল থেকে নানা সুতো টানেন···

মার্থা : আর আমরা পুতুল নাচ নাচি—এই না? (উদ্দীপ্ত) না না না, আমি একথা মানি না, মানি না, মানি না। যদি ফ্রী উইল না থাকে তবে জীবন তো বিড়ম্বনা।

শাস্ত্রীজি: লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন যে বিড়ম্বনা এ-বিষয়ে কি সন্দেহ আছে মার্থা? আমরা যাকে ফ্রী উইল বলি এত জাঁক ক'রে—তার মূলে যেসব তাগিদ তৃষ্ণা গা-ঢাকা হ'য়ে থাকে দুচারজন দ্রষ্টা ঋষি ছাড়া কেউ কি তাদের খবর পায়? আমারি দৃষ্টান্ত নাও না কেন। আমি যৌবনে মনে করতাম—যেহেতু আমি কুলীন ব্রাহ্মণ সেহেতু শুদ্ধাচারী আমাকে হ'তেই হবে —অন্তত বংশগৌরব বজায় রাখতে। কিন্তু হরি হরি, তোমার টানে দুদিনে ভেসে গেল কত দিনের সংস্কার, কত শাস্ত্রের টঙ্কার, কত পৌরুষের হুঙ্কার! এ-টানের শ্রুতিমধুর নাম প্রেম, কিন্তু আসল নাম জাদু—যার অঘটনী মায়া মুহূর্তে নয়কে হয় করতে পারে। কিন্তু এ-আলোচনা অবান্তর না হ'লেও জরুরি নয়। জরুরী হ'ল—বর্তমান সমস্যার সমাধান খোঁজা।

মার্থা: তোমার কথাই ঠিক। (ভেবে) আমার মনে হয়—প্রতিমাকে শ্রীমন্তর সামনে সব কথা খুলে বলাই পন্থা—আরো এই জন্যে যে আমরা চুপ ক'রে থাকলেও তোমার বৌদিটি কখনই চুপ ক'রে থাকবেন না। এরকম সংঘাতের ক্ষেত্রে যে আগে মুখ খোলে সে একটু এগিয়ে থাকে ব'লে তার ওকালতির জোর একটু বাড়ে।

শাস্ত্রীজি: বলেছ ভালো, কারণ এখানে চরম শাস্ত্র যুক্তি নয়, ওকালতি—মানে কে আগে প্রথম ধাক্কাটি দিতে পারে।

মার্থা: আমি প্রতিমাকে ডেকে আনছি।

* * *

প্রতিমাকে দিভানে বসিয়ে তার পিঠে হাত রেখে শাস্ত্রীজি কোমল স্বরে বললেন: শোনো মা। আমরা ভেবেচিন্তে ঠিক করেছি যে তোমাকে সব কথা খোলাখুলিই বলব।"

প্রতিমা: বলতে হবে না বাবা। শ্রীমন্তর মা-র কথা তো?

শাস্ত্রীজি: কেমন ক'রে জানলে?

প্রতিমা: জানা কি খুব শক্ত বাবা? তুমি তাঁকে লিখেছিলে শ্রীমন্ত আমাকে বিবাহ করতে চায়। এটুকু জানার পরে তিনি কী উত্তর দেবেন আন্দাজ করতে হ'লে কি দৈবজ্ঞ হ'তে হয়? তাছাড়া কাল শেষ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম তোমার বিষণ্ন মুখ, তুমি শ্রীমন্তকে বলছ—ওর মার মত নেই।

মার্থা (প্রতিমার কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে): কিন্তু···শোন্, শ্রীমন্তর বাবার মত আছে।

প্রতিমা : তাঁকে আমার ধন্যবাদ দিয়ে তার কোরো মা। কিন্তু এ-বিবাহে আরো একজনের মত থাকা দরকার—আমার। আমার মত নেই।

শ্রীমন্ত (চমকে) : সে কি? কাল বললে তুমি—

প্রতিমা (শান্ত দৃঢ় স্বরে) : কাল মত ছিল, আজ নেই। শ্রীমন্ত! এ জগতে সবই সচল—শুধু মত থাকবে অনড় অচল?

শাস্ত্রীজি : ছি, রাগ করে না মা ··

প্রতিমা : এখানে রাগের প্রশ্ন ওঠে না বাবা। ওঠে দুটি প্রশ্নের : আমার আত্মমর্যাদার আর শ্রীমন্তর সুখের। এ-বিবাহ হ'লে দুটিরই হবে ভরাডুবি—বিশেষ ক'রে শ্রীমন্তর সাংসারিক সুখশান্তির—যে মা বলতে অজ্ঞান।

শাস্ত্রীজি : মা, আত্মমর্যাদা মানুষের নিজের হাতে।

শ্রীমন্ত : আর আমি মা বলতে অজ্ঞান একথা···

প্রতিমা : তোমার মুখে দিনের পর দিন তাঁর স্নেহের স্তবগান শোনার পরেও কি এ সম্বন্ধে সংশয় থাকতে পারে কারুর?

শ্রীমন্ত : মাকে আমি ভালোবাসি—মানি—

প্রতিমা : ভালোবাসা নয় শ্রীমন্ত—অর্চনা, আরাধনা। তোমার সংসারে তিনিই ইষ্টদেবী, তুমি বড় জোর পূজারী, কিন্তু আমি বিদেশিনী ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্যা···

(শাস্ত্রীজির কোলে ভেঙে পড়ে চাপা কান্নার তোড়ে)

শাস্ত্রীজি (ওর মুখ তুলে বুকে টেনে নিয়ে) : কী পাগল! প্রসাদদা এমন কিছু কথা লেখেন নি···শুধু লিখেছেন স্ত্রীর বহুদিনের সংস্কার তো ·· শোনো! ছি মা! কাঁদে না। মুখ তোলো—লক্ষ্মীটি!

প্রতিমা (মুখ তুলে চোখ মুছে শান্ত স্বরে) : আমার অন্যায় হয়েছে বাবা। তবে নিজের মর্যাদা নিজেই খুইয়েছি কান্নাকাটি ক'রে···(ফের চোখ মোছে)

মার্থা (ওকে টেনে বুকে নিয়ে) : ছি ছি, তুমি কি সেই জাতের মেয়ে মা? তোমার ঠাট ঠমক সংযম সুষমা দেখলে আমার মন গৌরবে ভ'রে ওঠে যে এমন মেয়েকে আমি গর্ভে ধরেছি, দিনের পর দিন ফুটে উঠতে দেখেছি অঝরা ফুলের ম'ত। তোমার বাবাও কতদিন উজিয়ে উঠেছেন বলতে তোমার মনের জোরের কথা, অসম সাহসের কথা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কথা, আশ্চর্য মেধার কথা, চরিত্রের পবিত্রতার কথা···এমন মেয়ে ক-টা বাপ মা পায় শুনি?

প্রতিমা (চোখের জলে হাসি ফুটিয়ে): তাহ'লে আমিও পাল্টা কম্প্লিমেন্ট দিয়ে শোধ তুলি—ক-টা মেয়ে পায় এমন উদার মধুর বাপ মা যারা ভালোবাসতেও জানে, গুণগান করতেও জানে? আমি যদি ফের জন্মাই মা—এই প্রার্থনাই করব যেন পরজন্মে এম্নি বাপ মা পাই। কিন্তু হ'লে হবে কি মা। আমি জানি—আমি না হোমরের হেলেন, না শেক্সপীয়রের পোর্শিয়া, না মাদাম কুরি, না ভার্জিনিয়া উল্ফ্। আমি চাই শুধু নিবেদিতার মতন ভারতবর্ষের সেবা করতে—সম্ভব হ'লে এমন কোনো সহযাত্রীর সহযোগে যাকে আমি ভালোবাসতে পারি। এর বেশি উচ্চাশা আমার সত্যিই নেই মা, আমি যে জানি আমার দুর্বল ডানায় আমি কতদূর উড়তে পারি। শ্রীমন্তকে আমি সাথী চেয়েছিলাম দুটি কারণে—এক, আমি ভারতবর্ষকেই মনে করি আমার স্বপ্নের স্বদেশ; দুই, শ্রীমন্তের নানা গুণ থাকলেও ওর অন্তরে কোথায় একটা দুর্বলতা বাসা বেঁধেছে যাকে বরখাস্ত ক'রে ওকে নির্ভীক করা সম্ভব। ওর সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি হয়েছিল সত্যিই, কিন্তু মালাবদলের পথে যে প্রতিবন্ধক আছে এও আমার অগোচর ছিল না। ওর মা যে আমার প্রতি বিরূপ হবে এও আমি জানতাম বৈ কি, কিন্তু নিজেকে ভুলিয়েছিলাম জপ ক'রে যে, ও তাঁকে রাজী করাতে পারবে। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন বিবাহ ক'রে ওকে আমি অসুখী করতে চাই না। না শ্রীমন্ত, আমাকে তুমি মিথ্যে আশ্বাস দিও না, লক্ষ্মীটি!

শাস্ত্রীজি (উদ্বিগ্ন): কিন্তু তুমি এখন কী করবে তাহ'লে?

প্রতিমা: এখন আমাদের ছুটি একমাস। এ-মাসটা আমি একটু একলা থেকে নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হ'তে চাই। আমার এক সখী আছেন জেনেভাতে, তিনি অনেকদিন ধ'রে আমাকে ডাকছেন। তোমরা যদি অনুমতি দাও তাহ'লে আমি তার কাছে গিয়ে একটু চুপচাপ থাকব। আমার নানা চিন্তা একটু থিতিয়ে গেলে পাবই পাব পথের দিশা।

শাস্ত্রীজি: তোমাকে আমি শুধু স্নেহই করি না মা, শ্রদ্ধা করি। তাই অনুমতির প্রশ্নই ওঠে না।

॥ এগারো ॥

শাস্ত্রীজির সঙ্গে শ্রীমন্ত লিখেছিল একটি ছোট চিঠি প্রসাদকে। মাকে লিখতে সাহস পায় নি, কারণ এ-দুরাশাকে সে একবারও মনে ঠাঁই দেয় নি যে, তিনি বিদেশিনীকে এখনই সাদরে পুত্রবধূ ব'লে বরণ ক'রে নেবেন। এ-চিঠির কথা সে শাস্ত্রীজিকে বলে নি, কিন্তু প্রতিমাকে দেখিয়েছিল। তাতে সে লিখেছিল: "মা-কে আপনি একটু বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই রাজী হবেন।" প্রতিমা সে-চিঠি প'ড়ে গুম্ হয়ে যায়। শ্রীমন্ত ওকে ধরলে শুধু বলেছিল: "থাক এখন এ আলোচনা। কেবল মনে রেখো শেক্সপীয়র কী বলেছিলেন: The course of true love never did run smooth." ব্যস।

তবে আশা দুরাশাকেও নাকচ করে তো—তাই সে মনে করেছিল বিলেতে প্রতিমাকে বিয়ে করার পরে দেশে ফিরলে মা শেষটায় বুঝবেনই বুঝবেন। কিন্তু প্রসাদের চিঠি আসার পর প্রতিমা যখন রুখে উঠে সত্যিই জেনেভায় চ'লে গেল ঘোষণা ক'রে যে সে এমন ঘরে পদার্পণও করতে পারবে না যেখানে মানুষের দাম ধরা হয় বংশের ও জাতির নিরিখে তখন সে নিরাশ হ'য়ে শাস্ত্রীজির কাছে বিদায় চাইল। তিনি বিষণ্ণ মুখে অনুমতি দিলে সে ঠিক করল—জর্মন ও ফরাসী ভাষা শিখতে যাবে প্যারিসে। যাবার আগে সে শাস্ত্রীজির কাছ থেকে প্রতিমার জেনেভার সখীর নাম ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর পকেটবুকে টুকে নিল।

কিন্তু স্বভাবে যে দোমনা, মনস্থির করতে সে বেগ পাবে না? শ্রীমন্ত একবার ভাবে দেশে ফিরে যাওয়াই ভালো। কিন্তু প্রতিমাকে তাহলে চিরকালের মতন বিদায় দিতে হবে ভাবতেও বুকের মধ্যে টনটন ক'রে ওঠে। এদেশে থাকলে দেখা হওয়া সম্ভব—অন্তত: আশা সাঁয় দেয়—"নিশ্চয়ই"। কিন্তু দেশে ফিরে গেলে·· না না না।

এই সময়ে ওর এক নরওয়েজিয়ান সহপাঠী ওকে বলল: "পারিস যাচ্ছ, বেশ কথা। কেবল আমার মনে হয়—নরওয়ে ঘুরে যাও। সেখানকার জলহাওয়া চমৎকার—অন্তত সাত আটদিন নরওয়েতে কাটিয়ে পুরোপুরি স্বস্থ

হ'য়ে পারিস যাওয়া ভালো—আরো এইজন্যে যে, নরওয়ের ফিওর্ড দেখতে যেমন অপরূপ তেমনি তার হাওয়া—প্রচুর ozone আছে। তাছাড়া ফিওর্ডের ধারে ধারে বহু মনোরম হোটেল আছে—নির্জনতাও যথেষ্ট মিলবে সেখানে।' শ্রীমন্ত নরওয়ে সম্বন্ধে পড়েছিল দুএকটি ভ্রমণবৃত্তান্ত। তাই মন সানন্দেই সায় দিল এ "ল্যাণ্ড অফ দি মিড্‌নাইট সান" ঘুরে পারিস যাওয়ার প্রস্তাবে। দেশে ফিরে বলতেও পারবে যে, সে এমন আজব দেশ ঘুরে এসেছে যেখানে জুন জুলাইয়ে নিশুত রাতেও সূর্যদেব ডুব মারেন না! অবাক হওয়ার চেয়েও বড় কথা সবাইকে অবাক ক'রে দেওয়া, কে না জানে?

নরওয়ের জাহাজে চ'ড়ে প্রথম দিন জাহাজের দুলুনিতে "সীসিক" হ'য়ে কেবিনে ধুঁকতে ধুঁকতে পরিতাপে ওর মন আরো অশান্ত হ'য়ে উঠল। কেন মরতে এ-দুরন্ত সমুদ্রে এল! কিন্তু পরদিন একেবারে চমৎকার। সমুদ্রের বুক হ্রদের মতন প্রশান্ত, আর কী শোভা, স্নিগ্ধ বাতাস! দেখতে দেখতে সে চাঙ্গা হ'য়ে উঠল।

হঠাৎ দেখা এক দূরাত্মীয়ার সঙ্গে—তাঁকে ও মাসিমা ডাকত। তিনি সাজগোজে নিখুঁৎ, কমনীয়া। বিয়ে করেছিলেন এক আই এম এস ডাক্তারকে। ডাক্তার সাহেব সুস্থ অবস্থায় অমায়িক। কিন্তু মদ খেলেই একেবারে ভোলবদল—প্রায় ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইডের মতন। মাসিমা ছিলেন মিশুক ও নৃত্যপ্রিয়া। জাহাজে এক যুবকের সঙ্গে একটু বেশি নাচানাচি করতেই সাহেবভর্তার কর্তামি সুরু হ'ল। একদিন স্ত্রীকে মদ খেয়ে যা তা বললেন। স্ত্রী কেঁদে শ্রীমন্তকে বলল: দেখ তো কাণ্ড। মদ খেয়ে —" বলতেই ডাক্তর সাহেব এসে স্ত্রীর ঘাড় ধ'রে বলল: "ঘরে এসো—তোমার ছেনালি ঢের সয়েছি—you shameless flirt।" শ্রীমন্ত আর থাকতে পারল না, দুরন্ত মেশোর মুষ্টি সরিয়ে দিয়ে বলল: "আপনি ভয় পাবেন না মাসিমা,···আমি···আমি···" বলতে না বলতে মেশো ওকে ঘুষি মারল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্ত মেশোর বুকে ঠেলা দিল। মাতাল মেশো টাল সামলাতে না পেরে একেবারে ভূমিশয্যা। হৈ হৈ কাণ্ড, অন্য আরোহীরা ছুটে এল, স্টুয়ার্ডে, দুটি নার্স, জাহাজের ডাক্তার···

মেশো নিশ্চল। ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে বলল: "কিছু না, সামান্য কংকাশন অফ দি ব্রেন···দুদিনেই সেরে যাবে।"

তারপর সবাই এসে একে একে শ্রীমন্তকে অভিনন্দন। খুশী নয় কে?

প্রথমা নার্স বলল : "উনি যে স্ত্রীর সঙ্গে কী দুর্ব্যবহার করেন—it has to be seen to be believed."

দ্বিতীয়া নার্স : শুধু দুর্ব্যবহার নয়, গায়ে হাত তোলেন।

শ্রীমন্ত : স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেন ! বলেন কি ?

স্টুয়ার্ড : কিন্তু সুস্থ অবস্থায় আর এক মানুষ—সদালাপী, রসিক। মদই হয়েছে ওঁর কাল। আর মাতাল হ'লেই হ'য়ে ওঠেন দারুণ জেলস।"

নিঃসম্বিৎকে সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে কেবিনে নিয়ে যাওয়ার পরে মাসিমা শ্রীমন্তকে বললেন : "তোমাকে যে কী ব'লে ধন্যবাদ দেব শ্রীমন্ত !"

শ্রীমন্ত (কুণ্ঠিত) : না না···

মাসিমা : না না কী ? ও যে গুণ্ডা—ওর ত্রিসীমানায় কেউ আসতে সাহস করে না ওর মাতাল অবস্থায়। তোমার সৎসাহস দেখে আমি সত্যিই কী বলব ভেবে পাচ্ছি না !"

শ্রীমন্ত নিজেও কম আশ্চর্য হয় নি। আজ একটুও তো ভয় পায় নি সত্যিই ! ··আনন্দে বিস্ময়ে রাতে ঘুম হ'ল না। শেষ রাতে উঠে প্রতিমাকে লিখল ফলিয়ে ওর মাসিমার কথা। কিন্তু চিঠিটা ডাকে দিতে গিয়ে সঙ্কোচ এলো। মনে হ'ল যেন নিজের বাহাদুরি জাহির করতে চাইছে। চিটিটা ছিঁড়ে ফেলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে দেখল প্রতিমা উজ্জ্বল মুখে বলছে : "এই তো চাই···"। জেগে উঠে ফের মনে বিষাদ ছেয়ে এল। আহা, স্বপ্ন যদি সত্য হত···!

॥ বারো ॥

পরদিন শ্রীমন্তর সকালে উঠতে দেরি হ'য়ে গেল। তার দুরন্ত মেশোর ঘুষি পড়েছিল বাঁ কপালে, চোখের কাছে। ভাগ্যক্রমে চোখ বেঁচে গিয়েছিল কিন্তু কপালে একটি কুলের মতন গোলক ফুলে উঠল। ব্যথায় ক্লিষ্ট হ'য়ে জাহাজের ডাক্তারের কাছে যেতেই মাসিমার সঙ্গে দেখা। মাসিমা কোমল কণ্ঠে বললেন : "আহা ! কালই পটি বাঁধা উচিত ছিল বাবা !"

শ্রীমন্ত : না না, এ বিশেষ কিছু নয়—ফুলো দেখতে দেখতে ক'মে যাবে। (মাসিমাকে) মেশো কেমন আছেন?

মাসিমা : মোটের উপর ভালোই, তবে আজ শুয়ে শুয়ে কাৎরাতে হবে। কিন্তু এরকম মারামারি ক'রে জখম হন উনি মাঝে মাঝেই—মদ খেলেই হ'য়ে ওঠেন তিরিক্ষি আর 'জেলস'—তাই ওঁর কথা যেতে দাও, বলো তুমি কেমন আছ।

শ্রীমন্ত : কপাল একটু দবদব করছে—তা তো করবেই। বিকেলে নিশ্চয় ব্যথা কমে যাবে।

মাসিমা : না না, চলো এক্ষনি ডাক্তারের কাছে ··

* * *

ডাক্তার (পরীক্ষা ক'রে) : না, রক্ত জ'মে "ক্লট" হয় নি—কাজেই সীরিয়স নয়। আমি পটি বেঁধে দিচ্ছি আর ওষুধও দিচ্ছি। (পটি বেঁধে দুটি পুরিয়া দিয়ে) এখন একটি আর রাতে একটি। কাল ব্যথা থাকবে না যদিও ফুলো কমতে হয়ত দুএকদিন লাগবে।

শ্রীমন্ত : ধন্যবাদ।

ডাক্তার : You are welcome—যাই আপনার (হেসে) আদরের "আংক্‌ল্‌"-কে দেখতে।

(ত্রয়ীর কলহাস্য)

ডাক্তার প্রস্থান করলে পর মাসিমা শ্রীমন্তর মাথায় সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে বললেন : "আহা, বাবা, আমার জন্যেই তোমার এমন বিশ্রী ঘা খেতে হ'ল।"

শ্রীমন্ত (সসঙ্কোচে) : কী বলেন মাসিমা! আমিই দুঃখিত—তাঁকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার জন্যে। হাজার হোক মেশো তো।

মাসিমা : সেজন্যে কিছু ভেবো না বাবা। কিন্তু সেকথা থাক—তুমি নরওয়েতে কোথায় কোথায় যাবে ঠিক করেছ কি?

শ্রীমন্ত : না, ভাবছি আগে ক্রিস্টিয়ানিয়া হ'য়ে বার্গেন যাব, সেখানে শুনেছি রাতদুপুরেও সূর্য থাকেন বেঁচে ব'র্তে।

মাসিমা : আমি বলি কি, তুমি আগে বার্গেন যাও। সেখানকার জলহাওয়া চমৎকার। তিনচারদিন সেখান থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে তবে যেও ক্রিস্টিয়ানিয়া বা আর যেখানে যেতে চাও। কেবল একটি কথা ভুলো না—

stavanger-এ Lyse Fiord-এর চারিদিকে ঘুরতে। সে স্বপ্নের মতন পরিবেশে সব ক্লান্তি ভুলে যাবে। সে-ফিওর্ডে নানা স্টীমারে শান্তি পাবে এমন যে সে অবর্ণনীয়। সূর্য মাঝরাতে উঠুন বা না উঠুন কারুর বিশেষ কিছু যায় আসে না। দুদিন বাদে জানলা বন্ধ করলেই রাত। কিন্তু ফিওর্ডের তুলনা নেই। আমরা তিন তিন বার গিয়েছি নরওয়ে আর প্রতিবারই এ-অতুলনীয় ফিওর্ডে স্টীমারে ঘুরেছি।

শ্রীমন্ত: ধন্যবাদ, মাসিমা। তাহ'লে আমি আগে বার্গেনেই যাব। ফিওর্ড দেখবার সাধ আমার যে কতদিন থেকে!

মাসিমা: আর এক কথা: বার্গেনে আমার এক নরওয়েজিয়ান সখী আছেন নাম Amilia undset তাঁকে আমি তার ক'রে দিচ্ছি। তাঁর ওখানে উঠলে তুমি শুধু যে আরামে থাকবে তাই নয়; তাঁর মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে যাবে। আর শুধু মধুর ব্যবহার নয়—কী সুন্দরী যে! বয়স প্রায় পঞ্চাশ কিন্তু দেখলে মনে হয় ত্রিশ পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। তাঁর ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর তোমাকে দেব লাঞ্চের সময়।

॥ তেরো ॥

শ্রীমন্ত দুদিন বাদে রাত এগারোটায় যখন বার্গেনে পৌছল তখন সূর্যদেবের দাক্ষিণ্য একটুও কমে নি। আশ্চর্য না হ'য়েও কেউ পারে? কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার চেয়েও বড়—মুগ্ধ হওয়া। শ্রীমতী আমিলিয়া ষ্টেশনে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ও স্টেশনে নামতেই তিনি এগিয়ে এসে ফরাসী ভাষায় বললেন: "Soyez le leienvenu"!* শ্রীমন্ত মাসিমার কাছে এ-শ্রীমন্তিনীর একটি ফটো দেখেছিল, তাই চিনতে বেগ পেতে হয় নি। ধন্যবাদ দিয়ে বলল: "Merci, madame.."

মাদাম বললেন: "তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। থাকবে তো দুচারদিন?"

---

* স্বাগতম্।

শ্রীমন্ত : দুদিনের বেশি নয়, কারণ একটু ঘুরে দেখতে চাই এখানকার নানা ফিওর্ড।

মাদাম : সে-ব্যবস্থা হবে। এখন চলো—আমার বাড়ী কাছেই—দু-মিনিটের পথ, হাঁটতে কষ্ট হবে না তো ?

শ্রীমন্ত : সে কি মাদাম ? আমার বয়স মাত্র তেইশ···

মাদাম : বেশ বেশ (এক জোয়ানকে ডেকে তার হাতে শ্রীমন্তর স্যুটকেস ও ব্রীফকেস দিয়ে) আমার বাড়ি!

(জোয়ান মাথা হেলিয়ে হেসে অদৃশ্য)

শ্রীমন্ত (উদ্বিগ্ন) : ও চ'লে গেল যে···

মাদাম (হেসে) : কোনো ভয় নেই। এখানে তোমার খোলা বাক্স যদি চব্বিশ ঘণ্টা পথে প'ড়ে থাকে তাহ'লেও কেউ ছোঁবে না।

॥ চোদ্দ ॥

কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর। শ্রীমন্ত মাদাম আমিলিয়ার স্নেহ-পরিচর্যায় মুগ্ধ হ'লেও তাঁর প্রতি নরম করস্পর্শেই ওর মনে পড়ত প্রতিমার শুশ্রূষার কথা। ওর অসুখের সময় সে-ও এমনি ওর কপালে মাথায় হাত বুলোত। মাদাম আমিলিয়া ওর বিবর্ণ কপালে পটি বেঁধে দিতেন রোজ। ওর মনে হ'ত শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের কথা : যেখানেই যাই মা বোনের দেখা মেলে ; সন্ন্যাসী হব কেমন ক'রে ? প্রতিমার জন্য কখনো মন এমন টনটন করেনি।

দুদিন পরে ফুলোটা একেবারে সেরে গেলে ও মাদামের কাছে বিদায় নিয়ে তিন-চারটি ফিওর্ডের শোভা উপভোগ ক'রেও শান্তি পেল না, অতৃপ্ত মনে পৌঁছল পারিসে—"বেল ভ্যু" হোটেলে। দিনরাত কেবলই মন কেমন ক'রে প্রতিমার জন্যে। সে কি চিরদিনের জন্যেই বিদায় নিয়েছে ? এও কি সম্ভব ? ···তাকে লিখবে কি জাহাজের কথা ? তাহ'লে কি ওর মন ফিরবে না ?··· যাবে কি সোজা জেনেভায় দুর্গা ব'লে ?···এইরকম চিন্তার জটলায় অতিষ্ঠ হ'য়ে শেষে নিজেকে ধমকালো : না, এ-দুর্বলতাকে আমল দেওয়ার নাম

পৌরুষ নয়। কিন্তু হায় রে, মন মানা মানে না—কত রকম উল্টোপাল্টা কথাই যে ওর মনে ঘূর্ণির ম'ত ঘুরতে থাকে!

হোটেলের বাগানে একলাই কাটায় দিনের পর দিন। বই পড়ে, রেডিওতে গান শোনে, সকালে সন্ধ্যায় Bois de Boulogne-এ বেড়াতে যায় …কিন্তু মনের আবর্ত থিতিয়ে আসে না তো! শেষে জোর ক'রে কলম নিয়ে বসে—প্রতিমাকে চিঠি লিখে অনুরোধ করবেই করবে যা থাকে কপালে।

দু-দুবার লিখে চিঠি ছিঁড়ে ফেলে। প্রতিমা হয়ত বলবে "সেণ্টিমেণ্টাল", কে জানে? শেষে লিখল:

"প্রতিমা, তুমি আমার কাছে বিদায় পর্যন্ত নিলে না, একবার জিজ্ঞাসাও করলে না মাকে আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করতে পারব কি না। এর মূলে হয়ত আছে আমার পৌরুষের প্রতি তোমার একটা নিহিত অবজ্ঞা—জানি না। কিন্তু যদি তুমি আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করতে তাহ'লে আমি তোমাকে বলতাম দুটি কথা। প্রথম, তোমাকে নিয়ে আমি কলকাতায় গেলে আমার বিশ্বাস মা তোমাকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহে আপত্তি করতেন না। এ-বিশ্বাস নিছক ভ্রান্তিবিলাস নয়। তুমি জানো মানুষের মন যেমন দুঃখে কঠিন হয় তেমনি আনন্দে নরমও হয়। তাছাড়া ভুলো না— বাবা এক্ষেত্রে ষোলো আনা আমার দিকে। আমার কয়েকটি আত্মীয়াও আছেন যাঁরা উদার। তাঁরাও নিশ্চয়ই তোমার রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে আমাদের তরফে দাঁড়াতেন। মানুষের মত বা ধারণা তো অনড় অচল নয়। অনেক সময়েই যে প্রতিকূল মন অনুকূল হয় নানা প্ররোচনায়, একথা তুমিও মানো—কেন না তোমার কাছেই শুনেছি যে, তোমার মাতামহ প্রথম দিকে কাকাবাবুর সঙ্গে তোমার মা-র বিবাহে ঘোর আপত্তি করলেও পরে কাকিমাকেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উইল ক'রে দিয়ে যান।

"দ্বিতীয় কথা এই যে, আমি সহজেই ভয় পাই একথা সত্য হলেও আমি যে ভয়কে জয় করতে চেষ্টা করি—বিশেষ ক'রে তোমার চোখে বড় হ'তে— এও তোমার অজানা নেই। তোমাকে ভালোবেসে আমার একটি মস্ত উপলব্ধি হয়েছে: যে প্রেম অনেক বাধাকেই ডিঙিয়ে যেতে পারে। ভয় একটি মস্ত বাধা মানি, কিন্তু অলঙ্ঘ্য বাধা নয়—বিশেষ ক'রে ভালোবাসার এলাকায়। None but the brave deserves the fair এ-সূত্রের ভাষ্য কি এই নয় যে, ভয়ের কালোকে প্রেমের আলোয় নাকচ করা সম্ভব তথা কর্তব্য? আমি

প্রার্থনার দিকে আরো ঝুঁকেছি শক্তি পেতে যাতে ক'রে আমি তোমার মনের মতন হ'তে পারি। একথা তোমাকে অনেকবারই বলেছি—তুমি শুনে খুশীও হয়েছিলে। তাই আমার অনুরোধ—তুমি আমাকে অন্তত আর একটা 'চান্স' দাও। আমি বিশ্বাস করি তন্ত্রের একটি কথা: যে মেয়েরা পুরুষদের 'শক্তি।' শুধু তন্ত্র নয়, অনেক মহানুভব মনীষীও একথা বলেছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁদের নজির জড়ো ক'রে আমি তোমার মনের মোড় ফেরাতে চাই না। আমি চাই প্রেমের নির্দেশে নত হ'য়ে তোমার মন পেতে। একসময়ে আমার মনে হ'ত কারুর কাছেই নত হওয়া ঠিক নয়। কিন্তু তোমাকে ভালোবেসে আমি উপলব্ধি করেছি যে, প্রেমাঙ্গণ রণাঙ্গনের সগোত্র নয়। যুদ্ধে যে ওঠে সেই জেতে, প্রেমে যে মাথা নোয়ায় সেই জয়ী হয়। তাই তোমাকে অনুরোধ করতে আমার বাধছে না একটু। আর একটা কথা—তোমাকে নরওয়েতে একটি চিঠি লিখেও ছিঁড়ে ফেলেছিলাম সে-চিঠি পাছে তুমি ভুল বোঝো এই ভয়ে। লণ্ডন থেকে আমি নরওয়ে যাই। জাহাজে এক মাতাল তাঁর স্ত্রীকে অপমান করেন—আমি বাধা দিতে আমার কপালে ঘুঁষি মারেন। আমি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিই ভয় না পেয়ে। আমার কপালের ফুলো ও ব্যথা সারতে চার পাঁচ দিন লেগেছিল। কিন্তু আমার কী মনে হয়েছিল জানো? যে, তোমাকে ভালোবেসেই আমি এই শক্তি পেয়েছিলাম—ভয় পাই নি একটুও। একথা তোমাকে আজ লিখছি দোমনা হ'য়ে। কারণ আমার মনে হয় তুমি একে বীরত্বের বা বাহাদুরির বড়াই ভেবে হয়ত ভুল বুঝতেও পারো। তবু আজ না লিখে পারলাম না কারণ আমার মনে হয় আমাকে তুমি যে ভালোবেসেছিলে এ-স্মৃতি তোমার মনে ফের সেই ভুলে যাওয়া প্রেমকে জাগিয়ে তুলতে পারে—কে জানে?

"হয়ত তুমি এ-চিঠির উত্তর দেবে না। মেয়েদের সঙ্গে আমি আদৌ মিশি নি তো—কেমন ক'রে জানব তারা ভালোবাসাকে ঠিক কী চোখে দেখে? আমি কেবল আমার নিজের কথা বলতে পারি: যে, তোমার প্রতি আমার প্রেমের মূলে আছে এমন গভীর শ্রদ্ধা যার নড়চড় হ'তেই পারে না। কিন্তু আমাকে তুমি একটি চিঠি লিখো, বা টেলিফোন কোরো, লক্ষ্মীটি প্রতিমা! এ-হোটেলের নাম ও ঠিকানা BELLE VUE, RUE DE CLICHY, টেলিফোন নম্বর—১৩৪৫৯।

ইতি তোমার প্রসন্নতাপ্রার্থী শ্রীমন্ত।

লিখতে লিখতে শ্রীমন্তর চোখে জল ভ'রে আসে। সে ভাবোচ্ছ্বাসকে সাম্‌লে নিয়ে লেখে তার মা-কে: "মা, আমার প্রণাম নিও। আজ একটি দুঃখ আমাকে বিঁধছে নিরন্তরই যে, তুমি বাবাকে দিয়ে কাকাবাবুকে চিঠি না লিখিয়ে সোজা আমাকে লিখলে না। কিন্তু যাক সে কথা। আজ তোমাকে শুধু এই নিদারুণ সংবাদটি দিতে চাই যে, তুমি বিষম কান্নাকাটি করেছ শুনে প্রতিমা বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেছে, আমাকে ব'লে—তাকে ভুলে যেতে। কিন্তু তুমি যদি সে-অপরূপাকে দেখতে মা, তাহ'লে বুঝতেই বুঝতে যে, আমার পক্ষে তাকে ভোলা তেমনি অসম্ভব যেমন অসম্ভব তোমার পক্ষে আমাকে ভুলে যাওয়া। না, তারও বেশি। কারণ তোমাকে আমি গভীর ভক্তি করলেও তুমি জীবনকে যে-চোখে দেখে এসেছ সে-দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমাগতই তাকায় পিছন দিকে। প্রতিমাকে ভালোবেসে আমি তার দৃষ্টিভঙ্গিকে বরণ করেছি কেন না তার দৃষ্টি সামনের দিকে, তার আদর্শ—এগিয়ে চলা অনাগতের ডাকে। একথার ভাষ্য আমি পেয়েছি আরো কাকাবাবুর জীবন থেকে, কিন্তু কা সে-ভাষ্য বলতে গেলে এমন অনেক কিছু আমাকে বলতে হবে যা তুমি বুঝবে না, বা ভুল বুঝে হয়ত মনে কষ্ট পাবে। তোমার মনে আমি কষ্ট দিতে চাই না মা, বিশ্বাস কোরো। কাকাবাবু আমাকে চমৎকার ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন—তোমার জীবনদর্শন গ'ড়ে উঠেছে আমাদের দেশে যে-সব সংস্কার থেকে এ-যুগের মানুষ সে-সব সংস্কারের বেড়াজাল থেকে নিরন্তরই মুক্তি চাইছে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়ে। তিনি আরো একটি কথা বলেন প্রায়ই —যে, নিয়তির ধাক্কা খেয়ে দিকে দিকে উধাও হ'লেও মানুষ দেখতে পায় শুধু ধাক্কার ফল, নিয়তির যে-হাত ধাক্কা দেয় তার খবর পায় না। তাই তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই, কেবল একটি খেদ আমার মনকে আজ পেয়ে বসেছে—যে, তুমি আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো নি কোনোদিনই। কিন্তু এর জন্যেও তোমাকে দূষব না কারণ কোনো মা-ই তার সন্তানকে পুরোপুরি বুঝতে পারে না, তুমি পারবে কেমন ক'রে? এবার আমার কথা কিছু বলি।

"প্রতিমা জেনেভা চ'লে যাবার পর আমার পক্ষে লণ্ডনে থাকা সম্ভব নয়। তাই আমি পারিসে একটি ছোট শান্ত হোটেলে এসেছি কিছুদিন একলা থেকে নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি হ'তে। আমার হাতে যা রেস্ত আছে যথেষ্ট—পাঁচ ছয় মাস বেশ আরামেই এ-হোটেলে কাটাতে পারব। তারপর

যদি জর্মনি যাই চার পাঁচ মাসের জন্যে, বাবা আশা করি আমাকে টাকা পাঠাতে গররাজী হবেন না। তুমি আমার জন্যে ভেবো না মা। প্রতিমার সাহসের ছোঁয়াচে আমার মনেও কিছুটা সাহস জেগে উঠেছে। মনে পড়ে ছেলেবেলায় দেখতাম চুম্বকে ঘষলে লোহাও চুম্বক হ'য়ে ওঠে। আমাদের মনও তেমনি রঙিয়ে ওঠে প্রিয়জনের মনের রঙে। কেবল আমি ভাবতাম ভয় কাটানো অসম্ভব। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখছি অসম্ভবও হয় ভালোবাসার জাদুতে। আমার প্রণাম নিও তোমরা। বাবাকে বোলো আমাকে এখন থেকে পারিসের ঠিকানায়ই লিখতে। ঠিকানাটি নিচে দিলাম। টেলিফোন নম্বরও। ইতি। তোমার আনন্দ গোপাল (যদিও আজ নিরানন্দের কবলে পড়েছে)।"

কিন্তু পারিসে একলা থেকে ওর মনে শান্তি এল না। কেবলই মনে পড়ে প্রতিমার চোখের জলের কথা। মনে গুনগুনিয়ে ওঠে একটি বিখ্যাত গানের অস্থায়ী অন্তরা :

সে-মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে, পড়ে মনে ?
নিখিল ছাড়িয়ে কেন কেন চাই সেই জানে ?
এ-নিখিল স্বর মাঝে
তারি স্বর কানে বাজে,
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে।

॥ পনেরো ॥

শ্রীমন্তর বাল্যবন্ধু নিশান্ত চৌধুরী পারিসে কার্তিয়ে লাত্যাঁ-য় (quartier latin) কায়েম হয়েছিল। সর্বন্ (sorbonne) বিশ্ববিদ্যালয়ে সে তালিম নিত দুটি ভাষার—জর্মন ও ফরাসী। ধনীর পুত্র, সাবালক। শ্রীমন্তকে সে লণ্ডনে লিখত পারিসে এলে যেন তার অতিথি হয়। পারিসে এসে শ্রীমন্ত তাকে ধন্যবাদ দিয়ে লেখে—সে পারিসে এসেছে কিন্তু উঠেছে "বেল ভ্যু" হোটেলে। হোটেলের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দিয়ে পুনশ্চ-তে লিখল—সুবিধাম'ত তাকে লিখলে বা টেলিফোন করলে সে সানন্দেই

নিশান্তের সঙ্গে দেখা করবে, তবে এখন নয়, কিছুদিন সে একলা থাকতে চায় কোনো বিশেষ কারণে। নিশান্ত উত্তরে তাকে লিখল: "ভেবো না, আমি তোমাকে টেলিফোন করব, তুমি আমাকে জানালে তবে—তার আগে নয়।"

পারিসে এসে এক সপ্তাহ শ্রীমন্ত একলাই কাটাল। কেবল সকালে বিকেলে যেত **Bois de Bonlogne** এর রম্য কাফেতে। বেশ লাগত দেখতে নানা জাতের নানা প্রমোদার্থীকে। কখনো কখনো যেত **jardin de Luxembourg**-এ।

শ্রীমন্ত রোজই প্রতিমার চিঠি পাবে আশা করত, কিন্তু না পেয়ে বিষণ্ণ হ'ত। দশবারোদিন পরে মন একটু শান্ত হ'তে নিশান্তকে টেলিফোন করল। নিশান্ত খুশী হ'য়ে ওকে সান্ধ্য ডিনারে নিমন্ত্রণ করল। বলল: "দেরি কোরো না কিন্তু, ঠিক সাতটায় আসা চাই, অনেক কথা আছে। কী যে আনন্দ হচ্ছে!—এসো এসো এসো।"

॥ যোলো ॥

ঠিক সাতটায় নিশান্তের ঘরের বাইরে ঘণ্টার বোতাম টিপতেই নিশান্ত দোর খুলে শ্রীমন্তকে জড়িয়ে ধরল। বলল: "একটু আগে আসতে বলেছিলাম—ঘণ্টাখানেক সময় পাব বলে। অনেক অনেক কিছু বলার আছে।"

শ্রীমন্ত: ডিনার বুঝি সাড়ে সাতটায়?

নিশান্ত: না, সাড়ে আটটায়। তবে লিদিয়া একটু কাজে বাইরে গেছে, ফিরতে আটটা হবে।

শ্রীমন্ত (বিস্মিত): লিদিয়া?

নিশান্ত (হাসিমুখে): উপস্থিত আমার প্রণয়িনী মনামি,* তবে মাস দুই বাদে—সেপ্টেম্বরে আমাদের বিবাহ হবে।

* Mon ami—বন্ধুবর।

শ্রীমন্ত: অভিনন্দন! অভিনন্দন!

নিশান্ত তখন ওকে "দিভানে" পাশে বসিয়ে ব'লে চলল অনর্গল। তার চুম্বক এই:

দেড় বৎসর আগে নিশান্ত পারিসে এসে কার্তিয়ে লাঁত্যা-য় একটি সুরম্য ঘরে কায়েম হ'য়ে সর্বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্মন ও ফরাসীভাষায় তালিম নেওয়া সুরু করে। পরীক্ষা দিতে নয়—শুধু ভাষা শিখতে। অতঃপর বন্ধুবান্ধবীকে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে এক আনন্দচক্র রচনা করে। নাচ গান ও ভোজ। ফল—যা হবার: দেখতে দেখতে হ'য়ে দাঁড়ায় নামজাদা তথা জনপ্রিয়। নানা সখা সখীকে নিয়ে যায় থিয়েটারে কন্সার্টে অপেরায়, বনভোজনে। উপাধি লাভ হয়—প্র্যাঁস শার্মাঁ (Prince charmant)—অস্কার ওয়াইলডের বিখ্যাত উপন্যাসের প্রখ্যাত নায়কের পদবী।

কার্তিয়ে লাত্যাঁ পল্লীতে শিল্পী চিত্রী ছাত্রদের মধ্যে যে-কেউ প্রণয়িনীকে গৃহিণীর নামে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কেউ জিজ্ঞাসা করে না অজ্ঞাতকুলশীলার সম্বন্ধে কোনো কথা। সবাই তাকে বরণ করে সুভদ্রা ব'লে। নিশান্ত প্রথমে জানত না, কিন্তু জানবামাত্র তার মন গান গেয়ে উঠল; এ কী অনবদ্য বিধি! ঘরণী অস্তি অথচ চিরদিন ভরণপোষণের দায়িত্ব নাস্তি? অপি চ, এসব ললনাদের মধ্যে অনেক সময়ে সুকুমারীদেরও দেখা মেলে! কারুর হয়ত হঠাৎ পদস্খলন হয়েছে, কেউ হয়ত কোনো প্রণয়ীর ডাকে কুলত্যাগিনী হ'য়ে পথে বসেছে…আরো নানা দয়িতার নানা রূপ। কিন্তু নিশান্ত চায় নি কোনো স্বৈরিণীকে দয়িতার মান দিতে। তাই নাচগানের হররা সত্ত্বেও সে লম্পট হ'য়ে দাঁড়ায় নি নানা উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর দৃষ্টান্তে।

কিন্তু যৌবনের রক্ত ও আশপাশের নানা অবিবাহিত দম্পতীর সহবাস দিনের পর দিন দেখার ফলে ওর মনে হ'ল একটি সত্যিকার মনোরমাকে পেলে মন্দ কি? মনে মনে আপ্তবাক্য আবৃত্তি করল: "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।"

মানুষ যা চায় অনেক সময়েই পায় না। কিন্তু সৃষ্টি বিচিত্র, তাই এমনও হয় যে, কেউ কেউ চাইতে না চাইতে পেয়ে যায়। নিশান্ত ছিল এই ভাগ্যবানদের দলে। কিন্তু তৃষ্ণার জল মিলল এক দুর্দৈবে।

একবার প্লাস দে লা কঁকর্দ-এ ওর ট্যাক্সি মোড় নিতেই আর এক মোটরের সঙ্গে ধাক্কা। অন্য মোটরটির আরোহী তৎক্ষণাৎ মারা যায়। নিশান্ত রগ

ঘেঁষে বেঁচে যায়, কিন্তু হাতের একটি হাড় ভেঙে যায়, মাথায়ও চোট লাগে —কংকাশন্। ওর সাথী বন্ধুটি ছিল অনাহত। সে ওকে নিয়ে যায় একটি সুরম্য নার্সিং হোম-এ।

সেখানেই ওর লিডিয়ার সঙ্গে দেখা।

লিদিয়া সুভদ্র ঘরের মেয়ে। কুলত্যাগিনী হয় এক লম্পট যুবকের টানে। লিদিয়ার রূপ দেখে সে মুগ্ধ হ'য়ে কথা দেয় যে তাকে বিবাহ করবে। যুবকটি কয়েকমাস পরে লিদিয়াকে ছেড়ে চ'লে যায় আর একটি কুলবধূর সঙ্গে। লিদিয়াকে তার বাপ মা ত্যাগ করেন, লিদিয়ার কান্নাকাটিতে কান না দিয়ে। লিদিয়া অগত্যা চাকরাণীর কাজ নেয়। কিন্তু কিছুদিন বাদে তার একটি মৃত সন্তান হয়। লিদিয়ার চাকরি যায়। লিদিয়া দুঃখে নিরাশায় আত্মহত্যা করতে সীন নদীতে ঝাঁপ দেয়। তীরে একটি সাঁতারু মেয়ে ব'সে ছবি আঁকছিল। সে জলে লাফিয়ে প'ড়ে লিদিয়াকে বাঁচায় ও অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে গিয়ে কাছের এক হাসপাতালে তোলে। লিদিয়াকে হাসপাতালের ডাক্তার বহু চেষ্টায় সারিয়ে তুলে তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনে দয়ার্দ্র হ'য়ে সেই হাসপাতালেই নার্সের ক্লাসে ভর্তি ক'রে দেন। নার্সের কাজ শিখে সে সেই হাসপাতালেই নার্সের পদে বাহাল হয়। বুদ্ধিমতী মেয়ে, শুশ্রূষায় নিপুণ হ'য়ে রোগীদের শুশ্রূষায় নিজের দুঃখ ভুলবার চেষ্টা করে। কিন্তু মনের হাহাকার তাকে আবার উতলা ক'রে তোলে। এই সময়ে নিশান্ত পথে মোটর চাপা প'ড়ে আহত হ'য়ে হাসপাতালের সংলগ্ন নার্সিং হোমে ঠাঁই পায়। নার্সিং হোমের দুটি নার্স তখন বিবাহ ক'রে প্রস্থান করার দরুন লিদিয়ার পদবৃদ্ধি হয়। নার্সিং হোমের কাজ পেয়ে লিদিয়া নিশান্তর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হয়। নিশান্ত তার অসামান্য রূপে ও মধুর শুশ্রূষায় মুগ্ধ হ'য়ে তার প্রেমে প'ড়ে তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করে। কিন্তু লিদিয়া রাজী হয় না। শেষে নিশান্তের ব্যাকুলতা দেখে নরম হ'য়ে তার ঘরণী হ'তে রাজী হয় কিন্তু পরিণীতা হ'তে নয়। শেষে বলে—বিবাহে তার আর বিশ্বাস নেই, তবে কিছুদিন তার সঙ্গে থাকার পরেও যদি সহবাস সুখের হয়, আর নিশান্তর আগ্রহ উবে না যায় তবে তাকে বিবাহ করবে—নৈলে নয়। পরে নিশান্তের ঐকান্তিকায় মুগ্ধ হ'য়ে কয়েকমাস বাদে তাকে বিবাহ করতে রাজী হয়।

কাতিয়ে লাতাঁ পল্লীতে নিশান্তের প্রতিপত্তি হয়েছিল। লিদিয়ার রূপ

গুণেও সবাই আকৃষ্ট হয়। বেদনার অন্ধকারে লিদিয়ার ভাগ্যাকাশে প্রেমের নবারুণ তাকে যেন আশীর্বাদ করে। লিদিয়া যখন সুখের আশা ছেড়ে দিয়ে ভাবছিল বিধাতা কিসের তাগিদে এই মৃত্যুলোকে জীবনের গান গাইতে চেয়েছিলেন, ঠিক সেই সময়েই সহসা প্রেমের বুলবুল ওকে ডাকল আশাতীত সার্থকতার পথে। নিশান্ত তার অভিভাবক মামাকে লিদিয়ার কাহিনী জানিয়ে লিখল সে কয়েক মাস জর্মনি সুইজর্লণ্ড ও ইতালিতে কাটিয়ে নববধূকে নিয়ে দেশে ফিরবে। মামা চম্‌কে উঠলেন, কিন্তু নিরুপায়। কারণ তিনি যদিও ওর অভিভাবক ছিলেন কিন্তু সে নামমাত্র। অগত্যা নিশান্তকে লিখলেন যে, ভবিতব্যকে যখন নাকচ করা যায় না তখন নিয়তির খেলার পুতুল মানুষকে মিথ্যে দূষে কী হবে?

লিদিয়া অবশেষে নিশান্তকে ভালো না বেসে পারে নি—আরো এই জন্যে যে, এ-ভালোবাসা মামুলি প্রেম নয়—তুতরফেই এর উদ্ভব বাহ্য রূপ থেকে হ'লেও সমাপ্তি হয় দরদ সমবেদনা কৃতজ্ঞতায়। নিশান্ত শ্রীমন্তর কাছে লিদিয়ার কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে শেষে বলল: "এ-সূত্রে আমি একটি মহৎ আবিষ্কার করেছি ভাই: যে, দেশ ভাষা সংস্কৃতি রূপ এ-সবই আমাদের মনের পটে ছাপ ফেললেও সব চেয়ে বড় ছাপ প্রেমের, আর ইন্দ্রিয় বা মন দিয়ে তার গভীরতার তল পাওয়া যায় না, মাপতে গেলেই সে ফ'স্কে যায়। মলয় হাওয়ার ম'ত সে তাপকে শুধু যে গলিয়ে স্নিগ্ধ ক'রে দেয় তাই নয়, আলোর মতনই হৃদয়কে ফুটিয়ে তোলে, তাই বুঝি সে এত জীবন্ত, নিরন্ত, আনন্দময়। লিদিয়াকে আমি কী-ই বা দিয়েছি বল? একটু স্বস্তির নিরাপদ নোঙর মাত্র, কিন্তু তার কাছ থেকে পেয়েছি সুরধুনীর সুর, বসন্তের অভিনন্দন, গতির চমক।"

শ্রীমন্ত চমকে ওঠে। এ কী? এ যে তারি হৃদয়ের এক কল্পিত বিকাশের প্রতিচ্ছবি! প্রতিমাকে ভালোবেসে সে যে ঠিক এই আলোর এই রঙেরই আভাষ পেয়েছিল, যদিও সে পূর্বরাগ ফুটে উঠতে পারেনি নিশান্তের প্রাণ-বাগানে প্রস্ফুটিত নিটোল আলোপদ্মের মত। এ-উচ্ছ্বাসে কবিত্বের ছোপ লেগেছে—তাতে কী? আমরা যখনই কোনো গভীর উপলব্ধির অন্দরমহলে পৌঁছই তখন তাকে প্রকাশ করতে হ'লে কবিত্ব ছাড়া আর কে রং তুলি জুগিয়ে দেবে? শ্রীমন্ত একটু চুপ করে থেকে গাঢ়কণ্ঠে বলল: "ভাই, তুমি তোমার প্রেমের আনন্দ আর অভয়ের কথা যে এমন সরল আবেগে আমার

কাছে খুলে বললে তার প্রতিদানে আমি তোমাকে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমার অনেক ভয় ভাবনার কুয়াশা যেন একটু ফিকে হ'য়ে গেছে প্রেমের ডাকে তোমার বলিষ্ঠ সাহসের সাড়ার কাহিনী শুনে। কেবল আমার দুঃখ এই যে, তুমি ভালোবেসে পাওয়ার কোঠায় পৌঁছে পথের নির্দেশ পেয়েছ, আর আমি ভালোবেসে দিশা হারিয়ে পথ খুঁজছি। তবু বলবই বলব যে, এ হারানোর মধ্যেও এমন কিছু পাথেয় পেয়েছি যার ঠিক স্বরূপ কী এখনো ধরতে পারি নি।"

নিশান্ত (ওর কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে): কিন্তু তুমি তাকে পেয়েও হারালে কেন, কী ভাবে—আমাকে বলবে? অবিশ্যি যদি আমাকে বলতে বাধা না থাকে···

শ্রীমন্ত: সবটুকু না বলাই ভালো, কারণ বললে হয়ত তোমার একটু উদ্ভট বা সেকেলে মনে হবে। এযুগ রিয়লিষ্টদের তাঁবেদার—কথায় কথায় আমরা বলি হিরো ওয়র্শিপ অচল টাকা, অর্থাৎ গুণে মেপে বিশ্লেষণ ক'রে যার হদিশ পাই আজ তাকেই মান দেওয়া চাই—যাকে ছুঁতে পেরেও ধরতে পারি না, তার গুণগান করা চলবে না আর।

নিশান্ত: ভাই আমি তোমার মতন ভাবুক নই। তবে আমার কী মনে হয় বলব? মনে হয় এ-যুগে মানুষকে বাঁচতে হলে এমন ভারিক্কি টেক্স দিতে হয় যে, স্বপ্ন আদর্শ রোমান্সকে একেবারে উদ্ভট মনে না হ'লেও কেমন যেন মনে হয় মাটিছাড়া—volatile; কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই এযুগেও যাঁরা যুগধর্মকে বাতিল করেন তাঁদের আমরা বেশি শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্য দিই। কেন দিই তার কারণও সুবোধ্য। অতীতকে নাকচ ক'রে যাঁরা কেবল বর্তমানকেই মঞ্জুর করেন তাঁরা যেমন বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী ব'লে মনের মান পান, তেমনি বর্তমানকে পাশ কাটিয়ে যাঁরা অনাগতের আরাধনায় প্রাণকে বাজি রাখেন তাঁদের আমরা নবযুগের দিশারি বলে সনাক্ত করে প্রাণের প্রণামী দিই। দৃষ্টান্ত—বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজি, শ্বাইৎজার, শ্রীঅরবিন্দ, নিবেদিতা—ব্যাপার কী? চমকে উঠলে যে?

শ্রীমন্ত: ভাই, নিবেদিতাকে তুমিও প্রাণের প্রণামী দাও শুনে মনে পড়ল যাকে হারিয়েছি তার কথা। কারণ তার প্রাণ চায় নিবেদিতার পায়ের ছাপ দেখেই স্বপ্নতীর্থে পৌঁছতে। তাই সে চেয়েছিল আমাকে বিবাহ করে ভারতে গিয়ে নিবেদিতার মতন ভারতের সেবা করতে। তার চোখে জল আসে এ মহীয়সীর নামগানে।

নিশান্ত : কিন্তু তাহলে তুমি -তাকে হারালে বলছ কেন? তুমি কি নিবেদিতাকে মহীয়সী বলে মানো না?

শ্রীমন্ত : মানি ভাই, কিন্তু তাঁর আদর্শে আমার জীবন রঙিয়ে তুলতে ভয় পাই, কারণ প্রতিমার কাছে নিবেদিতা জলন্ত বাস্তব হলেও আমার কাছে তিনি আজো ছায়াময়ী। কিন্তু না, আমি গড়পড়তা হলেও হীনমতি নই। প্রতিমাকে আমি হারিয়েছি তার আদর্শ বরণ করতে আমি অক্ষম বলে নয়—বলতে কি, তাকে ভালোবেসে আমি আমাদের ধর্মকে প্রথম সত্যি ভালেবেসেছি একথা বলতে পারি সত্যের অপলাপ না করে। আমি তাকে হারিয়েছি সে রুখে উঠে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে বলে।

নিশান্ত : একটু ধাঁধা লাগছে ভাই, তোমার কথা শুনে...

শ্রীমন্ত : তবে শোনো বলি একটু খুলে। আংটিপর্বের অবতারণা না ক'রে সরাসর বিচ্ছেদপর্বের বর্ণনা করলে শ্রোতার ধাঁধা তো লাগবেই। তবে সংক্ষেপে বলতে হবে কারণ লিদিয়ার আসার সময় হল···

শ্রীমন্তর গলা ধরে এসেছিল। চোখে জল। টাল সামলে নিয়ে বলল কী ভাবে সে প্রথম প্রতিমার রূপে আকৃষ্ট, গুণে মুগ্ধ ও একরোখা আদর্শবাদে অভিভূত হয়। সব শেষে বলল : "কিন্তু আমি মা-র পরে প্রথম দিকে রাগ করলেও ক্ষোভ একটু থিতিয়ে এলে সত্যিই তাঁর ব্যথা বুঝতে পেরেছিলাম নিজের ব্যথা দিয়ে। শাস্ত্রীজিও আমাকে চমৎকার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন একটি কথা : যে, সব সংস্কারই দৃঢ়মূল হলেও শুচিবাইয়ের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে বিশেষ করে ধার্মিক মেয়েদের সবচেয়ে বেশি বেগ পেতে হয়। কিন্তু এসব যুক্তি বৃথা—কারণ যুক্তির আলোয় মন কিছুটা সান্ত্বনা পেলেও বেদনার ভার এক ফোঁটাও কমে না। আমি তাই এখানে কিছুদিন একান্তে থাকতে চাই শুধু আমার মনকে শান্ত করতেই নয়, পথের পাথেয় মেলে কেমন ক'রে প্রার্থনা ক'রে তার একটু হদিশ পেতে—জানি না তুমি প্রার্থনায় বিশ্বাস করো কি না।"

নিশান্ত (ওর হাত টেনে ধরে সস্নেহে) : করি ভাই। আমার অভিভাবক মামা একটু সেকেলে হ'লেও খাঁটি ধার্মিক। তিনি প্রার্থনা ক'রে শুধু যে শান্তি পান তাই নয়, তাঁর সঙ্গে প্রার্থনা করে দুবার আমার নিজের ফাঁড়া কেটে গেছে। কিন্তু একথা আজ থাক, বাইরে লিদিয়ার পায়ের শব্দ শুনছি—সে এল ব'লে।

শ্রীমন্ত (হেসে) : এরি নাম ভালোবাসা ভাই—পায়ের শব্দে প্রণয়ীর খবর পাওয়া...

টক টক টক...লিদিয়ার প্রবেশ, হাতে চকলেটের বাক্স।

॥ সতেরো ॥

পরিচয়পর্ব যথাবিধি সমাপ্ত হ'লে লিদিয়া একটি গোল টেবিলে ভোজ্য পরিবেষণ করল। শ্রীমন্ত মুগ্ধ হয়ে গেল শুধু লিদিয়ার অসামান্য রূপে নয়—কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে, ভাবভঙ্গির লাবণ্যে—বিশেষ ক'রে খাস ফরাসী উচ্চারণে। কথায় কথায় সে বলল হেসে ইংরাজিতে :

"আমি ফরাসী ভাষা ভালো জানি না এজন্যে আজ যেমন খেদ হচ্ছে এমন আর কখনো হয় নি।"

লিদিয়া (ফরাসীতে) : কেন ?

শ্রীমন্ত (ইংরাজীতে) : আপনার মুখে ফরাসী ভাষা শুনতে চাই বলে।

লিদিয়া (হেসে) : আপনি ফরাসী ভাষায় আলাপ করতে না পারলেও কমপ্লিমেণ্টের কায়দায় তো বিশেষ অপটু বলে মনে হচ্ছে না।

নিশান্ত : না না, ফরাসী ও চলনসৈ বলতে পারে। তবে ওর বিষম ভয় পাছে তোৎলা নাম কিনতে হয়।

লিদিয়া : বিদেশী ভাষায় আলাপ করতে অনেকেই তো প্রথম দিকে থেমে থেমে বলেন। হোঁচট না খেয়ে কে কবে এক পা সোজা চলেছে ?

শ্রীমন্ত : সেকথা সত্যি, কিন্তু কথালাপে ফরাসীদের প্রতিভার জুড়ি মেলে না।

লিদিয়া : কে বলল ? রুষরাও চমৎকার কথা বলে।

শ্রীমন্ত : আপনি রুষ ভাষাও জানেন ?

লিদিয়া : হ্যাঁ, আমার এক মাসিমা এক রুষ কমিসারকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর কাছে আমি মস্কোয় ছিলাম পাঁচবৎসর। তখন আমি যাকে ইংরাজরা বলে teen-ager —আর একটু পুডিং নেবেন না ? আপনার

জন্যে আমি নিজে হাতে রেঁধেছি এই বৃটিশ পুডিং। আমরা, ফরাসীরা, বড় একটা পুডিং খাই না। টার্টই আমাদের প্রিয়।

শ্রীমন্ত: আমাদের ঘরোয়া বাংলায় একটি যুগল বিশেষণ আছে—রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। আপনার মধ্যে এই যুগ্ম দেবীর দেখা মেলে—রূপে নিরুপমা, গুণে অনুপমা।

লিদিয়া (নিশান্তকে): এঁকে তুমি আমার আসবার আগে উস্কে দিয়েছ না কি কম্প্লিমেণ্টের ফুলঝুরি ঝরাতে?

নিশান্ত (হেসে): না শেরি (chérie)—তোমাকে দেখলে জিভের ডগায় কম্প্লিমেণ্ট গজায় যেমন প্রথম বর্ষায় গাছে গাছে গজায় লতা পাতা।

লিদিয়া (নিশান্তের হাতে চাপড় মেরে): চুপ করো। বেশি মিষ্টি পরিবেষণ করার ফল শুভ হয় না। (শ্রীমন্তকে) কই, পুডিং নিলেন না তো আরো একটু?

শ্রীমন্ত: এই মাত্র আপনি যা ভয় দেখালেন তার পরে কোন্ ভরসায় আরো নিই বলুন?

লিদিয়া (খিলখিল ক'রে হেসে): আপনি দেখতে যেমন সরল, আসলে হয়ত—না মুখ ফসকে কী ব'লে ফেলব আমাদের শীলতার মানহানি হবে। কিন্তু একটু ফল? পনীর?

শ্রীমন্ত: না, আর পারব না।

লিদিয়া: আপনি আমাকে দেখে মুখে চাবি দিলেন। কিন্তু বৃথা, কারণ আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছুই শুনেছি আপনার বন্ধুর মুখে।

শ্রীমন্ত (হেসে): আশা করি শোনেন নি—আমার সাবালক হবার এখনো অনেক দেরি আছে?

লিদিয়া: না, তবে ও বলেছে—কিন্তু না—ও হয়ত রাগ করবে।

নিশান্ত: না, এখন বলতে পারো, কারণ ও লণ্ডনে এসেই রাতারাতি "সাবালক" পদবী পেয়ে গেছে।

লিদিয়া: মানে?

নিশান্ত: মানে, সেই সনাতন ইতিহাস—মানুষ সত্যি সাবালক হয় যখন প্রেমে প'ড়ে দুঃখ পায়, তার আগে না। ও একটি মেয়েকে ভালোবেসে তাকে হারিয়েছে পাওয়ার মুখে।

লিদিয়া : কই, আমাকে তো বলো নি সেকথা ?

নিশান্ত। আমি কি ছাই জানতাম যে বলব ? মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে আমাকে ও সব খুলে বলেছে।

লিদিয়া : আমাকে বলা কি বারণ ?

নিশান্ত : ও বলতে ঠিক বারণ করে নি—তবে তোমাকে উপস্থিত না বলাই বোধহয় ভালো।

লিদিয়া : কেন শুনি ? কারণ আমি সবাইকেই ব'লে বেড়াব প্রত্যেককে মানা ক'রে কাউকে বলতে ?

শ্রীমন্ত : না মাদমোয়াসেল—

লিদিয়া : আপনি আমাকে নাম ধ'রে না ডাকলে আর কক্ষনো আপনাকে নিমন্ত্রণ করব না।

শ্রীমন্ত : আচ্ছা লিদিয়া। আমি বলতে যাচ্ছিলাম—আমি চাই ও তোমাকে বলে। কারণ কী জানো ? আমি সত্যিই ভেবে পাচ্ছি না আমার এখন কী করা উচিত—তুমি হয়ত নির্দেশ দিতে পারবে।

লিদিয়া : কী যে বলো ! আমি কী জানি বা বুঝি যে তোমরা দুই দার্শনিক মিলে ভেবেচিন্তেও যে-সমস্যার সমাধান করতে পারছ না আমি পারব তার চাবিকাঠির খবর দিতে ? আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে প্রেমের গোলকধাঁধায় ঘুরে আমি কেবল এইটুকু দেখতে পেয়েছি যে আমরা অনেক সময়েই অনেক কিছু করি যা—যা-কী বলব ? হ্রদে একটা ঢিল ফেললে যখন বৃত্তের পর বৃত্ত বাড়তে বাড়তে চলে না ? তখন শেষ বৃত্তটি কোথায় গিয়ে ঠেকবে কেউ বলতে পারে না। প্রেমের ক্ষেত্রে খুব ছোট্ট আঘাতে ভূমিকম্প ঘটে এ-ও আমি দেখেছি···মরুক গে এসব অবান্তর কথা—আমি শুনতে চাই। যদি আমার মাথায় কোনো আইডিয়ার বিদ্যুৎ ঝিকিয়ে ওঠে আমি বলব—ব্যস। এর বেশি কোনো ভরসা দেবার অধিকার আমার নেই।

শ্রীমন্ত : নিশান্ত, তুমিই বলো। আমি বলতে গেলে হয়ত ফের সেন্টিমেণ্টাল হ'য়ে পড়ব। প্রতিমা আমাকে টুকত কি সাধে ?

লিদিয়া : প্রতিমা ? আমি এ-নামটা শুনেছি যেন··হ্যাঁ, মনে পড়েছে—কাগজে পড়েছিলাম। সে পারিসে কোন্ এক হোটেলের পাঁচতলায় দুটি না তিনটি শিশুকে বাঁচিয়েছিল যখন হোটেলটিতে আগুন লেগে যায়। Le

Monde কাগজের এক দূত তার প্রত্যুৎপন্নমতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল—লিখেছিল যে ইংলণ্ডে এমন মেয়ে জন্মায় ব'লেই ইংরাজ জাত এত বড় হয়েছে। তার ছবিও বেরিয়েছিল···পরমা সুন্দরী।

অগত্যা নিশান্ত বলল শ্রীমন্তর কাছে যা যা শুনেছিল।

লিদিয়া (খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শ্রীমন্তকে): জেনেভায় প্রতিমা এখন ঠিক কোথায় আছে?

শ্রীমন্ত (বিষণ্ণ): সে কিছুদিন একলা থাকতে চায় তার এক সখীর কাছে, এইটুকু মাত্র বলেছিল।

লিদিয়া: হুঁম্। শক্ত মেয়ে।

নিশান্ত: বটে। কিন্তু অসহিষ্ণুও বলা চলে।

লিদিয়া: দেখ, যেখানে মেয়েরা সত্যি ভালোবাসে সেখানে তারা সহজে অসহিষ্ণু হয় না। তারা অনেক কিছুই সইতে পারে, কিন্তু পারে না সইতে—না থাক—আমার এ-অনধিকারচর্চা।

শ্রীমন্ত: না, বলো।

লিদিয়া: তুমি হয়ত রাগ করবে বা দুঃখ পাবে।

শ্রীমন্ত: রাগ করব না, তবে দুঃখ হয়ত পেতে পারি। কিন্তু যে-দুঃখ পেয়েছি তার পরে কারুর কোনো মন্তব্যই আর নিদারুণ মনে হবার কথা নয়।

লিদিয়া (কোমল স্বরে): আমি বুঝি মনামি, কারণ ভালোবেসে দুঃখ আমিও কম পাইনি, হয়ত তোমার চেয়ে বেশিই পেয়েছি, কিন্তু তবু এ-প্রসঙ্গে ফের বলতে চাই না যা তুমি হাড়ে হাড়ে জানো।

শ্রীমন্ত: তবু বলো। আমি শুনতে চাই।

লিদিয়া: কি জানো? প্রতিমা হয়ত আশা করেছিল তুমি তোমার মা-র বিমুখতার কথা ব'লেই থেমে যাবে না—বলবে জোরালো স্বরে যে, মার কথায় তুমি কান দেবে না দেবে না দেবে না। আর একটি কথা ভুলো না: যে, এ-যুগের মেয়েদের স্বভাবের মধ্যে ভাঙন ধরলেও এখন পর্যন্ত মতি-গতির কোনো পাকা রাজপথ গ'ড়ে ওঠে নি। প্রতিমার সঙ্গে আমার আলাপ নেই, তবে এইমাত্র নিশান্তর মুখে যা শুনলাম তাতে মনে হয়—তার বুদ্ধি তাকে যতটা চালায় তার চেয়ে বেশি চালায় রোখ—বিশেষ যেখানে সে ঘা খায়। তোমার নিরীহ নীরবতায় আহত হ'য়ে সে হয়ত এই সিদ্ধান্ত করেছে যে, শেষ

পর্যন্ত তুমি তোমার মার কথা কিছুতেই অমান্য করতে পারবে না। তাই তুমি তাকে ছাড়বে ব'লে তাকে আঘাত দেওয়ার আগে সে তোমাকে ছেড়ে তোমাকে সাজা দিতে চেয়েছে। বলে না—offensive is the best defence? অন্তত অভিমানিনীদের দল যে এই চাল চেলে নিজেদের মান বাঁচায় এ আমি বারবার দেখেছি—শুধু আমার কয়েকটি সখীর ক্ষেত্রে নয়, আমার নিজেরও এক দারুণ দুর্লগ্নে। তাই আমি প্রথম দিকে নিশান্তকে বিবাহ করতে চাই নি। কিন্তু এ-কথার বিশদ ভাষ্য আজ করব না, করতে গেলে, কে জানে, হয়ত বেফাঁশ কিছু ব'লে ফেলব। কেবল আমার দৃঢ় বিশ্বাস—যে তুমি প্রতিমাকে কিছুতেই ছাড়বে না এ কথাটি যদি তার মনে পাকা ক'রে গেঁথে দাও তাহ'লে তার দিকে এক পা এগুলে সে তোমার দিকে দশ পা এগিয়ে আসবেই আসবে।

॥ আঠারো ॥

শ্রীমন্ত হোটেলে ফিরে এসে অশান্ত হ'য়ে উঠল। নানা উদ্বিগ্ন চিন্তার পরে তার মনে হ'ল লিদিয়া ঠিক ধরেছে: প্রতিমা সাহসী মেয়ে, তার মধ্যে সাহসের দৈন্য দেখেই সবচেয়ে বেশি ঘা খেয়েছে—আরো হয়ত এই জন্যে যে, তার মনে হয়েছে শ্রীমন্ত দুকুল বজায় রাখতে চেয়ে মার সঙ্গে বৌ-এর বনিবনাও হোক চাইবেই চাইবে। তাছাড়া বিলেতে মানুষ যে-মেয়ে সে তো চাইবেই চাইবে কেবল স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে শাশুড়ীকে দূর থেকে দণ্ডবৎ ক'রে।

কিন্তু মা-কেও যে সে আশৈশব ভালোবেসে এসেছে। একদিকে প্রতিমা শিক্ষায় বৃটনবালা, অন্যদিকে শ্রীমন্ত শুধু যে মাতৃভক্ত সন্তান তাই নয়, মার একমাত্র সন্তান। তার মন বিষাদে কালো হ'য়ে ওঠে ভাবতে—কেন বিধাতার এ-নিষ্ঠুর বিধান (অন্তত অনেক সময়েই) যে, একজনকে সুখী করতে গেলে আর একজনকে অসুখী করতে হয়?

এ-সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেলেও ওর মন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে প্রতিমাকে বোঝাতে যে, সে মাকে ভালোবাসলেও প্রতিমাকে আরো বেশি ভালোবাসে। আরো বেশি? নয়? দাম্পত্য প্রেমের উপজীব্য—ভবিষ্যতের

টিপে কী যে মাথামুণ্ডু গোনেন ভগবানই জানেন—কিন্তু তাঁদের দুরন্ত দাওয়াইয়ে তো দেখি শুধু অস্বস্তিই বেড়ে চলে। কিন্তু যাক আমার কথা। আমি মরব না। তোকে থিতু না ক'রে মরতে পারব না বাবা। এখানে একটি কী যে চমৎকার মেয়ে দেখেছি! বয়স একটু কম বটে—পনেরো। কিন্তু যেমন সুমতি তেমনি কান্তি! পড়াশুনোয়ও খুব ভালো। গায়ে পড়া মেয়ে নয়। বড় সুলক্ষণা। তাকে বলেছি সেদিন—আমার বৌমা হ'তে হবে। তাই এবার তুই ফিরে আয় বাবা—আড়াই বছর কেটে গেল—ওখানে থেকে আর কী করবি? তোর কিসের অভাব? ··তোর ভুলে-যাওয়া মা।"

॥ কুড়ি ॥

শ্রীমন্তর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কৈশোরে কতবারই না সে সোচ্ছ্বাসে বন্ধুদের লিখেছে যে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এ শুধু কবির উক্তি নয় নবীর ভাষণ। সে নিজে জন্মভূমিকে গরীয়সী মনে করত তার 'পরে মাতৃত্ব আরোপ ক'রে তবে। রামপ্রসাদের, কমলাকান্তের দ্বিজেন্দ্র-লালের কত গানে কালীকে মা-র পদবী দিয়েই সে প্রার্থনা করেছে চোখের জলে! যৌবনে সে-কল্পনার রঙ একটু ফিকে হ'য়ে এলেও মার আদরে সাড়া দিয়ে এসেছে সর্বান্তঃকরণেই। প্রতিমা যখন তাকে ছেড়ে চ'লে যায় তখন প্রথম তার মনে প্রশ্ন জেগেছিল—প্রতিমারই আপত্তির ছোঁয়াচে—যে, মাকে ভালোবাসলেও "আরাধনা" করার প্রবৃত্তি হয়ত একটু সেকেলে। কালিদাসের শ্লোক মনে পড়ছিল: "পুরাণম্ ইত্যেব ন সাধু সর্বম্"—যাই পুরাতন তাই বরণীয়, সাধু নয়। তবু ক্রমাগতই চেয়ে এসেছে মা-র ও প্রতিমার মধ্যে সন্ধি হোক—চায়নি দুজনের মধ্যে মাত্র একজনকে বরণ করতে। লিদিয়ার কথায় তার মনে প্রথম অনুশোচনা আসে—কেন প্রতিমাকে সে জানায়নি যে মার আপত্তিতে তার অন্তরের সায় নেই। তবু মন তার শুধু প্রতিমাকেই মান দিয়ে মা-র অপমান করতে ভয় পেয়েছিল বৈ কি। কিন্তু প্রতিমাকে চিঠি লিখে একটু হাল্কা হবার সঙ্গে সঙ্গে নিয়তির এ কী নিষ্ঠুর পরিহাস!···

ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং···

শ্রীমন্ত (টেলিফোন): Quiest ta (কে?)

স্বর (টেলিফোন): আমি প্রসাদ।

শ্রীমন্ত (চম্‌কে): বাবা?

প্রসাদ: হ্যাঁ বাবা, শোন্‌ বলি সংক্ষেপে। উনি আমাকে এইমাত্র বললেন তোকে কী লিখেছেন। ওদিকে সুবোধ আমায় লিখেছে প্রতিমা জেনেভায় চ'লে গেছে—তোকে বিবাহ করতে আর রাজী নয় ব'লে।—না, শোন্‌, সময় বেশি নেই। আমার বলার কথা এই যে, তোর মার গোঁড়ামিতে তুই সায় দিস নে। প্রতিমাকে তুই বিবাহ করতে চাস বা না চাস একথা ভুলিসনি যে, সে সত্যিই চমৎকার মেয়ে। আমি তাকে স্নেহ ক'রে এসেছি বরাবরই, মনে মনে কামনাও করেছি—যদিও সে কথা বলিনি তোকে—যে, আমার মন টইটুম্বুর হ'য়ে ভ'রে উঠেছিল খবর পেয়ে যে তাকে তুই বিবাহ করতে চাস। কিন্তু আমি জানি তো তোকে। তুই তাকে বিবাহ করতে চাইলেও তোর মা-র ঝঙ্কারে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবি…কী? ভয় নয়?… হ্যাঁ বাবা, ভয়ই বারো আনা, বিবাহ না করার স্বপক্ষে যুক্তি বড় জোর চার আনা।…কী?..তাকে তুই চিঠি লিখেছিস? সাবাস? কিন্তু আবার পিছু-ডাকে সাড়া দিস্‌ নে। যা উচিত মনে হবে তাই করবি, তোর মা-র কথায়ও নয়, তোর বাবার কথায়ও নয়। ও দেশের লোকের অনেক কিছুই আমাদের মন নেয় না—নেওয়া উচিতও নয়, কিন্তু একটা লাখ কথার এক কথা ওরা বলে: যে, কোনো জেনারেশনই তার পরের জেনারেশনকে ঠিক বুঝতে পারে না বোঝা সম্ভব নয় ব'লেই। তাই আমার বলবার কথা এই যে, এখন থেকে তুই আপ্রাণ চেষ্টা করিস চলতে শুধু তোর বিবেক আর শুভ বুদ্ধির কথায়—এর ওর তার কারুর কথায় নয়।..কী?..তোর মা কষ্ট পাবেন? কিন্তু সে তো গোঁড়ামির কষ্ট। তোকে আঁচলে বেঁধে রাখতে না পারার কষ্ট। না, শোন্‌, ওরা সময় বেশি দেয় না ট্রাংক কল-এ। মাতৃস্নেহ খুব চমৎকার জিনিস বাবা, কিন্তু সুবোধ যখন মার্থাকে বিয়ে করে তখন সেও আমাকে লিখেছিল যে, তার মা দারুণ কান্নাকাটি করছেন কেন না মাতৃস্নেহে সোনা থাকলেও খাদও কম নেই—যার নাম possessiveness—দ্বিজেন্দ্রলাল চমৎকার লিখেছেন একটি বাউল গানে:

আমার আমার ব'লে ডাকি, আমার এ ও আমার তা।
তোমার নিয়ে তুমি থাকো, নিও না কো আমার যা।

আমি সুবোধের কাছে অনেক কিছু শিখেছি, তাই আরো চাই না তুই তার বা প্রতিমার চোখে ছোট হ'য়ে গিয়ে তাদের মনে ব্যথা দিস। ব্যস, আজ আর সময় নেই,—এর পরেও যদি তোর মনে কোনো খট্‌কা থাকে আমাকে খোলাখুলি লিখিস আমি জবাব দিব—কিম্বা যদি তুই ঝটিতি উত্তর চাস তো ফের টেলিফোন করব। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

শ্রীমন্ত চোখ মুছল। বিবেক? হায় রে! তার বিবেক যে বহুরূপী, রঙ বদলায় ঘড়ি ঘড়ি—মূর্তিমান পেণ্ডুলাম, আজ এধারে কাল ওধারে!...

হঠাৎ femme de chambre এক চিঠি ওর হাতে দিয়ে গেল। খুলে পড়ে:

"ভাই শ্রীমন্ত, আজ আমার এখানে লাঞ্চ খেও। বিশেষ কথা আছে। এসো একটু আগে—ঠিক এগারোটায়—দেরি কোরো না il faut être ponctuel ici."*

কবজি ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে—সকাল দশটা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাইরের বাগানে গিয়ে বসে।

॥ একুশ ॥

বেল ভ্যু হোটেলের বাগানটি চমৎকার। এক প্রান্তে একটি বুগানভিলা গাছের লাল পাতার নিচে chaise longue-এ (আরাম কেদারায়) সুখাসীন হ'য়ে শ্রীমন্ত চোখ বুজে কেবল ভাবে আর ভাবে: আথাল পাতাল চিন্তা, নানারঙা চিন্তা, উল্টোপাল্টা কল্পনা, রকমারি জল্পনা। মনে পড়ে "দুই বিঘা জমি" কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মা-র নামে উজিয়ে ওঠা:

"মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভ'রে"

তারপরেই মনে পড়ে "মহুয়া"-য়:

যাব না বাসরকক্ষে বাজায়ে কিঙ্কিনী,
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী ·

* এদেশে এসে পাংচুয়াল হওয়া চাই-ই চাই।

পঞ্চশরের বেদনা মাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে !
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা যেন না যাচি,
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়—তুমি আছ আমি আছি।

কতবারই না প্রতিমা ওর কাছে আবৃত্তি করেছে এ-লাইনগুলি ! করবে না ? এই-ই যে ছিল ওর প্রাণের স্বপ্ন যাকে ও মনের যুক্তি দিয়ে বরাবর লালন ক'রে এসেছে। শ্রীমন্ত হেসে ওকে বলত : "কিন্তু তাহ'লে তোমার নামটা বেমানান হয়েছে প্রতিমা ! কারণ প্রতিমা বলতেই মনে আসে কোমলার কথা।" ও বলত মাথা ঝাঁকিয়ে : "কক্ষনো না। প্রতিমা কি পাথরের হয় না ? আর সাদা মার্বেলের বিগ্রহই সবচেয়ে সুন্দর নয় কি ? ··" এইরকম সে কত বাদ প্রতিবাদ, টীকা-টিপ্পনী, হাসি-গল্প !·· চোখে ওর জল আসে, মন কেমন করে প্রতিমার জন্যে। কিন্তু তারপরেই মনে পড়ে মা-র কথা। ও দশ বারো বছর বয়সেও ভালোবাসত মা-র কোলে মাথা রেখে ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে ঘুম যেতে :

আয় রে আমার সুধার কণা আয় রে ননীর ছবি !
আয় রে নিশার সোনার চাঁদ, আয় রে উষার রবি !
উড়ে উড়ে বনে বনে বেড়াস বনের পাখী !
যাস রে কোথা আয় রে যাদু, বুকে ক'রে রাখি।

গানটি গুনগুন ক'রে গাইতে গাইতে শ্রীমন্ত কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল ! ··

চমকে উঠল দ্বারী এসে ডাকছে : Monsieur ! le telephone !"

ও লাফিয়ে উঠে বাইরের বারান্দায় টেলিফোন ধরতেই নিশান্তর স্বর : "এগারোটা দশ মিনিট, ব্যাপার কি ?"

শ্রীমন্ত (টেলিফোনে) : আজ টেলিফোনে বাবা আমাকে অনেক কিছু বলেছেন উৎসাহ দিয়ে। ভাবতে ভাবতে বাগানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ভাই, কিছু মনে কোরো না।

নিশান্ত : বেশ বেশ। বলো তো আমি ঝটিতি মোটরে গিয়ে তোমার পুলকতন্দ্রা ভাঙিয়ে নিয়ে আসি ?

শ্রীমন্ত : না না, আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে যাচ্ছি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব।

নিশান্ত : ফের ঘুমিয়ে পোড়ো না কিন্তু।

শ্রীমন্ত : নিশান্তরা জেগে থাকে ভাই, কিন্তু শ্রীমন্তরা কথায় কথায় ঘুম যায়। আমি শুনছিলাম সত্যিই মা-র মধুর ঘুমপাড়ানি গান—দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা :

ভোরে উঠে ছুটে ছুটে খেলিস মনের সুখে,
ছেড়ে খেলা সন্ধেবেলা আসিস আমার বুকে।
এমনি ক'রে পাড়াব ঘুম দিয়ে শত চুমো,
সোনা আমার, মাণিক আমার, যাদু আমার, ঘুমো

নিশান্ত : চমৎকার! কিন্তু এবার উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—প্রাপ্য নিশান্তং নিবোধত।

॥ বাইশ ॥

শ্রীমন্তকে দিভানে বসিয়ে নিশান্ত বসল ওর ডান পাশে। লিদিয়া বাঁ পাশে ব'সে ওর হাতে এক পেয়ালা চৈনিক চা পেশ ক'রে পাশে ব'সে বলল : "চাপান করতে করতে গল্প জমে বেশি সহজে। কিন্তু এবার dressez les oreilles, s'il vous plaît."*

নিশান্ত (চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে) : কী চমৎকার চা—সুগন্ধি—!

লিদিয়া : আর দেরি নয়। আমার ঠিক বারোটায় বেরুতে হবে এক সখীকে দেখতে। মাত্র চল্লিশ মিনিট সময় আছে। শোনো মন দিয়ে।

শ্রীমন্ত : ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে অনুতাপে তনু দগ্ধ···

নিশান্ত : Cela s'entend bien†—আমরা অবুঝ নই। শোনো। (চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ ক'রে) আজ মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে লিদিয়াকে টেলিফোন করেছিলেন ওর এক সখী—বড় করুণ কাহিনী···

শ্রীমন্ত : যিনি এখন হাঁসপাতালে?

নিশান্ত : না, ওর সখীর কি অন্ত আছে ভাই? এঁর নাম মার্গারেট—প্রতিমারও প্রিয়সখী। প্রতিমা তোমাকে হয়ত তাঁর কথা কিছু ব'লে থাকবে···?

* উৎকর্ণ হ'য়ে শোনা　　　　† বটেই তো

শ্রীমন্ত : না, মনে পড়ছে না।

নিশান্ত (লিদিয়াকে) : এবার তুমি বলো।

লিদিয়া : না, আমি বলতে গেলে এত সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে পড়ি···

নিশান্ত : Épatant! জুড়ি মিলেছে! শ্রীমন্তও কম দরদী নয়—যেখানেই উচ্ছ্বাসের সুর শোনে সেখানেই ওর বুকের বীণায় বেজে ওঠে তার প্রতিধ্বনি। তাছাড়া ওর মনের অন্ধকারে তোমার মধ্যেই ও প্রথম রূপালি রেখা দেখতে পেয়েছে—সুতরাং সে-প্রভার পূর্ণিমা কান্তি ফুটিয়ে তোলার দায় আসলে তোমারি। আমি তো এখানে অবান্তর—হসন্ত।

লিদিয়া (নিশান্তর হাতে চাপড় মেরে) : Quel taquin !*

নিশান্ত : Je te demande pardon, mon adoree !†—কিন্তু না, আমি আর কিছু বলব না, তুমিই বলো।

লিদিয়া : বলবার জন্যেই তো ওকে ডেকেছি। (শ্রীমন্তকে) কিন্তু একটু গোড়া থেকে বলতে হবে। (একটু থেমে)

মার্গারেটের সঙ্গে ছেলেবেলায় আমার যে কী আনন্দে কেটেছে কী বলব ? আমরা পরস্পরকে এত ভালবাসতাম যে অনেকে ঠাট্টা ক'রে বলত আমাদের মধ্যে একজন পুরুষ হ'লে আমাদের বিয়ে হ'ত। কিন্তু সে যাক্, মার্গারেটের কথাই বলি।

সে ছিল ক্যাথলিক খৃষ্টান। তার বাপ গির্জার আবহে মানুষ হ'য়ে বিষম গোঁড়া হ'য়ে উঠেছিলেন, বলতেন : খৃষ্টদেবকে যে ভগবানের পুত্র ব'লে মানতে না চায় সে অভিশপ্ত মানুষ—নরকে যাবেই যাবে।

এ হেন পিতৃদেবের মেয়ে গিয়েছিল আরো এক কাঠি, বলত : খৃষ্টদেব ভগবানের পুত্র ব'লে থামলে চলবে না, বলতে হবে—সাক্ষাৎ ভগবান্!

কিন্তু প্রেমের দেবতা কিউপিড নিজের খুশ-খেয়ালেই চলেন তো, তাকে ফেললেন পাকে—সে পড়ল এক ইহুদী যুবকের প্রেমে। বাপ শুনে আগুন, ভয় দেখালেন বিধর্মীকে বিবাহ করলে আর তার মুখদর্শনও করবেন না। মার্গারেট অন্তর্দ্বন্দ্বে অসহ্য দুঃখ পেলেও সাহস পেল না বাপের অবাধ্য হ'য়ে ইহুদী প্রণয়ীটিকে বরণ করতে। শেষে মনঃকষ্টে শান্তি পেতে আফ্রিকায় ল্যাম্বারেণে গ্রামে মহাপ্রাণ শ্বাইৎজার-এর আশ্রমে গেল নার্স হ'য়ে নিগ্রোদের

* কী ক্ষ্যাপাও যে।　　　† ক্ষমা, আদরিণী।

সেবা করতে। কিন্তু সেখানে শুধু যে শান্তি পেল না তাই নয়, কাল যক্ষ্মারোগে তাকে চেপে ধরল।

তবু সে স্বদেশে ফিরতে চাইল না। কিন্তু ল্যাম্বারেণের ডাক্তারেরা তাকে একরকম জোর ক'রেই পাঠালেন জুরিখের এক নামকরা নার্সিং হোম-এ—যেখানে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

শ্রীমন্ত: তিনি কবে জুরিখে এসেছিলেন অসুস্থ হ'য়ে?

লিদিয়া: তা মাসখানেক হবে, কিন্তু আমি খবর পাই মার্গারেটের বোনের কাছে তিন সপ্তাহ আগে। পিছলে প'ড়ে গিয়ে তার কোমরের হাড় ভেঙে গেছে। এখন ভালো আছে, তবে আরো অন্তত দশ-বারোদিন হাঁসপাতালে থাকতে হবে। তাকে দেখতেই আজ যাচ্ছি, সে টেলিফোনে ডেকেছে মার্গারেটের কথা বলতে।

শ্রীমন্ত: মার্গারেট কেমন আছে এখন?

লিদিয়া: মন্দের ভালো—তবে বলে বরাবরই যে, সারবার আশা দুরাশা। তবু সে ঘোর আফ্রিকা থেকে জুরিখে ফিরেছে শুনে আমি তাকে চিঠি লিখি, পরে টেলিফোন করি। প্রথম প্রথম সে বেশিকিছু বলত না—তবে ভরসা দিত দেখা হ'লে সব বলবে। কিন্তু আমার নানা কারণে যেতে দেরি হ'য়ে গেল। তাই টেলিফোনেই পাঁচ-সাত-দশ মিনিট কথা হত। আজ সকালে বলল—নতুন কি এক চিকিৎসায় দু'চারজন সেরে উঠেছে, তাই ডাক্তার অনুমতি চায় এ-পরীক্ষা করতে। মার্গারেট রাজী হয়েছে। আমাকে বলল: "যতই কেন মৃত্যুকামনা করি ভাই, প্রাণ চায় বাঁচতে। তবে আমার সাজা হবে না? আমি কথায় কথায় জাঁক করতাম আমি খাঁটি খৃষ্টান ব'লে—কিন্তু আমার সত্যিকার খেতাব—মামুলি খৃষ্টান।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "খাঁটি খৃষ্টান বলো তুমি কাকে?" মার্গারেট বলল: "ভগবানের করুণায় যার অটল বিশ্বাস আছে, যে বিবেকের নির্দেশে চলতে ভয় পায় না, যে প্রেমের আলোর ডাকে ভয় ভাবনার অন্ধকারকে পাশ কাটাতে পারে—যদি এ অভিসারে দুঃখ আসে তাকেও খৃষ্টদেবের আশীর্বাদ ব'লে বরণ ক'রে।"

কিন্তু এখন যাই ভাই···পরে আরো বলব মার্গারেটের কথা।

॥ তেইশ ॥

হোটেলে ফিরে এসে শ্রীমন্তর মন আরো অশান্ত হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল প্রতিমাকে লিদিয়ার শেষ কথাগুলি না লিখলেই নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হানা দিল অভিমান। প্রতিমাকে দু-দুটি চিঠি লিখেছে কিন্তু সে নিশ্চুপ। দুটি স্বরের কলহ বেজে ওঠে :

অভিমান : আমি কী এমন ঘোর অপরাধ করেছি যে প্রতিমা আমার চিঠির উত্তরে একটা লাইনও লেখা দরকার মনে করল না ?

প্রেম : অনুযোগ অভিযোগ ছেড়ে নত হও, বন্ধু ! এ রণাঙ্গণ নয়, প্রেমাঙ্গণ। এখানে সে-ই জেতে যে হার মানে।

অভিমান : হার মানার নাম পৌরুষ ?

প্রেম : সত্যি যে ভালোবাসে তার মনে এ-প্রশ্নই ওঠে না। মাথা নুইয়েই তার পৌরুষ জেগে ওঠে।

এইরকম সে কত তর্ক-বিতর্ক যুক্তি প্রতিযুক্তি ! শেষে হঠাৎ প্রাণগহনে কে যেন বলল : "তর্ক রেখে প্রার্থনা করো।"

প্রার্থনায় বসতেই তার চোখে জল ভ'রে এল, হৃদয় এক অপূর্ব কোমলতায় ছেয়ে গেল—প্রায় মখমলের মতন নরম, এত গাঢ় যে মনে হয়—ছোঁওয়া যায়। কোথায় অভিমান ? শুধুই প্রেমের আলোর সঙ্গে মধুর নির্মল অশ্রু। ও উঠে পকেট বুক খুলে প্রতিমার নম্বর সামনে ধ'রে টেলিফোনবালাকে বলল : Génève—neuf neuf sept deux trois, s'il vous plaît." (99723)

* * * *

টেলিফোনে স্বর : Qui est ta ? (কে ?)

শ্রীমন্তর বুকের রক্ত দুলে উঠল বহুবাঞ্ছিতার কণ্ঠস্বর শুনে। জোর ক'রে চোখের জল সামলে নিয়ে বলে : "আমি···আমি···শ্রীমন্ত।"

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ। শ্রীমন্ত কথা বলতে চেষ্টা করে—কিন্তু বৃথা।

প্রতিমার স্বর : শ্রীমন্ত ? ওখানে আছ ?

শ্রীমন্ত : হ্যাঁ। তোমাকে দুটি চিঠি লিখেছিলাম···

প্রতিমা : দুটিই পেয়েছি, শেষেরটি এইমাত্র।

শ্রীমন্ত : উত্তর দিলে না কেন ?

প্রতিমা : বাবা লিখেছিলেন তুমি প্যারিসে গিয়েছ কিছুদিন একলা থাকতে।

শ্রীমন্ত : দশ-বারোদিন ছিলাম একলা, তারপরে গিয়েছিলাম নিশান্তর ওখানে—যার কথা তোমাকে চিঠিতে লিখেছি।

প্রতিমা (একটু পরে) : ও।

শ্রীমন্ত : কী ?

প্রতিমা : কী আবার ? কিছু না।

শ্রীমন্ত : কিছু না ? আর কিছু বলবার নেই ?

প্রতিমা : কী বলব ? আমি এখানে কিছুদিন একলা কাটাতে এসেছি নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি হ'তে। কারুর কাছেই যাই না—কেউ এলে দেখাও করি না।

শ্রীমন্ত : আমিও একেবারে একলা ছিলাম দশ-বারোদিন। তারপর গিয়েছিলাম নিশান্তর ওখানে একটু হাল্কা হ'তে।

প্রতিমা : গল্পগুজব ক'রে ?

শ্রীমন্ত : এ-গঞ্জনা কেন প্রতিমা ? নিশান্ত আমার বাল্যবন্ধু।

প্রতিমা : কিন্তু লিদিয়া ?

শ্রীমন্ত : লিদিয়া কী ?.

প্রতিমা : জানো না কি...সে কী রকম মেয়ে ?

শ্রীমন্ত : কী রকম মেয়ে ? মানে ?

প্রতিমা : আমার জুরিখের এক সখী আমাকে লিখেছেন সে তোমার বন্ধুর সঙ্গে আছে বিবাহ না ক'রে।

শ্রীমন্ত : ওদের বিবাহ হবে দু'সপ্তাহের মধ্যেই।

প্রতিমা : কী বললে ? বিবাহ হবে ?

শ্রীমন্ত : নিশান্ত তো তাই বলল। সে মিথ্যুক নয়—যেমন সত্যবাদী তেমনি দরদী।

প্রতিমা : দরদী নয় কে—যদি প্রণয়িনী হন রূপে তিলোত্তমা।

শ্রীমন্ত : এ-ঝাঁঝ কেন প্রতিমা ? তাকে দেখলে বুঝতে সে শুধু রূপসী নয়—সুকুমারী।

প্রতিমা : সুকুমারী হ'তে পারে কিন্তু কুমারী নয়।

শ্রীমন্ত : তুমিই একবার আমাকে বলেছিলে যে, কাকাবাবুর একটি কথায় তোমার মনের পূর্ণ সায় আছে : যে, মানুষ অনেক সময়েই বিপথে পা দেয় নানা অদৃশ্য শক্তির ঠেলায়। কে জানে হয়ত এইজন্যেই খৃষ্টদেব পই পই ক'রে মানা করেছিলেন মানুষকে বিচার করতে…কী?…প্রতিমা! কিছু বলছ না কেন?

প্রতিমা : আমি ভাবছি…তুমি ঠিক সময়েই আমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছ।

শ্রীমন্ত (উৎসাহিত) : আমার মা-র কথাই নাও না। তোমাকে বিদেশিনী ব'লে রায় দেওয়াটা কি তাঁর সুবিচার হয়েছে? কাকাবাবু কি প্রায়ই বলতেন না যে, বিশেষ ক'রে চলতি সুনীতির আদালতে প্রায়ই নিষ্ঠুরতার উকিলই আমল পায়?

প্রতিমা : আমি…না, হয়ত তুমি ঠিকই ধরেছ…আমি ভেবে দেখব, কথা দিচ্ছি

শ্রীমন্ত : শোনো, ওরা দুজনেই তোমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে…

প্রতিমা : তুমি কি ওদের ওকালতি করতেই আমাকে ডেকেছ?

শ্রীমন্ত : ফের এ-সুর কেন প্রতিমা? তুমি কি জানো—তুমি আমাকে এক কথায় আলোর চূড়া থেকে কী দারুণ অন্ধকারের পাতালে ফেলে গেছ—আমার বক্তব্য না শুনেই? জজসাহেবও আসামীকে অনুমতি দেন তার নিজের কথা বলতে। আমি এমনই কী অপরাধ করেছি…

প্রতিমা : শ্রীমন্ত, যেখানে গ্রন্থি কাটতেই হবে সেখানে এক কোপে না কেটে গড়িমসি করলে কি মিথ্যে যন্ত্রণা আরো বাড়ানো হয় না?

শ্রীমন্ত : গ্রন্থি কাটতেই হবে তুমি ধ'রে নিলে কেন?

প্রতিমা : তুমি কি তোমার মা-র বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেছিলে?

শ্রীমন্ত : টেলিফোনে এ-আলোচনা সম্ভব নয় প্রতিমা। আমি বলি কি, যদি আমি জেনেভায় গিয়ে তোমার কাছে বলি আমার যা বলবার আছে—

প্রতিমা : জুরিখ থেকে এইমাত্র টেলিফোন করেছেন আমার এক বাল্য-সখী। তাঁর যক্ষ্মা হয়েছে—

শ্রীমন্ত : জানি, লিদিয়াও তাঁকে ছেলেবেলা থেকে ভালোবেসে এসেছে বলছিল। তাঁর নাম মার্গারেট না?

প্রতিমা : হ্যাঁ। কিন্তু আজ আর সময় নেই—উড়ে যেতে হবে জুরিখে। সেখান থেকে টেলিফোনে তোমাকে জানাব—যদি সম্ভব হয় তো ছু'চারদিন বাদে পারিসে যেতেও পারি। তোমার হোটেলের ঠিকানা ও টেলিফোনের নম্বর দাও।

শ্রীমন্ত : শুনে যে কী আনন্দ হচ্ছে প্রতিমা, ধন্যবাদ। শোনো আমার হোটেলের নাম "বেল ভ্যু"—রু ছ ক্লিশি। টেলিফোনের নম্বর—৭-৩-৪-৫-৯—টুকে নাও। হয়েছে? রোসো, আর একটা কথা : বাবা আজই কলকাতা থেকে টেলিফোনে আমাকে ধম্‌কেছেন—আমি যদি মা-র কান্নাকাটিতে কান দিয়ে তোমাকে এখন বধূবরণ না করি তাহ'লে তিনি আমাকে "কাপুরুষ" খেতাব দেবেন। আমি নিজেও ঠিক করেছি যে, আমি আর ভয় কি ইতস্তত করব না—প্রমাণ করব যে, আমি মহাপুরুষ না হ'লেও কাপুরুষ নই নই নই।

প্রতিমা (একটু পরে) : তাহ'লে আমিও আর ইতস্তত করব না—যখন···(গাঢ়কণ্ঠে) যখন তুমি ভয় কাটিয়ে উঠেছ। আমি জুরিখ থেকে তোমাকে টেলিফোনে জানাব কবে পারিস যাব। আমার মন ভ'রে উঠেছে। আমাকে ক্ষমা কোরো তোমাকে ছুঃখ দিয়েছি ব'লে—অন্তত (ধরা গলায়) এই ভেবে যে, আমি নিজেও কিছু কম ছুঃখ পাইনি তোমাকে ছেড়ে আসতে।

চব্বিশ

শ্রীমন্ত সারাদিন একান্তে একলা কাটাতে চেয়ে ট্রেনে চ'ড়ে চল্লিশ মাইল দূরে ফঁতেন ব্লো (Fantaine bleau) কাননে গিয়ে আশ্রয় নিল। এ মনোরম বনানীটির কথা সে শুনেছিল প্রথম প্রতিমারই মুখে। সে সোচ্ছ্বাসে বলেছিল : "বন যখন কানন হয় তখনই সে হয় বনানী—বাবার মুখে শুনেছি। কিন্তু চোখে দেখেছি এ পর্যন্ত এই একটিমাত্র বনানী। সেখানে দেখতে পাবে কত চিত্রী যায় ছবি আঁকতে।" শ্রীমন্ত এ-বনানীর মধ্যে ঢুকে সত্যিই মুগ্ধ হ'য়ে গেল : গাছের পাতায় পাতায় সবুজ আলোর নাচ! শাখায় শাখায় পাখীর ডাক···এখানে ওখানে নানা চিত্রী ছবি আঁকতে মগ্ন। ওর দিকে কেউ ফিরেও তাকালো না। ফ্রান্স চিত্রকরদের দেশ—এ রটনা তো মিথ্যে নয়। ও এক পাইন গাছের নিচে পাতা বেঞ্চিতে বসতেই কী কাণ্ড : চার-

শ্রীমন্ত : কিন্তু মার্গারেটের জীবনের কি কোনো আশাই নেই ?

লিদিয়া : জানি না ভাই। তবে সে দুঃখ পেয়ে মিইয়ে পড়ে নি, ফুটে উঠেছে ফুলের মতন। প্রতিমাকে বলেছে : দুঃখকে সে এখন সত্যিই ভগবানের আশীর্বাদ মনে করে কারণ দুঃখের মধ্যে দিয়েই সে ভগবানের আলো পেয়েছে যার বরে তার প্রাণের আঁধার কেটে গেছে।

নিশান্ত (শ্রীমন্তকে) : প্রার্থনা করি এবার তোমার জীবনেও জ্বলে উঠুক সেই আশ্চর্য আলো যে জ্বলে কেবল ভগবানের কৃপায়—যেমন জ্বলেছে আমার জীবনে আমি তোমার মত ভক্তিমান্ না হওয়া সত্ত্বেও।

লিদিয়া : নিশ্চয় নিশ্চয়। আর সে-আলোর উৎসব যেন প্রথম হয় আমাদের এখানে।

শ্রীমন্ত (ম্লান হেসে) : Merci, লিদিয়া। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন ; One mustn't count one's chickens before they are hatched."

লিদিয়া : chickens ? (নিশান্তর দিকে তাকায়)

নিশান্ত : তোমাদের প্রবচনে—il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

লিদিয়া : কিন্তু আমার জীবনে যখন অসম্ভব সম্ভব হয়েছে তখন শ্রীমন্তর জীবনে হবে না আগে থাকতে ধ'রে নেব কেন ?

নিশান্ত : শ্রীমন্তর সমস্যা আমার মনে হয় আরো জটিল। একদিকে প্রতিমার একরোখা মতি, অন্যদিকে শ্রীমন্তর মা-র শুচিবাই। আর এ-শুচিবাই সবচেয়ে বেশি অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে বিবাহের ব্যাপারে। তাছাড়া রোখালো মেয়েকে সাম্‌লানোও চাট্টিখানি কথা নয়।

লিদিয়া : কিন্তু আজ সবদেশেই মানুষ মানুষের কাছে আসছে রকমারি শুচিবাইকে দাবিয়ে। তাছাড়া এ-সব সংস্কারের মূলে কী আছে খতিয়ে বলো তো ? শুধু ভয় আর ভয় আর ভয়। আর ভয়ের সবচেয়ে বড়ো কাটান—ভালোবাসা ছাড়া আর কী ?

নিশান্ত (চিন্তিত) : মানি, কিন্তু ভালোবাসার নেপথ্যে যখন অভিমান ফুশলানি দিতে থাকে তখন সে ভয় না কাটিয়ে বাড়াতেও পারে লিদিয়া। কারণ তখন রোখালো মন মিলনের তরফে না দাঁড়িয়ে কেবল বিচ্ছেদেরি যুক্তি জড়ো করে বুদ্ধির আঁকশি দিয়ে। এই দেখ না আমার মামারই কথা। তিনি আমাদের বিবাহে অমত করেননি করতে চাননি ব'লে নয়—আমি সাবালক

আর নিজের ঘরে সর্বেসর্বা ব'লে—অর্থাৎ আমার ঘোড়ার সওয়ার আমার নিজের মর্জি ব'লে। মানে লাগামটা—আমার হাতে।

শ্রীমন্ত : ভাই, ব্যাপারটা ঠিক অত সরল নয়। কাকাবাবুর কাছে শুনেছি—আমার নিজের জীবনেও আভাষ পেয়েছি বারবারই—যে, এ-সংসারে আমাদের কারুর ইচ্ছা বা মর্জিই পুরোপুরি স্বাধীন নয়।

জিদিয়া : তার মানে? অদৃষ্টবাদ?

শ্রীমন্ত : না, তাও নয়। ব্যাপারটা আসলে যে ঠিক কী তোমাকে বোঝাতে পারব না। তবে একটি বিখ্যাত বাউল গান আমার বড় প্রিয় : "আমারে এ-আঁধারে এমন ক'রে চালায় কে গো?"

নিশান্ত : এ-গবেষণা এখন মুলতুবি রাখা থাক। বলতে কি, আমাদের এ-জীবনটাই তো আদ্যন্ত একটা আলো-আঁধারী ধাঁধা। নৌকো চালাতে চালাতে যেই মনে হয় অপারে পারের দিশা পেয়েছি অম্নি এক দম্‌কা হাওয়ার ঠেলায় সে ছোটে ফের পারের নোঙর কেটে—কোন্ অকূলে কে জানে? তাই আমি আর একটি বিখ্যাত গানের কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই :

> হেসে নাও এ দুদিন বই তো নয় :
> কার কি জানি—কখন সন্ধে হয়!
> আসে যায় আসে ফের জোয়ার।
> যৌবন আসে, যায় সে, কিন্তু ফেরে না কো আর,
> করো পান যত মধু তার...আহা, যৌবন বড় মধুময়।

শ্রীমন্ত : জানি—আর আমার সবচেয়ে ভালো লাগে এর শেষের অন্তরাটি :

> আছে তো জীবনভরা দুখ,
> আসে তায় প্রেমের স্বপন দুদণ্ডেরি সুখ!
> হারায়ো না হেলায় সে-টুক,
> ভালোবাসো ভুলে ভাবনা—ভয়।

নিশান্ত : এই এই এই—কেবল এ-গানটিতে কবি আনন্দবাদের সঙ্গে জুড়েছেন দুঃখবাদ। আমি বলি সুখ বা দুঃখকে মাপা যায় না তাদের পরিমাণ বা ওজন দিয়ে—দুদণ্ডের রঙিন স্বপ্নও অঢেল দুঃখের ক্ষতিপূরণ করতে পারে। তুমি কী বলো জিদিয়া?

লিদিয়া : আমি তোমাদের মতন মনীষী নেই ভাই, কী বলব বলো? তবে আমার মনে হয়, ভয় ভাবনা সংস্কে কাটে না নিজের চেষ্টায়।

শ্রীমন্ত : তবে?

লিদিয়া : কাটে যদি প্রার্থনা করা যায় মন মুখ এক ক'রে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। যখন আমি সীন নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলাম আত্মহত্যা করতে চেয়ে তখন আমার সত্যিই মনে হয়েছিল যে, এ-জীবন এক নিষ্ঠুর দৈত্যের খামখেয়ালিয়ানা—যে গড়ে শুধু ভেঙে সুখ পেতেই। মনে হয়েছিল সব আশার ঝিকিমিকিই মায়া, শুধু নিরাশার অন্ধকারই নিরবসান। কিন্তু জলে ঝাঁপ দিতেই সব বদলে গেল এক মুহূর্তে। মৃত্যু যখন কাছে আসে তখনই জীবনের আনন্দ-স্বরূপ ফুটে ওঠে—জানি না। জানি কেবল মনের আকুলি-বিকুলি—বাঁচতেই হবে—বাঁচতেই হবে—যেমন ক'রে হোক। অথচ সাঁতার জানি না—বাঁচব কেমন ক'রে? চিৎকার ক'রে ডাকলাম: "ভগবান্! বাঁচাও, বাঁচাও—" সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম জলে ঝপাৎ শব্দ। তারপর আর মনে নেই। যখন উঠলাম দেখলাম—আমি একটি হাসপাতালে শুয়ে। তখন তখন কেবল কান্না আর কান্না: "প্রভু, তোমার কৃপা আছে আছে আছে।" (একটু পরে চোখ মুছে) তারপরেই যে আমার পথের সব কাঁটা গোলাপ হ'য়ে আমাকে আশীর্বাদ করল একথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে। কিন্তু যখনই ফের নিরাশা অপমান ক্ষোভ আসত, প্রার্থনা করতাম চোখের জলে—অমনি—কিন্তু না, আর বলব না। (শ্রীমন্তকে) পরে বলব যখন তোমাদেরও পথে কাঁটাবন গোলাপবাগ হ'য়ে হাসবে।

শ্রীমন্ত : আমাদের ঘরোয়া বাংলায় বলে তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! মানে—তোমার বাণী হোক দৈববাণী!

দোরে টোকা···লিদিয়া বলল : "Entrez!" (এসো)

এক কিশোরীর প্রবেশ, হাতে একটি মস্ত আর্মস ফ্লাস্ক। অভিবাদন ক'রে "মসিয়ে চৌধুরীর জন্যে" ব'লেই প্রস্থান।

নিশান্ত (একগাল হেসে) : এই দেখ লিদিয়া, দেখ লিদিয়া, তোমার মাতিনা পাঠিয়েছেন—নিশ্চয় আইসক্রীম।

লিদিয়া (হাততালি দিয়ে) : Grâce à Dieu!* আমি প্রায় প্রার্থনা

* ভগবানকে ধন্যবাদ।

করতে বসেছিলাম চোখের জলে—কারণ আইসক্রীম আনতে আমার ভুল হ'য়ে গিয়েছিল।

নিশান্ত : ছি লিদিয়া! প্রার্থনা নিয়ে ঠাট্টা করে না।

লিদিয়া (চমকে) : কেন? ঠাট্টা তো ঠাট্টা।

নিশান্ত : শ্রীমন্ত ধার্মিক, মনে রেখো।

লিদিয়া (শ্রীমন্তকে) : আমার অপরাধ হয়েছে।

শ্রীমন্ত : না না…আমি কিছু মনে করি নি…

লিদিয়া কেঁদে ফেলে দুহাতে মুখ ঢেকে…

নিশান্ত (তটস্থ) : না না লিদিয়া, আমারি অপরাধ হয়েছে। তবে বিশ্বাস কোরো আমি কিছু ভেবে বলি নি—la langue m'a fourche. *

লিদিয়া (চোখ মুছে) : যা—ও। ঢের হয়েছে।

নিশান্ত : কী পাগল! এত মান করলে চলে?

লিদিয়া : মান? তোমার বন্ধুর সামনে…(ফের চোখে রুমাল)

নিশান্ত : না না শেরি! আমার ঘাট হয়েছে। মুখ তোলো লক্ষ্মীটি, mon adorée !†

লিদিয়া (মুখ তুলে) : সোহাগ রাখো। এখনই এই—না জানি বিয়ে হ'লে কী গতি হবে আমার!

নিশান্ত (চটুল হেসে) : আমারো ঠিক ঐ ভয় শেরি! যা সব চেয়ে ভয় করি হয়ত তাই হবে—সবাই হাসবে আমাকে স্ত্রৈণ নাম দিয়ে।

লিদিয়া : আ—হা! তুমি সেই পাত্র কি না! এইমাত্র কী বললে মনে নেই—যে, তুমি দুরন্ত ঘোড়সওয়ার—যে ঘোড়ার লাগাম কেবলমাত্র তোমার মর্জি? হাসছ যে বড়?

নিশান্ত : পাগলের কথায় শুধু লোক হাসে না, পাগল নিজেও হাসে।

লিদিয়া (চোখের জলে হাসি ফুটিয়ে) : আচ্ছা, কেবল তাহ'লে এমন হাসি হাসো যে পাড়ার সবাই কেঁপে উঠে কান্না সুরু ক'রে দেবে। ছাড়ো নটভঙ্গি। নৈলে তোমার বন্ধু হয়ত ভেবে বসবেন যে তাঁকে আমি ডেকেছি শুধু এক পাগলের অট্টহাসি শোনাতে।

নিশান্ত (মেঘ-গম্ভীর মুখে) : Non, ma chérie !‡ আমার হাসি

* মুখ ফসকে বলে ফেলেছি।

† হে আদরিণী!

‡ না, প্রিয়া!

হ'ল বোমার্শের হাসি—যিনি বলেছিলেন: "Je me presse de rire de tout, de Peur d'être obligé d'en pleurer.*

ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং···

নিশান্ত (টেলিফোন ধ'রে): Qui est lā? O··· (শ্রীমন্তকে) ধরো বন্ধুবর—মনে হচ্ছে—তিনি—তোমার "শেরি"।

শ্রীমন্ত (সাগ্রহে): Qui est lā?

স্বর (টেলিফোনে): আমি—প্রতিমা, বেল ভ্যু হোটেল থেকে বলছি।

শ্রীমন্ত: বেল ভ্যু হোটেল থেকে? কিন্তু তুমি···তুমি জুরিখে যাবে বললে?

প্রতিমা: জুরিখে গিয়েছিলাম ঠিকই—মার্গারেটের পাশের ঘরে ছিলাম। কিন্তু সব শুনে সে বলল: "তুমি উপস্থিত পারিসে যাও—আর এক্ষণি যাও, দেরি কোরো না।" তাই আমি আজ উড়ে এলাম।

নিশান্ত (টেলিফোন কেড়ে নিয়ে): প্রতিমা দেবী! আপনার প্রতিটি কথা আমি সাগ্রহে শুনেছি। আপনি হয়ত আমার নাম শুনে থাকবেন—নিশান্ত চৌধুরী·· শ্রীমন্ত অমনি সবাইকেই বাড়িয়ে বলে—ওকে তো চেনেন? হ্যাঁ, উচ্ছ্বাসী, তিলকে তাল না ক'রে পারে না—কিন্তু সে যাক, আমি ও লিদিয়া আপনাকে সাদরে অনুরোধ করছি এক্ষণি এখানে আসতে।···হ্যাঁ লাঞ্চে।···না না, আমাদের একটুও অসুবিধে হবে না।···না, আপনাকে আসতেই হবে। আপনার কথা শুধু যে শ্রীমন্তের মুখে শুনেছি তাই নয়। লিদিয়া খবরের কাগজে পড়েছিল আপনার জলন্ত হোটেলের একটি পাঁচ-ছয় তলার ফ্ল্যাট থেকে বিছানার চাদর ও শাড়ী বেঁধে দড়ি মতন ক'রে একটি থলিতে দু'তিনটি শিশুকে ঝুলিয়ে নিচে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়ার আশ্চর্য খবর। আপনি নিজে পরে সেই দড়ি বেয়েই নেমেছিলেন।···শুনুন···ওখানে আছেন? আচ্ছা, আমি এক্ষণি আমার মোটর নিয়ে যাচ্ছি···না না, অসুবিধে কী? আমার নিজের মোটর আছে।

* আমি জোর ক'রে সবকিছু হেসে উড়িয়ে দিই নৈলে পাছে কেঁদে ভাসাতে হয়।

॥ ছাব্বিশ ॥

মোটরে হাসিমুখে নিশান্ত শ্রীমন্তর পিঠে চাপড় দিয়ে বলল: "সাহেব পুরাণে মিথ্যে কথা লেখে না ভাই: Journeys end in lovers' meeting."

শ্রীমন্ত (ম্লান হেসে): ভাই, সাহেব পুরাণে একথাও লেখা আছে কালো আখরে: "There is many a slip twixt the cup and the lip."

নিশান্ত: কু-ডাক ডাকে না। অবিশ্যি যদিও পণ্ডিত পুরাণে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে যে, কমনীয়াদের মেজাজ "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ?" তবু আবহমানকাল তাঁরাই শক্তি জোগান শক্তিধরদেরও। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ কি অকারণ লিখেছিলেন:

নারী সে-যে মহেন্দ্রর দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।

শ্রীমন্ত: কিন্তু তাঁদের মানভঞ্জন করা যে সহজ নয় তুমিও তো জানো হাড়ে হাড়ে—দেখিনি কি খানিক আগেই লিদিয়ার চোখে এক ফোঁটা জলে তোমার করজোড়ে নতজানু হওয়া?

নিশান্ত (হেসে): এবার একহাত নিয়েছ ভাই। এখন কে আর বলবে তোমাকে নাবালক?

* * * *

ওরা "বেল ভ্যু" হোটেলে পৌঁছতেই হোটেলকর্তা এগিয়ে এসে শ্রীমন্তকে চাপা গলায় বললেন: "মাদামকে আপনার ঘরের পাশেই ঘর দেওয়া হয়েছে তিনি আপনার জন্যে লাউঞ্জেই অপেক্ষা করছেন।"

শ্রীমন্ত "আচ্ছা" ব'লে টুপি খুলতেই প্রতিমা বেরিয়ে এসে নিশান্তকে নমস্কার করে বলল:, "আপনাকে ধন্যবাদ মসিয়ে···"

নিশান্ত: "মসিয়ে আপনি" এসব কিন্তু ছাড়তে হবে—ডাকতে হবে নাম ধ'রে আর মন্ত্র করতে হবে তুমি—অর্থাৎ il fout tutoyer. লিদিয়াও তাই চায় কারণ···কারণ এ-যুগে সবাই "কমরেড", জানেন তো?

প্রতিমা: কিন্তু তা হ'লে আপনারাও আমাকে তুমি বলবেন, কথা রইল।

নিশান্ত : তথাস্তু, কমরেডজি। (ত্রয়ীর কোরাসে কলহাস্য)

নিশান্ত : শ্রীমন্ত! তুমি আর প্রতিমা দেবী পিছনে বোসো।

প্রতিমা : আবার দেবদেবী কেন—কমরেডের পর?

নিশান্ত : ক্ষমা ক্ষমা! আপনি পিছনে বসুন শ্রীমন্তের পাশে।

প্রতিমা : তথাস্তুর পরে কথার খেলাপ? ছি ছি! আপনি!

নিশান্ত : ফের ক্ষমা! তুমি—মানে পিছনে—

প্রতিমা : না, আমরা তিনজনেই বসব সামনে।

ওরা পাশাপাশি বসে মোটরের সামনের সীট-এ, প্রতিমা মাঝে।

* * * *

শ্রীমন্ত : তুমি আজই আসবে ভাবি নি···

প্রতিমা : মার্গারেটের হুকুম, নিরুপায়। সে বলল আগে মিটুক সব ঝামেলা। তারপর তোমার সঙ্গে ফের যাওয়া যাবে তার কাছে। সে যে কী চমৎকার মেয়ে কী বলব?

নিশান্ত : যক্ষ্মা তো সারে—বিশেষ সুইজর্লণ্ডে।

প্রতিমা : সারে—কিন্তু তার কথা পরে বলব খুলে। এখন শুনি আপনার—থুড়ি, তোমার আর লিদিয়ার কথা। শ্রীমন্তর মতে সে মডার্ন তিলোত্তমা।

নিশান্ত : প্লাস দ্রৌপদী—কতরকম রান্নাই যে রাঁধতে পারে! ধরুন—থুড়ি, ধরো, আজ সে পায়েস ছাড়া রেঁধেছে খিচুড়ি আর মাছের ঝোল খাস বাংলা ঢঙে।

প্রতিমা (হেসে) : এই-ই তো চাই। আকাশে বাতাসে রেডিও ঘোষণা করছে: "সুষমা—সিন্থেসিসের—যুগ এসে গেছে।" কাজেই ঘর বাতিল, শুধু পাঁচমিশেলির জয়জয়কার—খিচুড়িই মহাবাণী সব দেশেরি।

নিশান্ত : তুমি চমৎকার বাংলা বলো তো!

প্রতিমা : আমার বাবা যে বাঙালী—শোনো নি—?

শ্রীমন্ত (তারস্বরে) : সামাল সামাল!

নিশান্ত চক্ষের নিমেষে ব্রেক কষল। তবু ওদিক থেকে একটি টুসিটার-এর মাডগার্ডের ধাক্কা লাগল নিশান্তের মোটরের পুরোভাগে।

তরুণী সারথি : **Je vons demande pardon, monsieur...***

---

* আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি

নিশান্ত (হাত তুলে): Ce ne fait rien.*

তিনজনেই নেমে পড়ল। নিশান্ত এগিয়ে গিয়ে দেখে বলল: "মাডগার্ডের পুরোভাগটা বেঁকে গেছে, কিন্তু ভালো—কিছু ভাঙে নি। ব'লে তরুণীকে: "Reculez votre auto, s'il vous plaît !"†

অথ তরুণী মোটর পিছিয়ে নিয়ে আর তাকালো না—নক্ষত্রবেগে উল্টোমুখে পলায়ন। নিশান্ত ফিরে মোটরে আসীন হ'য়ে হেসে প্রতিমাকে বলে: "আজকাল অনেক বাচ্চা মেয়েও একটু চালাতে শিখেই ভাবে তারা রাতারাতি Sir Malcolm Campbell হ'য়ে উঠেছে—ফলে প্রতি বছরে কত যে দুর্ঘটনা ঘটে..."

শ্রীমন্ত (হেসে): ঋষিরা কি সাধে বলেছিলেন: "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী ?"

* * * *

লিদিয়া নিচে নেমে বাগানে পায়চারি করছিল। মোটর গেটে ঢুকতেই এগিয়ে এল "এত দেরি ?"

নিশান্ত: দেরি কোথায় ? মাত্র দশ মিনিট।

প্রতিমা নামতেই লিদিয়া তাকে বাঙালী কায়দায় নমস্কার ক'রে হাসিমুখে বলে বাংলাতেই: "আপনি যে এসেছেন দয়া ক'রে..."

প্রতিমা: দয়া তো আপনাদের। কেবল নিশান্ত কথা দিয়েছে যে, আপনি নামঞ্জুর, তুমিই চালু হবে।

চতুষ্কোন টেবিলের দুধারে বসল নিশান্ত ও শ্রীমন্ত, বাকি দুটি চেয়ারে লিদিয়া ও প্রতিমা।

প্রতিমা: কী চমৎকার ঘর ! আর এত ফুল ?

শ্রীমন্ত: আমাদের দেশে বলে—গৃহলক্ষ্মীর প্রসাদেই গৃহ হ'য়ে ওঠে আনন্দমেলা।

প্রতিমা (হেসে): কেবল মোটর চালালেই তাঁরা বসান নিরানন্দমেলা —তাই না ?

লিদিয়া: কী ব্যাপার নিশান্ত ?

নিশান্ত: বিশেষ কিছু নয়—এক তরুণীর টুসিটার মোড় বেঁকেই সোজা আমাদের মোটরের মাডগার্ডের ওপর চড়াও হয়। একটু দেরি হ'ল

* কিছু না

† আপনার মোটর একটু পিছিয়ে নিন দয়া করে।

আমাদের এইজন্যেই। (প্রতিমাকে) কিন্তু তরুণী সারথিদের ঠেশ দিয়ে কথা বলাটা আমার ঠিক হয় নি। আমাকে মাপ করবেন—থুড়ি—কোরো।

প্রতিমা: না আপনি—তুমি—তো—ভুল বলো নি। তবে কি জানো? আমার মনে হয় তরুণ সারথিদের প্রসাদেও কম দুর্ঘটনা ঘটে না।

নিশান্ত: মানছি। কেবল তুমিও মানবে আশা করি যে, মেয়েদের মোটর চালানো দেখে মন তত খুশী হয় না যত খুশী হয় তাদের ঘর-সাজানো দেখে।

লিদিয়া: কী বাজে বকছ?

নিশান্ত: তুমি যদি আমার কথায় কিছু মনে করো তো আমি ফের মাপ চাইতে রাজী আছি। কিন্তু আমার মনে হয় ঘর-সাজানো আর্টের কোঠায় পড়ে, মোটর চালানো শুধু···কী বলব...মানে, আর্ট নয়। (প্রতিমাকে) তাই আমি তোমাদের বড়ই করেছি, ছোট না।

শ্রীমন্ত: কিন্তু যে কোনো বিষয়ে দক্ষ হ'তে চায় তাকে অক্ষম বলা কি তাকে বড় করা? যে মোটর চালায় তার ঘর সাজানো কি নামঞ্জুর? যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?

প্রতিমা: ঠিক কথা। আমার তো মনে হয় যে-কোনো বিষয়ে দক্ষ হ'লেই তাকে শিল্পী বলা চলে।

নিশান্ত: মাপ কোরো প্রতিমা, কিন্তু এ-সূত্র একটু অত্যুক্তি নয় কি? শিল্পেরো নানা থাক আছেই আছে। বাজিকরের ভেল্কিশিল্প আর বড় কবির কাব্যশিল্প কি কীর্তিতে সমান?

প্রতিমা (আতপ্ত): কিন্তু আমি কি বলেছি জুতো সেলাইয়ের দক্ষতা ছবি-আঁকার প্রতিভার সমান? আমি শুধু বলতে চাই—মেয়েদের অনেক প্রচেষ্টাকে পুরুষেরা আজো ঠিক চোখে দেখতে শেখে নি ব'লে আমাদের অনেক কীর্তিকেই বিজ্ঞেরা পুরুষালি ব'লে দেগে দিয়ে হাসিঠাট্টা ক'রে থাকেন।

নিশান্ত (হেসে): এবার রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সানন্দেই বলছি: "মেনেছি হার মেনেছি।" তবে কি জানো? আমি তো শ্রীমন্তর মতন স্বভাবে চিন্তাশীল নই, আমার দৃষ্টি উপরভাসা।

প্রতিমা (প্রসন্ন): কিন্তু তুমি প্রেমিক তো, আর প্রেমের দৃষ্টিই হ'ল

সেরা দৃষ্টি। জলন্ত দৃষ্টান্ত—নিবেদিতা। আমার কয়েকটি প্রাজ্ঞ বন্ধুর কাছে শুনেছি—তিনি প্রেমের আতশী কাঁচের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন —যার নাম ভুল দেখা, বাড়িয়ে দেখা। তাঁর কথা ভাবতেও আমার রক্তে দোলা লাগে, চোখে জল আসে। আমার জীবনে তিনি বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পুরুষালি তেজ দীপ্তি দুঃসাহসকে কি হাজার হাজার লোক নিন্দে করত না সে-যুগে? (সুর নামিয়ে) হয়ত আমি ঝোঁকের মাথায় একটু অবান্তরের কোঠায় এসে পড়েছি। (লিদিয়াকে) শোনো লিদিয়া, তোমাকেও আমি ভুল বুঝেছিলাম, নিশান্তকেও। শ্রীমন্তর চিঠিতে আমি প্রথম চম্‌কে উঠি। কিন্তু ঝোঁকালো মন কি সহজে বাগ মানে ভাই? তাই আমি ভুলকে আঁকড়ে শ্রীমন্তর চিঠির উত্তর দিলাম না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম চোখের জলে—পথের দিশা চেয়ে মিলল সে-দিশা চাইতে না চাইতে। মার্গারেট অসুস্থ হ'য়ে ফিরে এল আফ্রিকা থেকে সুইজর্লণ্ডে। জুরিখে তার কাছে পরশুদিন সন্ধ্যায় পৌছতেই সে দিল আমার চোখের ঠুলি খুলে—কিন্তু কী ভাবে জানো? তার নিজের জীবনের করুণ কাহিনী ফলিয়ে ব'লে। সব বলা সম্ভব নয়, তবে সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই যে, সে যাঁকে ভালোবেসেছিল তিনি ছিলেন তেজস্বী পুরুষ, তাই চলতি সুনীতির হুকুম-বরদার হ'তে পারেন নি। মার্গারেট তাঁকে ভুল বুঝল, ভাবল তিনি ইহুদী ব'লেই খৃষ্টানদের স্তবস্তুতি ডগমা মেনে চলতে চান না। এক কথায়, ভয় পেল প্রেমের ডাকে লোকাচার ছাড়তে। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বে তার শরীর মন দুই-ই ভেঙে পড়ল। সে শান্তি পেতে চ'লে গেল আফ্রিকায় নার্স হ'য়ে।

লিদিয়া: আমি শুনেছিলাম—মার্গারেটের বাপ মা তার স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি ইহুদী ছিলেন ব'লে।

প্রতিমা: মার্গারেট ঠিক সেজন্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করে নি, করেছিল লোকমতকে সে বিষম ভয় করত ব'লে। তাই বুঝেও বুঝতে চায় নি, যে, খৃষ্টান লোকাচারের মধ্যে অনেক কিছুই গাজোয়ারি কথা আছে যাদেরকে আদৌ খৃষ্ট দেবের বাণী ব'লে বরণ করা চলে না। তাই সে প্রধানত ভয় পেয়েই আফ্রিকায় চ'লে যায় নার্স হ'য়ে। সেখানে গিয়ে তার ভয় ভাঙে কয়েক বৎসর পরে—কিন্তু তখন "টু লেট"—সে যক্ষ্মায় শয্যাশায়ী। নিরাশার অন্ধকারে সে চোখের জলে কেবলই নিজের মৃত্যুকামনা করত। কিন্তু মৃত্যু এল না—তাকে ফিরে আসতে

হ'ল স্বদেশে—সুইজলণ্ডে। আমাকে সে তার ব্যর্থতার করুণ ইতিহাস ব'লে শেষে বলেছিল যে, প্রেম সার্থক হয় প্রথম ভয়কে জয় ক'রে, তারপর নত হ'তে চেয়ে। শুনতে শুনতে আমার সত্যিই মনে হ'ল—ভগবানের বিদ্যুৎঝলক যেন আমার মনের মেঘলা আঁধার দূর ক'রে দিল তারই নির্দেশের ছদ্মবেশে। কেন এমন হ'লে বোঝাতে পারব না, শুধু বলি নিবেদিতার একটি কথা মনে পড়ছে: "Some of the deepest couvictions of our lives are gathered from data which can influence no one but ourselves."* এই সূত্রে মার্গারেট আমাকে বলেছিল একটি অমূল্য কথা: যে, আমরা জ্ঞানের আলো পাই নানা উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে বটে, কিন্তু সবচেয়ে বড় উপলব্ধি হ'ল প্রেম। এ-প্রেম বাইরে থেকে দেখতে শিশুর ম'ত দুর্বল, কিন্তু সংসারে কে আছে শিশুর ম'ত দিগ্বিজয়ী? এ-বাণীটি সেদিন শেষরাতে আমার বুকের বীণায় বেজে উঠেছিল একটি গানের ঝঙ্কারে। গানটি আমার মনে নেই, কিন্তু তার মর্ম এই যে, প্রেমে যে সব হারায় সেই পায় মণির মণি, পরশমণি, যার ছোঁওয়ায় ধুলোর মধ্যেও জ্ব'লে ওঠে তারা।...শুনতে শুনতে আমি যেন আর এক রাজ্যে চ'লে গিয়েছিলাম—যে-রাজ্যে·· কিন্তু না, ভাষা যার নাগাল পায় না ভাষা দিয়ে কেমন ক'রে তার আভাষ দেব?··· (চোখ মুছে) সত্যি লিদিয়া, আজ কেবল একটা কথাই আমার মনে হয় ফিরে ফিরে, গাছের পাতায় মর্মরের ম'ত: মানুষ চোখ থেকেও কেন চোখ খুলতে চায় না? খুললে দেখতে পেত—যে মাথা উঁচু ক'রে চলে সে মানুষের কাছে মানের মুকুট পেতে পারে, কিন্তু যে মাথা নত করে সেই কেবল পায় ভগবানের আশীর্বাদ।

লিদিয়া (জলভরা চোখে উঠে প্রতিমার কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে): যেমন তোমার মতন মেয়ের আমার মতন মেয়ের কাছে আসা ভগবানের আশীর্বাদ।

প্রতিমার চোখের জল আর বাধা মানে না। সে উঠে লিদিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং ··

নিশান্ত (টেলিফোন ধ'রে): কে?···ও·· (প্রতিমাকে) ধরুন।

---

* আমাদের জীবনে কোনো কোনো গভীর প্রত্যয় এমন সব ঘটনার প্রণালীর মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে যেসব ঘটনা আর কারুর মনেই কোনো ছাপ ফেলতে পারে না।

My MASTER AS I SAW HIM...Chapter 19...NIVEDITA

প্রতিমা : কে ?...মার্গারেট ?...হ্যাঁ দিদি, কাঁটার আর চিহ্নও নেই—শুধুই গোলাপ।...কী ? হ্যাঁ (শ্রীমন্তকে) তোমাকে ডাকছেন।

শ্রীমন্ত : হ্যাঁ দিদি—প্রতিমা আর আমি কালই জুরিখে যাব—শুধু আপনাকে দেখতে নয়—প্রণাম করতে।

লিদিয়া : আমিও যাব।

নিশান্ত : শুধু আমিই থাকব একঘরে হ'য়ে ?

প্রতিমা (হেসে) : না না—তুমিও যাবে বৈকি ভাই—কেবল পুরুত হ'য়ে। (সকলের কলহাস্য)

প্রেম অভয়

দ্বিতীয় ভাগ

॥ এক ॥

বিবাহ ওদের হ'ল লণ্ডনেই। মার্গারেট কথা দিল যে যদি একটু সেরে ওঠে তবে লণ্ডনে গিয়ে প্রতিমাদের অতিথি হয়ে দু'চারদিন আনন্দ করবে। এ-আশা তার মনে জেগেছিল নতুন পদ্ধতিতে চিকিৎসায় তার বুকের কষ্ট ক'মে গিয়েছিল, নিশ্বাস নেওয়াও সরল হ'য়ে এসেছিল ব'লে। ডাক্তারেরা খুশী হ'য়ে রায় দিলেন: "She is responding to treatment." মার্গারেট তবু বিশ্বাস করতে পারেনি, কারণ দেহ দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনও বেশ একটু দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল। ফলে এক একবার দুরন্ত আশা সব নিরাশাকে দাবিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও যথাকালে ফের হতাশার ছায়া উঠত ঘনিয়ে। প্রতিমা তাকে বোঝালে হেসে বলত: "মা শেরি! যে জীবনের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে আর যে লাঠি ধ'রে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে তাদের মন সহজে সই পাতাতে পারে না।" শ্রীমন্ত রুখে উঠে বলত: "কিন্তু আপনি মহাত্মা শ্বাইৎজারকে গুরুবরণ ক'রে এ কী বলছেন দিদি? তিনি কি পই পই ক'রে মানা করেননি জীবনকে প্রত্যাখ্যান না করতে? তাঁর সারা জীবনই কি এই মন্ত্রের পাঠ দেয়নি যে জীবনবাদ, লাইফ অ্যাফার্মেশনই হ'ল প্রতি তীর্থযাত্রীর সবচেয়ে বড় পথের পাথেয়? ল্যাম্বারেনে:ত কী অজস্র বাধাকে তিনি ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন! পঙ্গুও যে এই মন্ত্রের জোরে পাহাড়ে চড়তে পারে একথা সাধুসন্তরাও ব'লে থাকেন।" মার্গারেট এ ধরণের আশা-বাদী বাণীতে কখনো কখনো সাড়া দিলেও বুকের কষ্ট বাড়লে ফের ধরত হারমানার সুর। তবু সব ছাপিয়ে ওর মন চাইত জীবনবাদের বাণীকেই বরণ করতে। একদিকে প্রতিমার দৃঢ় বিশ্বাস, অন্যদিকে লিদিয়ার পরাজয়ের পথে জয়লাভের দৃষ্টান্ত ওকে গভীর আনন্দ দিত। তাই যখন জুরিখে ওরা দশ-বারোদিন কাটিয়ে ফিরল তখন মার্গারেট ওদের কথা দিল যে যদি ডাক্তারের চিকিৎসায় আর একটু বল পায় তবে আপ্রাণ চেষ্টা করবে লণ্ডনে গিয়ে প্রতিমাদের বাড়িতে দু-চারদিন থাকতে—শুধু ওদের আনন্দ দিতেই নয়, নিজেও বল পেতে।

যেদিন প্রতিমা বিদায় নিল সেদিন মার্গারেট ওকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলল : "তোমাকে দেখে আমার কী মনে হয়েছে বলব ? মনে হয়েছে স্বর্গের পাটে নামাটাই মায়া—উদয়টাই সত্যের সত্য, বাণীর বাণী। দুঃখের ছোঁয়াচ কাটাতে হ'লে সব চেয়ে বড় সহায় কী জানো ?—এমন কাউকে ভালোবাসা যে বাধাকে বাতিল ক'রে কাঁটাবনে পথ কেটে নিতে পেরেছে। তোমার মতন মেয়ের স্নেহ আমাকে শুধু পথের পাথেয়ই নয়, দিয়েছে পারের পারানি।"

॥ দুই ॥

প্রতিমা চেয়েছিল কলকাতায় তার ক'রে জানাতে কবে বিবাহ হবে। কিন্তু শ্রীমন্ত অভয়মন্ত্র জপ ক'রেও পুরোপুরি সাহস পেল না। বলল তার করলে উল্টো উৎপত্তি হবে—এমন কি তার মা হন্তদন্ত হ'য়ে উড়েও আসতে পারেন। নিশান্তও ওকে বলেছিল : "ভাই, রাজনীতিতে যাকে বলে fait accompli* সে নীতি সুবিধার নীতি হ'লেও সব সময়েই যে কূট নীতি এমন কথা বলা চলে না। তোমার মা যখন ছেলের কথা না ভেবে কেবল নিজের আচারের কথাই ভাবছেন তখন তোমার পক্ষে মাতৃভক্তি পড়বে অতি ভক্তির পর্যায়ে।"

প্রতিমা রোখালো অগ্রপন্থী—আপত্তি তুলল : "আমরা যখন অপরাধ করছি না তখন লুকোচুরি করব কী দুঃখে ?" শাস্ত্রীজি হেসে মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন : "একে লুকোনো বলছ কেন মা ? নিজের মনোমত পথে পা বাড়াবার অধিকার যখন আবহমানকাল বিধাতারও প্রত্যক্ষ সমর্থন পেয়ে এসেছে, তখন তুমি শ্রীমন্তকে বিয়ে করবে সেও তোমাকে বরণ করবে এতে কার কী বলবার আছে ? যেমন স্ত্রী পতিব্রতা হ'লেও স্বামীকে অন্যায় করতে দেখলে বলতে পারে 'ওতে আমি নেই' তেমনি ছেলেও মা-কে বলতে পারে তোমার সংস্কার কুলাচার তোমার ধর্ম, আমার ধর্ম যাকে আমি মানুষের ধর্ম ব'লে মনে করি তাকেই স্বধর্ম ব'লে বরণ করতে চাওয়া। সংসারে অনেক বাধার বাঁধকে পাশ কাটিয়ে চললে চলা সহজ হয় ব'লেই কি বলবে বাঁধকে না এড়িয়ে তার সঙ্গে অনর্থক লড়াই ক'রে শক্তিক্ষয় করাই সুবুদ্ধির কাজ ? মা, আমাদের উপনিষদে একটি কথা আমার মনে হয় অপ্রতিবাদ্য—যে, শুভবুদ্ধির

* যা হ'য়ে গেছে আর উল্টোনো যায় না।

সঙ্গে আমাদের ঘরোয়া বুদ্ধির যোগ না হ'লে অনর্থই ফেঁপে ওঠে। তুমি শ্রীমন্তকে ভালোবেসে বিবাহ করছ তোমার শুভবুদ্ধির কম্পাস মেনে। তোমার এ-উদ্দীপনা ভুল হ'তেও পারে কিন্তু যখন শ্রীমন্তর বাবাও তার দিকে, আমরাও তাকে বরণ করেছি আপন ব'লে তখন তোমার মতিভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। মার্থা হেসে বলল: "নিশান্তর বুদ্ধিকেই আমার মনে হয় সবচেয়ে শুভ —যা হ'য়ে গেছে তাকে নাকচ করা অসাধ্য না হ'লেও দুঃসাধ্য।"

অগত্যা প্রতিমা রাজী হ'ল যদিও ঈষৎ ক্ষুণ্ণ মনে। ওদের বিবাহ হ'ল হিন্দুমতেই। শাস্ত্রীজি নিজে সানন্দে বেদমন্ত্র আওড়ালেন: "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং..."

॥ তিন ॥

অতঃপর দ্বিতীয় বিবাহের পালা: নিশান্ত ও লিদিয়া। কিন্তু সে বিবাহ হ'ল সিভিল ম্যারেজ—রেজিস্ট্রি ক'রে। নিশান্তর এতে একটু আপত্তি ছিল কিন্তু লিদিয়া বেঁকে বসল, বলল: "আমি যখন প্রতিমা নই, তুমিও শ্রীমন্ত নও, তখন ওদের স্বধর্মের সঙ্গে আমাদের স্বধর্মের মিল খুঁজতে যাওয়া ভুল। বিবাহে আমার আস্থা টলমলে—তোমাকে বলেছি। তোমার পক্ষেও আমার মতন মেয়েকে হিন্দুমতে বিবাহ করলে তার নাম হবেই হবে অশুভবুদ্ধি। এখন তোমার রায় দাও।"

নিশান্ত (হেসে): আমার আবার রায় কি লিদিয়া? আমি না মানি হিঁদুয়ানি না খৃশ্চানি কেতা। আমি মানি কেবল একটি দিশারিকে, তার কী নাম তুমি জানো।

প্রতিমা (হেসে): সেকেলে প্রেম?

নিশান্ত: এইবার পাকে পড়লে প্রতিমা। সব কিছুই যুগ বদলালে সেকেলে হ'তে পারে, পারে না কেবল প্রেম—দাম্পত্য প্রেম। সৃষ্টির উদয়লগ্নে মদনদেব এর যে মায়াজালের খবর পেয়েছিলেন আজও সে জালের প্রতি তন্তুটি তেমনি অটুট, তেমনি শক্ত আছে—

শ্রীমন্ত (হেসে): যা বলেছ ভাই—জন্মাষ্টমীতে বাবার গীতা আবৃত্তি মনে পড়ে: অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ম্ অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ, যাকে ছুরি দিয়ে

কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না···ইত্যাদি ইত্যাদি। নৈলে কি আমি আজ এমন ফাঁপরে পড়তাম ?

প্রতিমা : যা—ও। ফাঁপরই যদি মনে করো তবে এখনো সময় আছে—খাবি খাওয়ার পরেও মানুষ বাঁচে—তোমার বড়জোর একটু হাঁপাতে হচ্ছে—চলো ফাঁকা আরামের পথে ফাঁপর এড়িয়ে।

শ্রীমন্ত : আ-হা ! রসিকতাকে অনুতাপ মনে করতে আছে ? আমি শুধু একটা কথা ভাবছিলাম···

প্রতিমা : যথা ?

শ্রীমন্ত : মা যদি সত্যিই উড়ে আসেন তবে তোমার মুখকমল দেখে গ'লে যাবার সম্ভাবনাও তো আছে।

লিদিয়া : না ভাই। শুচিবাইয়ের নীরস মাটিতে সব কমলই আফোটা ঝ'রে যায়। বিশেষ ক'রে যেখানে তার পিছনে থাকে ধর্মের ধমক।

এ শুধু একটু নমুনা—কীভাবে ওদের মধ্যে আলোচনা হ'ত বিবাহের মতন অবোধ্য ব্যাপারকে সুবোধ্য করতে চেয়ে। প্রত্যেকেই দেখত একই জিনিসকে আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে, আর দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের কাছেই সমস্যাটির এক এক নতুন বিভাব ফুটে উঠত।

কিন্তু সব হাঁ ও না-র ঊর্ধ্বে সেই আকর্ষণী মোহশক্তি যার রায়ের পরে আপীল চলে না। তাই দুই দম্পতীরই বিবাহ সুসম্পন্ন হ'য়ে গেল যথাবিধি !

॥ চার ॥

কয়েকদিন বাদে শ্রীমন্ত তার পেল আইল অফ ওয়াইট-এর এক হোটেলে (যেখানে ও গিয়েছিল প্রতিমাকে নিয়ে 'মধুচন্দ্র' যাপন করতে) :

"Your father overjoyed. Wants you to return with Pratima. Your mother reconciled. Dont worry."

টেলিগ্রামটি এসেছিল যথাকালেই—ঠিক যখন প্রতিমা অশান্ত হ'য়ে ভাবতে সুরু করেছিল—এর পরের অধ্যায় কি এমন কোনো ভবিতব্য যার মার নেই ? শ্রীমন্তকে কাছে পেয়ে ও আনন্দিত হয়েছিল বৈ কি—কিন্তু একদিকে ভারতবর্ষে ফিরে নতুন গৃহিণীপনার জল্পনা কল্পনা ভয় ভাবনা, অন্যদিকে এক নতুন

আলোড়ন সুরু হ'ল ওর মনে। ও দেখল ও নিজে ঠিক নিবেদিতা নয়। অর্থাৎ শুধু ভারতবর্ষের সেবিকা হবার আদর্শের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক কামনা যার পূর্ণ পরিণতি দেহের মহলে না হ'লেও দেহমন্দিরে। সে তৃষ্ণার আলো নিভেও নেভে না।

স্পষ্টবাদী মেয়ে, বলল শ্রীমন্তকে সব খুলে। শ্রীমন্ত হেসে উড়িয়ে দিল: "এ কি আমি জানতাম না?"

প্রতিমা: জানতে?

শ্রীমন্ত: শুধু আমি নই—লিদিয়া নিশান্ত মার্গারেট সবাই জানত।

প্রতিমা: আর বাবা মা?

শ্রীমন্ত: তোমার বাবার কথা বলতে পারি না জোর ক'রে—কারণ·· বুঝতেই তো পারো ··এ আলোচনা ঠিক শ্বশুর জামাইয়ের সমস্যার এলাকায় পড়ে না ··তবে তোমার মা আমাকে মৃদু হেসে যে ইঙ্গিত করেছিলেন তার একটি ছাড়া দুটি ভাষ্য নেই।

প্রতিমা: কী? খুলে বলো। তোমার আমার সমস্যার এলাকায় যখন এ আলোচনা এসে পড়েছে তখন স্পেডকে স্পেড বলাই ভালো। অর্থাৎ আমি সেই মামুলি মেয়ে যার আদর্শ যাই হোক না কেন চরিত্র অবলার।

শ্রীমন্ত: অমন কথা বলে না, ছি! তোমাকে আমি প্রথম থেকেই যে-গভীর শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি...

প্রতিমা: ওসব ফালতো কথা থাক। আমি শ্রদ্ধা চাই না, চাই সত্য।

শ্রীমন্ত: কিসের সত্য?

প্রতিমা: তা-ও মনে করিয়ে দিতে হবে?

শ্রীমন্ত: ব্রহ্মচর্য্যের সত্য?

প্রতিমা: আমার আদর্শকে হসনীয় দাঁড় করালে দুঃখ পাব। ব্রহ্মচর্যের বিধি আমরা দুজনে নিরালায় সযত্নে গড়েছিলাম—একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। সে-উদ্দেশ্য—ভারতের সেবা।

শ্রীমন্ত: বিবাহ করলে ভারতের সেবা হয় না? গান্ধিজী, তিলক, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ···

প্রতিমা: জানি। কিন্তু অন্যদিকে শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামতীর্থ···

শ্রীমন্ত: শোনো প্রতিমা, যখন প্রশ্নটা উঠেছে তখন চাপাচুপি বা গোঁজা-

মিল না দেওয়াই ভালো। আমার মনে হয়—এক শ্রেণীর মহৎ মানুষ আছেন যাঁরা স্বভাবে বৈরাগী ব'লে তাঁদের স্বধর্ম সন্ন্যাস বা ব্রহ্মচর্য—তাই এঁদের কাছে বিবাহই হবে পরধর্ম। কিন্তু আর এক শ্রেণীর মহাত্মা আছেন—যাঁরা সব অশুদ্ধিকেই আগুনের মতন পুড়িয়ে শুদ্ধ ক'রে নিতে পারেন আর সে-আগুন জ্বলে তাঁদের প্রাণশক্তির আহুতিতে। তুমি হয়ত স্বভাবে সন্ন্যাসিনী তাই তোমার কাছে ব্রহ্মচর্য স্বধর্ম হ'তে পারে। কিন্তু আমি ঠিক শুকদেব নই যাঁর মনে বিবসনা সুন্দরীকে দেখলেও কোনো বাসনার রঙ লাগত না—মনে পড়ে তো ভাগবতের কাহিনী ?

প্রতিমা : কী কাহিনী ?

শ্রীমন্ত : শাস্ত্রীজির মুখে শোনোনি ?

প্রতিমা : না। তুমিই বলো না—এত ভনিতা কেন ?

শ্রীমন্ত : আমার বাবার কাছে আমি ভাগবতের নানা কাহিনী শুনতাম। তার মধ্যে একটি কাহিনী ছিল—এক হ্রদে কয়েকটি বিবসনা অপ্সরা স্নান করছিল। শুকদেব সে হ্রদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা একটুও লজ্জা পেল না। একটু বাদে ব্যাসদেবকে সেই পথে দেখবামাত্র তারা ঝটিতি উঠে শাড়ী পরল। তাতে ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করলেন : "আমার ছেলে শুকদেব যুবক তাকে দেখে তোমরা লজ্জা পেলে না, অথচ বৃদ্ধ আমাকে দেখে এমন ত্রস্ত হ'য়ে উঠলে কী দুঃখে ?" উত্তরে তারা বলল : "ঠাকুর শুকদেব শুধু ব্রহ্মবিৎ নন, তাঁর অন্তর সর্বদা ব্রহ্মে লীন থাকে ব'লে কে নর কে নারী এ চিন্তাও তাঁর মনে আসে না। কিন্তু তুমি একাধিক সন্তানের জন্ম দিয়েছ—তোমার সঙ্গে তাঁর তুলনা ?"

প্রতিমা (একটু চুপ ক'রে থেকে) : আমিও কিছু শুকদেবী নই। পুরুষ বলতে কী বোঝায় জানি। কিন্তু জানি ব'লেই আরো মানি ব্রহ্মচর্যকে। যার কাছে ভোগ কাম্য নয় তার পক্ষে ভোগ ত্যাগ করা যে সহজ এ সত্যের দৃষ্টান্ত মেলে নানা সেন্টের চরিত্রে—যাদের শিরোমণি খৃষ্টদেব। কিন্তু বহু সেণ্ট বা মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীকে আপ্রাণ সাধনায় তবে চিত্তশুদ্ধি লাভ করতে হয়েছে। আমি এ পর্যন্ত চিত্তশুদ্ধিকে তাঁদের মত সবচেয়ে বড় মনে করিনি। কারণ আমি আদৌ বনচারিণী বা মঠবাসিনী বৈরাগিনী হ'তে চাইনি। আমার আদর্শ—ভারতের সেবিকা হওয়া। নিখুঁৎ নির্মলা না হ'য়েও আন্তরিক দেশ-সেবিকা হওয়া যায়। এ আদর্শও ছোট আদর্শ নয়। কিন্তু নিবেদিতা ব্রহ্ম-

চারিণী ছিলেন ব'লে মনে মনে আমি সেই আদর্শকেই বরণ করেছি তাঁকে প্রাণের বেদীতে বসিয়ে। এরপর তোমার সঙ্গে বিবাহের পর আবিষ্কার করলাম যে, আমার মনে ক্রমাগতই নানা ভাব জাগছে যাদের মধ্যে মিল কিছু থাকলেও অমিলই বেশি। তাই এখন তোমাদের দেশে যাওয়া ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না। ধরো, তুমি আমি আজকাল আলাদা ঘরে শুই এতে তোমার মা-র যদি মন খারাপ হয়? বলা তো যায় না কিসে কী হয়—বিশেষ যখন তোমার মা সংস্কারের স্রোতেই গা ভাসিয়ে চলেন। তিনি হয়ত বলতে পারেন—এ বিলিতি কেতা ভারতবর্ষে অচল। কিন্তু আসলে এ কেতাও নয় বিলিতিও নয়, একমাত্র আমার মনের রোখ। মন আমার চঞ্চল হয় ব'লেই এ ব্যবস্থা। এর পরে তুমিও যদি আমাকে ভুল বোঝো তবে শান্তি পেতে কার কাছে যাব? (দুহাতে মুখ ঢাকে)

শ্রীমন্ত (তার কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে): আমি ভুল বুঝব না গো বুঝব না। তাছাড়া স্বভাবে আমি অসহিষ্ণু নই, তোমাকে ভালোবেসে এটুকুও বুঝতে আমার দেরি হয়নি যে, তুমি গড়পড়তা মেয়ে নও ব'লেই তোমার কাছে অনেক কিছুই সমস্যা হ'য়ে উঠবে যা আর সকলের কাছে সহজ সরল মনে হয়। তুমি কেঁদো না, ছি! আমি সব সইতে পারি কেবল তোমার চোখের জল দেখলে মন আমার এমন উতলা হয় যে···

প্রতিমা (মুখ তুলে হেসে): কী? যে যাতে তুমি উতলা হও তাতে আমিও উতলা হই কি না পরখ করতে সাধ হয়?

(ওর বাহুবন্ধনে ধরা দেয়)

শ্রীমন্ত (সাদরে): তোমার মধ্যে আমি যা দেখেছি.. তোমার কাছে আমি যা পেয়েছি—আমার আশার অতীত। তাই তোমাকে শুধু অনুরোধ করি—তুমি আর যে ভয়ই করো না কেন, আমি তোমাকে ভুল বুঝতে পারি এ ভয়কে আমল দিও না।

প্রতিমা: ভয়? কিসের? ভালোবাসায় অপরাধ হয় এই? জানো আমি পরশু নিবেদিতার একটি বই পড়ছিলাম—স্বামীজির সঙ্গে হিমালয়ে। তাতে তিনি লিখেছেন (বই খুলে পড়ে) এই দেখ স্বামীজি পারসী কবিতা সম্বন্ধে বলেছিলেন হাফেজের বিখ্যাত প্রেমসঙ্গীতের উল্লেখ ক'রে: "For one mole on the face of my beloved I would give all the wealth of Samarcand!" শুধু তাই নয়, শোনো তাঁর মন্তব্য: "I

would not give one straw, you know, for the man who was incapable of appreciating a love song." কী জোরালো কথা বলো তো যে, প্রেমসঙ্গীতকে উচ্ছ্বাস ব'লে যে হেনস্থা করে সে অর্বাচীন! আমি তো থ হ'য়ে গেছি।

শ্রীমন্ত (হেসে): আমার হাততালি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে—তুমি ডুবলে ব'লে।

প্রতিমা (হেসে): ডুবব কি? আমি থ হবার পরে খিল খিল ক'রে এমন হাসতে লাগলাম যে ভয় হ'ল পাছে চোয়াল আটকে যায়। কেবল একটা কথা: হাফেজের গানটি কি জানো তুমি?

শ্রীমন্ত: জানি বললে ভুল হবে, জানি না বললেও অসত্য হবে। আমার দাদু পার্সী জানতেন তিনি গাইতেন প্রায়ই—শুধু প্রথম শ্লোকটি আমার মনে আছে। শোনো:

অগর আঁ তুর্কে শীরাজী বেদস্ত্ আ রদ্ দিলেমারা
বখালে হিন্দু অশ্ বখ্শস্ সমর্কন্দ আ বুখারারা।

এর অনুবাদ:

আমার সেই অন্তরের কান্তা, মিলন তার চায় উছল মনপ্রাণ
তিলের তার করতে তর্পণ দেই সমর্কন্দ আর বুখারারায় দান।

প্রতিমা: হুঁম। স্বামীজির তীব্র মন্তব্য সত্যি আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছে। ভাবতে ভাবতে চম্‌কে উঠলাম—স্বামীজি ঠিকই ধরেছিলেন। কারণ জগতে সবকিছু অতি পরিচয়ে ম্লান হ'য়ে এলেও প্রেমের গান প্রেমের গল্প প্রেমের কাব্য আজও পুরোনো হ'ল না। তাছাড়া তোমাকে বিবাহ করার পর কেন জানি না আমার অনেক জাঁকই মিইয়ে গেছে। তাই তোমার উৎকণ্ঠাকে এখন আর আমল দিও না দিও না দিও না যে, প্রেমকে চুম্বক উপাধি দিয়ে তুমি আমার কাছে আসতে চাইলে আমি আপত্তি করতে পারি।

শ্রীমন্ত (উঠে প্রতিমাকে আলিঙ্গন ক'রে তার মুখ নিজের বুকে টেনে): একথা শুনে আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে বলার ভাষা খুঁজে পাই না।

প্রতিমা (মুখ তুলে দুহাতে তার কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে হেসে): একটা গান তোমারই মুখে শুনেছিলাম: "রসনা নীরব রবে যা কবার তা কবে আঁখি।" এ-ইন্দ্রিয়জগতে চোখের ভাষার মতন ভাষা আর আছে কি?

শ্রীমন্ত (উল্লসিত): না, বলো—পাষাণপুরীর দোর ভেঙে বেরিয়ে

আসার মতন আনন্দ আর আছে কি? সত্যি, তোমার কথায় আমি কী যে ভরসা পেয়েছি…

প্রতিমা: ভরসা? আমি কবে তোমাকে নির্ভরসা করেছি শুনি?

শ্রীমন্ত: করো নি—জেনে যে আমি দুর্বল? যার আশার সম্পদ আছে তার আশা পূর্ণ হোক বা না হোক তাকে দেউলে বলা চলে না। তাই একটি বিখ্যাত কবিতা আমার কোনোদিনই ভালো লাগে নি: "আশার ছলনে ভুলি' কী ফল লভিনু হায়!" কারণ আশার খুঁটি ধ'রেই পড়ন্তরা সবাই ওঠে, আশা যদি ছলনা হ'ত তবে সারা সংসারটাই হ'ত মরীচিকা।

(দোরে খট খট খট—এরা ত্রস্ত হ'য়ে স'রে বসে দুটি চেয়ারে)

প্রতিমা: এসো।

॥ পাঁচ ॥

প্রতিমা (উঠে): এ কী? বাবা!

শাস্ত্রী (প্রতিমাকে বুকে টেনে নিয়ে): একেবারে সশরীরে।

প্রতিমা: দুঃসংবাদ?

শাস্ত্রী: সেটা নির্ভর করে মা, দৃষ্টিভঙ্গির উপর। সংসারটা পাঁচমিশালি। তবে পরমহংসদেব বলতেন গোলমালের গোল বাদ দিয়ে যে মালটা হাতাতে পারে সেই চতুর। কিন্তু ঠাট্টা থাক, আইল অফ ওয়াইটে আমার এক বন্ধু ক্যান্সারে শয্যাশায়ী—তাঁকে দেখতে যেতে হবে, হয়ত দুতিন দিন থাকতে হবে তাঁর শিয়রে অপারেশনের পরে।

প্রতিমা (শিউরে উঠে): ক্যান্সার!

শাস্ত্রী: হ্যাঁ, সঙিন অসুখ বৈ কি। তবে এখানে সম্প্রতি এক ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ সার্জন এসেছেন তাই স্থির হয়েছে এখানেই অপারেশন হবে। (কবজি ঘড়ি দেখে) এখন ন-টা। সাড়ে দশটায় অপারেশন। দেরি করলে চলবে না। সংবাদটা দিয়েই প্রস্থান করতে হবে। তবে দুঃসংবাদের সঙ্গে সুখবরও জড়িয়ে আছে। (শ্রীমন্তকে) তোমার বাবা কাল টেলিফোন করেছেন তোমাকে জানাতে যে, তোমার মা কান্নাকাটি ক'রে শেষে

ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে বধূবরণ করতে রাজী হয়েছেন। তাই এখন তুমি প্রতিমাকে নিয়ে দেশে ফিরতে পারো।

প্রতিমা: ও হয়ত পারে—কে জানে? কিন্তু প্রতিমা পারে না পারে না পারে না।

শাস্ত্রীজি: ছী মা! অমন কথা বলে না।

প্রতিমা (কাঁদো কাঁদো স্বরে): কেন বলব না বাবা? আমি কী এমন হাঘরে মেয়ে যাকে বধূবরণ করতে শাশুড়ীর চোখের জলে নদী বহাতে হয়? মনে হয় না কি এই অপরূপা আমাকে ক্ষমা করেছেন ম্লেচ্ছ মা-র মেয়ে হ'য়ে জন্মানোর অপরাধ সত্ত্বেও?

শাস্ত্রীজি: মা, সংসারে আমি অনেক দেখে অনেক ঘুরে অনেক ভুগে এই একটি মস্ত সত্যের দেখা পেয়েছি যে, আমাদের সব সমস্যারই সূক্ষ্ম বিরোধে আর সমাধান সমন্বয়ে। কিন্তু এ-সমাধান হাতের পাঁচ নয়, অনেক চেষ্টা করে তবে এর সন্ধান মেলে। আর সে-সব আপ্রাণ চেষ্টারই মূলে আছে হয় ক্ষমা না হয় তার তরল রূপ তিতিক্ষা বা সহিষ্ণুতা। তুমি নিবেদিতার নামে উজিয়ে ওঠো কিন্তু এ-সত্যটির দেখা পেতে তাঁকেও বেগ পেতে হয়েছিল। অনেকবারই তিনি চেয়েছিলেন স্বামীজীকে ছেড়ে যেতে। পারেন নি কারণ তাঁর ভক্তি তাঁকে দিয়েছিল সইবার শক্তি। দেখ না কেন, প্রতিপদেই বাপ মাকে সন্তানের কত অত্যাচার উপদ্রব সইতে হয়, পদে পদেই যেন নতুন ক'রে বুঝতে হয় একটি সনাতন সত্য যে, মানুষ জন্মেছে হানাহানি দলাদলি করতে নয়—বোঝাপড়া গলাগলি করতেই। এ হার্মনির দাম ক্ষমা বা সওয়া। যে বলে: আমার কাছে যাই দূষ্য মনে হয় তাকে আমি বিষচক্ষে দেখে তার থেকে তফাতে থাকব সে জানে না যে প্রতিপদে বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণাকে গলিয়ে প্রীতির ছাঁচে ঢালাই করতেই বিধাতা আমাদের মনটিকে গড়েছিলেন। এ-ঢালাই করা যদি সম্ভব না হ'ত তাহ'লে মানুষ বর্বরতার বীভৎসতার গুহা থেকে উঠতে পারত না সভ্যতার সৌন্দর্যের শিখরে। তুমি মা দর্শন পড়েছ নানা দার্শনিকের। তাঁদের মধ্যেও দেখতে পাবে নানা অসহিষ্ণুতা। তাই আরো আজো মানুষ মেনেও মানতে পারে না এই চিরন্তন সত্যকে যে, সব দ্বেষাদ্বেষির চাবিকাঠিই যার হাতে তার নাম সামঞ্জস্য, সুষমা। কবি ড্রাইডেন ভুল বলেন নি যখন তিনি সঘনে ঘোষণা করেছিলেন।

From harmony from heavenly harmony,
This universal frame began
From harmony to harmony
Through all the compass of the notes it ran
The diapason closing full in man.

রাষ্ট্রে বাণিজ্যে ডিপ্লোমাসিতে এমন কি যুদ্ধেও পদে পদে মানুষকে অনেক কিছু সইতে হয় শেষে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে—বলতে : ব্যস ভাই, তুম ভি মিলিটারি হম ভি মিলিটারি, না এসব দৃষ্টান্ত অবান্তর নয়। আমার বলবার উদ্দেশ্য—যা আমার কাছে অন্যায় বা গর্হিত মনে হবে তার ছায়াও মাড়াব না এ-প্রতিজ্ঞা জ্ঞানীর নয়—গোঁয়ারের। তোমার শাশুড়ীকে তুমি বিচার করছ শুধু দূর থেকে তাঁর শুচিবাই দেখে। কিন্তু তিনি মহীয়সী না হ'লেও পাপীয়সী নন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'লে দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে শুধু দোষই নেই গুণও আছে। তিনি রাগী হ'লেও স্নেহময়ী, অসহিষ্ণু হ'লেও সুগৃহিণী, পতিব্রতা না হ'লেও পতিবিমুখ নন, আচারী হ'লেও দুরাচার নন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মোলাকাৎ না হ'লে কেমন ক'রে চিনবে তাঁর স্বরূপ—আর না চিনলে কেমন ক'রে প্রীতির স্নেহের সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠবে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি যদি একটু সহিষ্ণু হও তবে তাঁর অসহিষ্ণুতার উগ্রতা ক্রমশ নরম হ'য়ে আসবেই আসবে। এ আমার কথার কথা নয়—অভিজ্ঞতার এজাহার। তাই আমি চাই তুমি শ্রীমন্তর সঙ্গে গিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে বলো : "মা আপনাদের দেশের অনেক কিছুই আমি জানি না, সেই জন্যেই জানতে বেগ পাই। আমাকে আপনি গ'ড়ে নিন, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব আপনার মনের মতন হ'তে।" দেখবে এই বিনতির সুর ধরলে তাঁর মনেও একদিনে না হোক নিকট পরিচয়ে ক্রমশ বাধারা স'রে যাবে একের পর এক। তবে শেষে তোমাকে কথা দিচ্ছি যদি আমার এ-ভবিষ্যদ্বাণী সত্য না হয়—মানে, যদি নির্মলা বৌদি না ভালোবেসে শাসাতেই চান তবে তুমি ফিরে এসো আমার কাছে।

প্রতিমা জলভরা চোখে শাস্ত্রীজির বুকে মাথা রেখে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। পরে মুখ তুলে চোখ মুছে বলল : "বাবা, তোমার অশান্ত মেয়েটি কেমন দুরন্ত জানো তো হাড়ে হাড়েই। কিন্তু একথাও তুমি জানো তোমাকে আমি কোথায় বসিয়েছি। তোমায় সব উপদেশই আমার কাছে বেদবাক্য

মনে হয় এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে, কিন্তু একথা নির্জলা সত্য যে যেখানে তোমার রায়ে আমি সাড়া দিতে না পারি সেখানে সে-অক্ষমতার জন্যে আমি তোমার জ্ঞানকে দায়িক করি না, করি আমার অজ্ঞানকেই আমার মধ্যে ভালো যদি কিছু থাকে ফুটে উঠেছে প্রথম তোমার আদরে, তারপর মা-র স্নেহে আর নিবেদিতার দৃষ্টান্তে। সত্যি বলছি তোমায়, তাঁর একটি কথায় আমার প্রতি রক্তবিন্দু সাড়া দিয়েছে যে the end of every thing is bhakti. আমি তোমার কথা শিরোধার্য করছি—আমি যাব কলকাতায়, চেষ্টা করব সইতে বুঝতে জানতে—কেবল তুমি আমাকে ভুল বুঝো না যদি না পেয়ে ফিরে আসি। কারণ আমি যাই হই না কেন নিবেদিতা নই একথা আমি জানি জানি জানি।

শাস্ত্রীজি মেয়েকে বুকে টেনে তার শিরশ্চুম্বন ক'রে বললেন: "এইই তো নিবেদিতার শিষ্যার মতন কথা।"

প্রতিমা: তোমার নয়?

শাস্ত্রীজি: আমারো বলতে পারো, তবে তুমি নিবেদিতার দীক্ষা না পেলে আমি তোমার সাধনার সহায় হ'তে পারতাম না এও আমি জানি জানি জানি। একজন ভলটেয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছিল মন্ত্র প'রে ভেড়া মারা যায় কি না। তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "যায়, কেবল ঐ সঙ্গে একটু আর্সেনিক থাকা চাই।"

তিনজনেই হেসে উঠল। হাসির রেশ মিলিয়ে গেলে শাস্ত্রীজি বললেন: "আমার বন্ধুটির কাছে এক্ষণি যেতে হবে মা—দেরি হয়ে গেছে।"

প্রতিমা: ফিরবে কখন?

শাস্ত্রীজি: তা বলতে পারি না। কারণ অপারেশন শেষ হ'তে সময় লাগবে—যতক্ষণ না শেষ হয় আমাকে থাকতেই হবে। কিন্তু আমি বলি কি—তোমরা আজই টেলিফোন ক'রে বিমানঘাঁটিতে দুটো সীট রিজার্ভ করো।

প্রতিমা: এক্ষণি?

শাস্ত্রীজি (হেসে): না, কলকাতায় তো ঠিক অপারেশন নয়, এক্সপেকটেশন—তাই দুদিন বাদেও রওনা হ'তে পারো। কেবল (শ্রীমন্তকে) প্রসাদকে টেলিফোনে জানিয়ে দিও যে, তুমি হাসিমুখেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছ।

প্রতিমা (হেসে): আর আমি পরের মেয়ে ঘর ছেড়ে ছুটছি

আলেয়ার পিছনে মহাজ্ঞানী পিতৃদেবের চোখা চোখা যুক্তিবাণে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে।

ত্রয়ীর কলহাস্য।

শাস্ত্রীজি (হাসি থামলে): তোমার সঙ্গে মা একটু কথা আছে··· একান্তে···

শ্রীমন্ত উঠতেই প্রতিমা তাকে "বোসো" ব'লে শাস্ত্রীজির দিকে চেয়ে বলল: "একান্তে কেন বাবা? তুমি যা বলতে চাও আমি জানি।"

শাস্ত্রীজি: জানো?

প্রতিমা: হ্যাঁ বাবা। আমি শার্লক হোম্‌স-এর কাছে দীক্ষা নিয়েছি। ঘরে এসেই তুমি চেয়ে দেখেছিলে—ঘরে একটি খাট। কাজেই ধ'রে নিয়েছিলে আমার খাটটি পাশের ঘরে। এতদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই কায়েম ছিল।

শাস্ত্রীজি: ধরেছ ঠিকই মা। কিন্তু আমি এখনো ধরতে পারি নি। ব্যবস্থাটা কবে বদলালো বলবে?

প্রতিমা: এখনো বদলায় নি, তবে বদলাবার মুখে। আমি এইমাত্র ওকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলাম স্বামীজির কথা যে প্রেমসঙ্গীতে যে সাড়া না দেয় সে অর্বাচীন। তাঁর এই একটি কথায় আমি চমকে উঠেছি। তবে এখনো মন স্থির করি নি। তাই ভাবছিলাম আর কিছুদিন যাক। দেখি নিজেকে আরো একটু পরীক্ষা ক'রে।

শাস্ত্রীজি: না মা। তবে শ্রীমন্তের সামনেই বলি যখন অভয় দিয়েছ। আমার মনে হয়, কলকাতায় গিয়ে যদি তোমরা দুচারদিনও আলাদা ঘরে থাকো তাহ'লে নির্মলা বৌদি সইতে পারবেন না, এ-কেতাকে শুধু ম্লেচ্ছ না, উদ্ভট নাম দেবেনই দেবেন। মনে রেখো তিনি যাই করুন যাই বলুন না কেন তিনি শাশুড়ী হ'লেও সব আগে মা—শ্রীমন্তের মা। তাই কান্নাকাটি ও সংস্কারকে দাবিয়ে ছেলের মুখ চেয়ে তোমাকে বধূবরণ করতে চেয়েছেন। এজন্যে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা না ক'রে পারি না। কারণ যেখানে মানুষ তার অহঙ্কার অভিমানকে জয় করে সেখানেই শ্রদ্ধার বরণমালা তার প্রাপ্য। এখানে তুমি যদি তোমার এ ও তা নানা ধারণাকেই অভ্রান্ত উপাধি দিতে চাও তবে তুমিই হার মানবে তিনি জিৎবেন।

প্রতিমা (একটু চুপ ক'রে থেকে): সব মানি বাবা! কেবল···

থেকে থেকে মনে প্রশ্ন ওঠে—ঠেকাতে পারি না—যে···মানে, কোনো ব্রত একবার নিলে···

শাস্ত্রীজি (হেসে): এ ঠিক ব্রত নয় মা। যেমন গাছেও থাকব, তলায়ও কুড়োব এ-বুদ্ধি সুবুদ্ধি নয়। হয় ব্রহ্মচারিণী হয়ে কোনো বনে বা মঠে আশ্রয় নাও, নয় সংসারে আস্তানা পেতে তার দায়িত্ব বহন করো। মনে রেখো, নিবেদিতা গুরুবরণ করার পরে বিবাহ করেন নি। তুমি স্বেচ্ছায় ভালোবেসে বিবাহ করেছ। নির্মলা বৌদি এর পরে যদি দেখেন তোমরা পরস্পরকে শুধু দূরে ঠেলছ নয় স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধকে অস্বীকার ক'রে চলতে চাইছ তবে তিনি বিষম ঘা খাবেন। শ্রীমন্তকে যখন ভালোবেসে বিবাহ করেছ তখন তাকে এমন আঘাত দেবে কোন্ মুখে যে-আঘাত সওয়া কোনো স্বামীর পক্ষেই সহজ নয়? কিছু মনে কোরো না মা, ওর শয্যাসঙ্গিনী হতে যদি না পারো তাহ'লে শয্যা আলাদা কোরো না। আমাদের তন্ত্রে অসিধারব্রতের ব্যবস্থা আছে জানো হয়ত?

প্রতিমা (উৎসুক): না বাবা। বলো না কী ব্রত।

শাস্ত্রীজি: আজ সময় নেই—চাও যদি পরে বলব ফলিয়ে। বড় শক্ত সে-ব্রত—এক শয্যায় শুয়েও পরস্পরকে দূরে ঠেলা—যেন দুজনার মাঝে একটি তরোয়াল আছে। কিন্তু এ-ব্রতের ব্যবস্থা থাকলেও এ-বিধান মেনে কোনো জীব শিবত্ব লাভ করেছেন ব'লে জানি না। হয় কি জানো মা? তন্ত্রকার বা শাস্ত্রীরা নানা থিওরি মেনে এক একটা কল্পনার ছবি আঁকেন। তাদের মধ্যে কোনো ছবি হয়ত জীবন্ত হ'য়ে ওঠে—মানে সাধক দিব্যজীবন লাভ করে—কিন্তু অধিকাংশ ছবিই থেকে যায় ছবি—যেমন আগুনের ছবিতে রঙের সমৃদ্ধি থাকলেও তাপের প্রদীপ্তি থাকে না। আর থাকে না ব'লেই যোগী যোগভ্রষ্ট হয় যাকে সান্ত্বনা দিতে কৃষ্ণ বলেছেন সে আবার জন্মায় পূর্বজন্মের ছেদের পরেও যা পেয়েছিল তারই জের টেনে অসমাপ্ত সাধনাকে সমাপ্ত ক'রে সিদ্ধিলাভ করতে। কিন্তু এ-ধরণের আলোচনা আমাকে ঠিক মানায় না। কেবল যাঁরা সাধনার সমুদ্রে ডুব সাঁতার কেটেছেন তাঁরাই বলতে পারেন কতক্ষণ অবধি দমবন্ধ ক'রে থাকলে সমাধি লাভ হয়। (কবজি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) কিন্তু আজ আর সময় নেই মা। তুমি লণ্ডনে ফিরে এলে যদি চাও তো বলব যা জানি—অনধিকার চর্চা না ক'রে।

(প্রতিমার শিরশ্চুম্বন ক'রে প্রস্থান)

॥ ছয় ॥

প্রতিমা (খানিকক্ষণ মুখ নিচু ক'রে থেকে) : কী বলো ?

শ্রীমন্ত (ভেবে) : আমার মনে হয় আমাদের এখন লণ্ডনে ফিরে গিয়ে তোমার মার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। কারণ এ তো শুধু পুঁথিপাঠের ব্যাপার নয় যে, নজিরকে তলব করলেই মুস্কিলাশান হবে। এ হ'ল হাতে-কলমের ব্যাপার—শুধু দাম্পত্য সমস্যার সমাধান নয়, সেই সঙ্গে চাই সাংসারিক অভিজ্ঞতা তথা বিচক্ষণতার শুভবুদ্ধি। এখানে—বাবা ঠিকই বলতেন—মেয়েদের রায়ই প্রামাণ্য, কেন না তারা সংসারের অন্ধি সন্ধির খবর রাখে। আমরা—পুরুষেরা—বড় জোর বৈষয়িকতার কয়েকটি নীতির বা বিধানের ভাষ্য দিতে পারি। বিষয়কে ধারণ করে মেয়েরাই।

ক্রিং…ক্রিং…ক্রিং…

শ্রীমন্ত (টেলিফোনে) : কে ?

শাস্ত্রীজির স্বর (টেলিফোনে) : আমি। আমার এখন এখানে অন্তত দুদিন থাকতে হবে। তাই তোমরা সোজা লণ্ডনে গিয়ে মার্থার সঙ্গে আলোচনা করো কিং কর্তব্যম্।

শ্রীমন্ত : রোগীর অবস্থা কি খারাপ হয়েছে ?

শাস্ত্রীজি : কিছুটা বৈ কি। ক্যানসারের গোলকধাঁধায় পথ খুঁজে পাওয়া শক্ত—রকমারি চোরা গলি। তবে ডাক্তার ভালো, এসেছেন সম্প্রতি ভিয়েনা থেকে ক্যান্সার সম্বন্ধে অনেক কিছু নতুন তথ্য আহরণ ক'রে। কিন্তু তিনি সক্ষম হোন বা অক্ষম হোন, রোগী আমার প্রিয়। তাই তার দুর্লগ্নে আমি তার কাছে থাকতে চাই আরো দুএকদিন।

॥ সাত ॥

লণ্ডনে মার্থা সব কথা শুনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল : "হয়েছে কি জানো ? (শ্রীমন্তকে) তোমার মা-কে আমি দুএকবার মাত্র দেখেছিলাম, কথাবার্তা হয় নি। আমার তাঁকে সুগৃহিনী মনে হয়েছিল বৈ কি। গৃহস্থালির সব ব্যবস্থায়ই যে তিনি নিপুণ, চাক্ষুষ করেছিলাম—শুধু আমার চোখে-দেখার

এক্ষাহার নয়, অন্য অনেকের মুখেও শুনেছিলাম। কী বলে যেন? গি—গি—হ্যাঁ, গিন্নি। সবাই বলত এমন গিন্নি কালেভদ্রে দেখা যায়। কিন্তু চমৎকার গিন্নি হ'লেই যে চমৎকার মা বা স্ত্রী হওয়া যায় একথা আমি কোনো দিনই বিশ্বাস করি নি—আজ তো করিই না তাঁর কান্নাকাটির তোলপাড়ের পরে। তোমার ও প্রতিমার বিবাহে তিনি নিখুঁৎ শান্তিপাঠ করতে পারতেন যদি নিজের মতের গরম চাল ছেড়ে একটু নরম হ'য়ে চোখ চেয়ে দেখতেন যে, তুমি যাকে বিয়ে করেছ সে গড়পড়তা মেয়ে নয়—সুশীলা সুভদ্রা সুরূপা। এখন তিনি বাধ্য হ'য়ে মত দিয়েছেন, কিন্তু এজন্যে তাঁর মনে একটা ক্ষোভ থাকবেই। (প্রতিমাকে) এখানে একটা কথা বলা দরকার মা। তিনি অবুঝ বলেই তোমাকে অনেক কিছু সইতে হবে যা…যা সওয়া সহজ নয়, বিশেষ তোমার মতন স্বপ্নশীলা মেয়ের পক্ষে।

প্রতিমা (রাগ ক'রে): যা—ও! আমি স্বপ্নশীলা? (হেসে) তবে যখন এত বড় ভুল তুমি করতে পারলে তখন শ্রীমন্তর মাকেও হয়ত ভুল দেখেছ। মানে হয়ত তিনি অন্দরে সুভদ্রা যদিও বাইরে অভদ্রা।

শ্রীমন্ত: অভদ্রা ঠিক নন—তবে—

প্রতিমা: তবে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তিও নন—এই তো?

মার্থা: তোমাদের কথাকাটাকাটি মুলতুবি থাক এখন। কারণ এখন সমস্যাটি দুরন্ত: তোমরা ওদেশে গিয়ে এখন গিন্নির নানা বিধানে সায় দিতে পারবে কি না। (প্রতিমাকে) মনে রেখো, তোমাকে তিনি আজ বাধ্য হয়ে বধূবরণ করলেও তাঁর মনে একটি খেদ কাঁটা হ'য়ে খচ খচ করবেই করবে, যে, তুমি রূপে গুণে চমৎকার হ'লেও অস্থিমজ্জায় ম্লেচ্ছ।

শ্রীমন্ত (সদুঃখে): ম্লেচ্ছ কেন বলছেন?

মার্থা: কারণ ঐখানেই তাঁর শুচিবেয়ে সংস্কার সব চেয়ে ঘা খাবে। ধরো, যদি প্রতিমা ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে বি এ পাশ ক'রে বিলেত যেত তাহ'লেও তিনি তার বিদেশী তথমাকে মান দিতে পারতেন—তাকে বিদুষী নাম দিয়ে। (প্রতিমাকে) কিন্তু মা, আমি মেয়ে তো, তাই জানি হাড়ে হাড়ে—নানা মেয়েলি সংস্কার কাটিয়ে ওঠা কত কঠিন—বিশেষ ক'রে যেখানে কুল বা বংশের প্রশ্ন ওঠে।

প্রতিমা (অতিষ্ঠ হ'য়ে): মা, এসব ভণিতা ছেড়ে বলো তোমার মনের কথা: শ্রীমন্তের সঙ্গে আমার যাওয়া তুমি চাও, না চাও না? সব

সমস্যারই দুটো দিক থাকে—একটা ভালো, অন্যটা মন্দ। কিন্তু কেবল ঢেউ গুনে গুনে নদী পার হওয়া যায় না—ঝাঁপ দেওয়া চাই—এমন কি ডুববার ভয় থাকলেও।

মার্থা: ঠিক কথা। কেবল ঐ সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে—সাঁতার জানা চাই। কারণ নদীর নানা বেঁকে নানা ঘূর্ণী যেন লাফিয়ে এসে ঘিরে ধরে। তোমার ক্ষেত্রে এ-সাঁতার জানার অনুবাদ: পয়লা নম্বর সহিষ্ণুতা, দোসরা—যে বাদ সাধছে তার দৃষ্টিভঙ্গির খবর নেওয়া, তেসরা—এইটুকু জেনে নেওয়া যে, বিবাহ ক'রে যখন নতুন সংসার পাততে হয় তখন সেখানে কী ভাবে চললে চলার পথে দুস্তর বাধাকে পাশ কাটানো যায়। (প্রতিমাকে) মা, এ তীরন্দাজি করছি আমি তোমাকে নিশানা ক'রে নয়—আমি ভুক্তভোগী, নিজের নানা ভুল ভ্রান্তি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি ব'লে। তবে তোমার একথা ঠিক যে, কূলে ব'সে ঢেউ গুনলে নদীপার হওয়া যায় না। যেমন ধুলো কাদার ভয় করলে পথ চলা যায না। তাই এখানে তোমার বাবার সঙ্গে আমি একমত যে, পথ দুর্গম ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকা চলে না। এককথায়, উপস্থিত তোমাদের যাওয়া চাই। কে জানে হয়ত তোমাদের কাছে পেলে তাঁর মনের অনেক অমূলক ভয় কাটতেও পারে। বলতে কি, ভয় কাটে খতিয়ে প্রেমে স্নেহে ও সদাচারে। (শ্রীমন্তকে) তুমি মাতৃভক্ত—খুব ভালো কথা। (প্রতিমাকে) তুমি ঠিক পতিব্রতা না হ'লেও শ্রীমন্তর মনের মতন হ'তে চাও এবিষয়ে আমার সংশয় নেই, থাকলে এ-বিবাহে আমি মত দিতাম না কখনই। কারণ আমি ম্লেচ্ছ হ'লেও ভারতবর্ষের একটি আদর্শে বিশ্বাস করি ষোলো আনা: যে, সেই মেয়েই সুলক্ষণা যে অভয়া, সুশীলা, শিক্ষিতা, সহিষ্ণু...

প্রতিমা: ও মা গো! অর্থাৎ শুধু দেবী ছাড়া আর কেউ তোমার মনের ম'ত নয়? এই তো?

মার্থা: ছি ছি মা! যে নিজে জানে সে কতশত খুঁৎ-এ ভরা সে কোন্ মুখে মেয়েকে হুকুম করবে দেবী হ'য়ে তবে সংসারে নামতে? তোমার বাবাকে যখন আমি নানা বাধা প্রতিবাদ ডিঙিয়ে বিবাহ করি তখন মনে করো কি আমার মনে দ্বিধা সংকোচ আসে নি? কতবারই মনে হয়েছে অচিন স্বামীর ডাকে যে-অজানা পথে পা দিয়েছি সে-পথ যদি বিপথ হয় তবে ফিরব কার কাছে কোন্ মুখে? মা, প্রেমের আদর্শকে আমি বরণ করেছিলাম

একথাও যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি আমার নানা কুণ্ঠা সাবধানা মনোবৃত্তি যারা কেবলই ভয় দেখাত, বলত সামাল, সামাল! যখন দেবিয়ানার প্রসঙ্গ তুললে তখন বলি শোনো একবার কী ভাবে পেছিয়ে গিয়েছিলাম এগুবার ভঙ্গি ক'রে। (থেমে) হ'ল কি, তোমার বাবা যখন আমার হাতে বাগ্দানের আংটি পরিয়ে দিলেন তখন বুকের মধ্যে হঠাৎ বিষম কাঁপন সুরু হ'ল। সবাইকে বললাম বটে যে, আমি অভিসারে চলেছি প্রেমেরি ডাকে, কিন্তু আংটিটা লুকিয়ে ফেলতাম তাদের কাছে যাদের আমি গণ্য করতাম আপন জন ব'লে। শেষে একবার ওঁকে ব'লে ফেললাম যে, আমি একটু সময় চাই ভেবে দেখবার। উনি বললেন: "এর নাম কি প্রেমের অভিসার যার বড়াই ক'রে এসেছ এর ওর তার কাছে?" আমার মনে হ'ল কে যেন আমাকে চাবুক মারল। আসল কথা ওঁকে বলি নি, বললাম প্রথম সেদিন যে, অনেক চেষ্টা ক'রেও মনের এক কোণায় কী এক অভিমান আছে যে, আমি ইংরাজবালা যার বর্ণ শাদা। প্রেমের ডাকে যে-মার্থা সাড়া দিয়েছিল সে-মার্থা তখন গায়েব হ'য়ে গেছে—আর তার মনে রাজত্ব করছে এক সুপীরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স: আমরা বিজেতা বৃটন ওরা বিজিত হিন্দু, আমার আত্মীয়রা কেউই আমাদের বিবাহকে নেকনজরে দেখবেন না—বিশেষ ক'রে আমার এক কাকা যিনি আমাকে গভীর স্নেহ করতেন। তারপর একে একে এই দুর্বলতার রন্ধ্র দিয়ে এত শত যুক্তি উড়ে এসে জুড়ে বসল যে, আমার মনে হ'ল প্রেমের আলো একেবারে নিভে গেছে। আমি ঠিক করলাম পরদিনই আংটি ফেরৎ দেব। কিন্তু করবামাত্র মনে পড়ল আমার স্বামীর মুখে আবৃত্ত একটি অপরূপ উপনিষদের শ্লোক যেটি আমার শুধু কণ্ঠস্থ নয় প্রাণের অন্দরমহলে আসন পেতেছিল। সে-শ্লোকটি একটি প্রার্থনা: যিনি এক অবর্ণ হ'য়েও সব বর্ণের বিধায়ক তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন—"স নো বুদ্ধ্যা শুভয় সংযুনক্তু।" সংস্কৃতিকে দেবভাষা বলা হয় কেন সেদিন যেমন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম তেমন ভাবে বোধহয় আর কোনোদিন উপলব্ধি করি নি: আমার মনের প্রতি তন্ত্র প্রাণের প্রতি তার বেজে উঠল: "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু!" কী সুন্দর, নিটোল! মানুষের অন্তরের একটি আদিম প্রার্থনা। সংস্কৃত আমি ভালো জানি না মা, উচ্চারণও ঠিকমত করতে পারি নি, গৌরবিণী বৃটনবালার জিভে আড় আছে—আমাদের হিন্দুরা ম্লেচ্ছ বলে কি সাধে? কিন্তু তবু আমার অন্তরাত্মা যেন ঝঙ্কার দিয়ে আমাকে তিরস্কার-

করল: "গুমরই যত নষ্টের মূল, বিনতিই জ্ঞানের ভিত্তি। তাই নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা করো: আমি দুর্বল আমাকে বল দাও, আমি দেখতে শিখি নি, আমাকে দেখাও, আমি জানি না আমাকে জানাও।" অমনি সব বাধা কেটে গেল, আমি ছুটে গিয়ে ওকে সব ব'লে নতজানু হ'য়ে ক্ষমা চাইলাম—দুদিন বাদে আমাদের বিবাহ হ'য়ে গেল হিন্দুমতে, বেদমন্ত্রের সঙ্গতে।

প্রতিমা জলভরা চোখে মা-কে জড়িয়ে ধরে, বলে: "আমাকে ক্ষমা করো মা, আমি মনে মনে তোমাকে বিচার করেছিলাম অবুঝ ব'লে।"

মার্থা (প্রতিমার মুখ তুলে চুম্বন ক'রে): অবিচার করো নি মা। আমরা কতটুকু বুঝি বলো? যেটুকু দেখি শুনি হাতে পাই তারি অভিমানে এই লক্ষকোটি তারার বিশাল নাচদুয়ারের আনন্দঝঙ্কারের খবর চাই। শুধু তাই নয়, মানুষকেই বা আমরা কতটুকু জানি বলো—প্রায়ই বলেন উনি। দুচারজন বন্ধু বান্ধবী আত্মীয় আত্মীয়া প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীর সঙ্গে লেনদেনে যে-তথ্যের খবর পাই তারি ভিৎ-এ গ'ড়ে তুলি আমাদের নানা আন্দাজ, ধারণা, গবেষণার তাসের বাড়ি। এও আমার কথা নয়—ওঁর কথা। ওঁর কাছে কত যে শিখেছি কী বলব মা? কিন্তু সবচেয়ে বড় শিক্ষা কী পেয়েছি জানো? নম্রতা—মানতে পারা যে, আমরা কেউই প্রাজ্ঞ নই বড়জোর একটুখানি বিজ্ঞতার হদিশ পেয়েছি, কিন্তু তার অভিমানে ধরাকে সরা জ্ঞান করি, কিন্তু দেখ, কী প্রসঙ্গে কী কথা এসে গেল—উনি বলেন প্রায়ই হেসে একটি ঘরোয়া বাংলা প্রবচন: ধান ভানতে শিবের গীত! তাই থাক এসব বিজ্ঞতার বিড়ম্বনা। আমার মনে হয় তোমাদের কলকাতায় যাওয়া দরকার। কেবল চোখ কান খুলে রেখো—আর সবদা মনে রেখো—যেকথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই বলতেন—যে সয় সেই রয়।

॥ আট ॥

পরদিন শাস্ত্রীজি ফিরে এসে সব শুনে প্রতিমাকে বললেন: "তুমি যে অভিমানকে অশুভ ব'লে চিনে শুভবুদ্ধির কাছেই হাত পেতেছ মা, এতে আমি সত্যি গৌরব বোধ করছি আরো এইজন্যে যে, তোমার সামনে এবার পরপর বা যুগপৎ অনেকগুলি পরীক্ষা আসবে—যাদের যোগফল হয়ত তোমার কাছে

অসহ মনে হ'তে পারে। তাই আগে থেকে ব'লে রাখি যে, সত্যি যদি কলকাতায় থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব মনে হয়, তবে তুমি ফিরে এসো মা, আর যেই তোমাকে ভুল বুঝুক না আমরা ভুল বুঝব না, নিশ্চয় জেনো।"

প্রতিমা (গাঢ় কণ্ঠে): জানি বাবা। আর এও জানি—বিশ্বাস কোরো—যে তুমি আমাকে যতটা বুঝবে আমি কিছুতেই ততটা বুঝতে পারব না। কারণ আমি হাড়ে হাড়ে জানি আমার বুদ্ধি থাকলেও ধৈর্য নেই, আর যার ধৈর্য নেই তার দৃষ্টি ঝাপসা না হ'য়েই পারে না। কেবল একটা অনুরোধ তোমায় করব: যদি কখনো তোমাকে ডাকি তুমি এসো—আমাকে শুধু পথ দেখাতে নয় তোমার ছোঁয়াচে আমার মধ্যে ধৈর্য জাগাতে, দেখতে শেখাতে। সত্যি বাবা, আমি অনেক কিছু না জানলেও এটুকু জানি জানি জানি যে আমার মধ্যে নানা কাঁটা থাকলেও পদে পদে ফুলের দেখা পাই তার বীজ তুমিই বুনেছ ব'লে—তুমি আর মা। আশীর্বাদ করো বাবা যে···

শাস্ত্রীজি (প্রতিমাকে জড়িয়ে ধ'রে): আশীর্বাদ করব কি মা? তুমিই যে এসেছ আমার কাছে বিধাতার আশীর্বাদ হ'য়ে।

॥ নয় ॥

দমদমে বিমানঘাঁটিতে পৌঁছিতেই সব আগে শ্রীমন্তের চোখে পড়ল মা-কে। কিন্তু এ কী? মা রোগা হ'য়ে গেছেন, রাতারাতি বুড়িয়ে গেছেন। বিমান ঘাঁটিতে মা আসবেন ও আদৌ ভাবে নি। গড় হ'য়ে প্রণাম করতেই তিনি ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন। বললেন: "যা হোক বাবা, ঠাকুরের কৃপায় যে তুই ভালোয় ভালোয় ফিরেছিস .."

প্রসাদ এগিয়ে এসে শ্রীমন্তকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন: "তোর রূপের খোলতাই হয়েছে বাবা। মা-টি আমার তোর তদারক ঠিকই করেছেন। আয়ুষ্মতী ভব।"

প্রতিমা কুণ্ঠিত হ'য়ে পিছিয়ে ছিল, এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল। শ্রীমন্ত মা-কে দেখিয়ে বলল: "মা।" প্রতিমা গম্ভীর মুখে তাঁকে নমস্কার করল। শ্রীমন্ত বলল: "মা-কে প্রণাম করবে না?"

প্রতিমা: উনি কি আমার প্রণাম চান? আমার দিকে তো একবার ফিরেও তাকালেন না।

প্রসাদ (ওকালতির সুরে) : তোমাকে তো চেনেন না উনি...

প্রতিমা : আমাদের ফটো পাঠিয়েছিলাম, তার উপর তোমার হাত ধ'রে নেমেছি, সনাক্ত করবার অসুবিধে হবার কথা নয়।

শ্রীমন্ত ফরাসী ভাষায় প্রতিমাকে অনুরোধ জানালো। প্রতিমা গুম হয়ে কোনোমতে নির্মলার পায়ে হাত ঠেকিয়ে পিছিয়ে দাঁড়ালো।

প্রসাদ (মুখে হাসি টেনে) : উনি তো বিদেশী কেতা জানেন না মা— তুমি সুবুদ্ধি মেয়ে। এদেশে যখন এসেছ তখন এদেশের কেতা মানতে হবে আগে তোমাকেই। সব ঠিক হয়ে যাবে তোমার মন ঠিক হ'লে। তোমার নানা গুণের কথা কত যে শুনেছি···

পাশে দুজন সাহেব স'রে গেল। একজন ফিশ ফিশ ক'রে বলল : "এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।" শ্রীমন্ত বলল রুখে উঠে : "আপনারা বোধহয় এ্যাংলো আমেরিকান।" তারা চমকে ক্ষমা চেয়ে চম্পট দিল প্রতিমা খুশী হয়ে বলল : "অস্তরটিপুনিটা জুৎসৈ হয়েছে, ধন্যবাদ শ্রীমন্ত।"

এই প্রথম ওর মুখে হাসি ফুটল। প্রসাদ আশ্বস্ত হয়ে নির্মলাকে বলল : "বোমাকে বরণ করলে না ?"

নির্মলা : বিমান ঘাঁটিতে ?

প্রসাদ (অপ্রস্তুত) : তা বটে। কিন্তু ঘরে সব ঠিক আছে তো—মালা তিলক ধূপ দীপ ঘণ্টা. .

নির্মলা : মিথ্যে সংসার নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। চলো শ্লোক আউড়ে যা পারো।

প্রসাদ : না, শ্লোক না। (প্রতিমাকে) আমি ঠিক সংসারী নই মা, তোমার বাবার কাছে হয়ত শুনেছ। আমি কিছুটা পণ্ডিত, কিছুটা কবি, কিছুটা কর্তা যদিও ভর্তা যাকে বলে তা নই। তোমার অভিনন্দনে আজ সকালেই বেঁধেছি একটি কবিতা—এখানে এখন কেউ নেই শোনো—তুমি তো বাংলা জানো ?

প্রতিমা (প্রসন্ন মুখে) : বাংলা আমার পিতৃভাষা। তাছাড়া শ্রীমন্তর সঙ্গে তো আমি বাংলাতেই কথাবার্তা কই। আপনি পড়ুন।

প্রসাদ (হাত তুলে নির্মলাকে নিরস্ত ক'রে) : না, আমি শোনাব —এমন রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী মা ঘর আলো ক'রে এলো···(ব'লেই আবৃত্তি)।

যেম্নি শুনি—নাম প্রতিমা
হৃদয় বলে নয় সে মাটির,
মনে হয় যে মায়া সীমা
গান গায় প্রাণ চিরন্তনীর।
বিদেশিনী তাকে বলে
কে সে মূঢ়—চাউনিতে যার
ভারতকে পাই প্রাণের তলে,
স্বদেশ বিদেশ হয় একাকার।

প্রতিমা (সানন্দে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে): মাপ করবেন; আপনার উচ্ছ্বাসে আমার সব ভয় কেটে গেছে।

প্রসাদ: ভয়? সে কি? আরো কাছে (আবৃত্তির স্বরে)

সমঞ্জসা দেখা দিলে
দ্বন্দ্বের আর থাকে কি ঠাঁই?
তুমি আপন ক'রে নিলে
তোমার মাঝেই দেশকে যে পাই।

নির্মলা: হয়েছে হয়েছে—কাব্যির উচ্ছ্বাস। বেলা হ'ল। চলো, আজ আবার বামুন ঠাকুর না ব'লে ক'য়ে চম্পট দিয়েছেন। বৌমার পেট ভরবে না শুধু কুহু কুহুতে।

॥ দশ ॥

প্রসাদের মস্ত মোটরে পিছনের সীটে নির্মলা উঠে বসতেই প্রতিমা চক্ষের নিমেষে উঠে সামনের সীটে বসল ড্রাইভারের পাশে। নির্মলা চেঁচিয়ে বলল: "ও কি? বৌ মানুষ ড্রাইভারের পাশে! ভিতরে এসো—আমার পাশে।"

প্রতিমা: আমি লণ্ডনে প্রায়ই ড্রাইভারের পাশে বসি।

নির্মলা: সে তোমাদের দেশে হ'তে পারে, এখানে এসো, বোসো আমার পাশে।

প্রতিমা (শান্ত দৃঢ় স্বরে): আমি বেশ আছি।

শ্রীমন্ত (উঠে ওর পাশে ব'সে ফরাসী ভাষায়) : ' কী মান করছ প্রতিমা ? মা-কে একবারও মা ডাকলে না।

প্রতিমা (ফরাসী ভাষায়) : কোকিলকে গুঁতিয়ে কুহু কুহু ডাকানো যায় না। মান করছ তুমিই। বোসো না গিয়ে তোমার মা-র কোলে তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে।

শ্রীমন্ত (নেমে) : বাবা, ওকে বেশি চাপ দিলে সুফল ফলবে না। তুমি বোসো মা-র পাশে—আমি বসছি ওর পাশে।

প্রসাদ (উদ্বিগ্ন) : তুই অন্তত তোর মা-র পাশে বোস।

শ্রীমন্ত (অগত্যা) : আচ্ছা, কিন্তু তুমি বোসো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বসছি মাঝখানে।

প্রসাদের মুখের হাসি উবে গেল, জোর ক'রে শ্রীমন্তকে নির্মলার পাশে বসিয়ে নিজে বসল ওপাশে।

নির্মলা শ্রীমন্তকে কাছে পেয়েই গলা জড়িয়ে ধ'রে শুধু ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কান্না। চুটিয়ে বধূবরণ হ'ল বটে।

॥ এগারো ॥

নির্মলার চোখ কেঁদে কেঁদে আগের দিনই ফুলে উঠেছিল। মোটরে একটানা কান্নায় সে-ফোলা চোখ আরো রাঙা হ'যে উঠল। শ্রীমন্তর মনে হ'ল একটি হাসির প্রবচন : যঃ পলায়তি স জীবতি। কিন্তু পালাবে কোথায় ? জেলখানায় যে বন্দী তার স্বাধীনতার চৌহদ্দি কতটুকু ? জেল-কক্ষের বা প্রাঙ্গণের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। মাকেই বা কী বলবে, প্রতিমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবেই বা কেমন ক'রে ? চুপ ক'রে মোটরে কেবল মা-র পিঠে হাত বুলোয় আর থেকে থেকে বলে : "কাঁদে না মা, সব ঠিক হ'য়ে যাবে, ভেবো না।" কিন্তু মামুলি আশাবাদের সঙ্গে বাস্তবের মিল কতটুকু ? ঠিক হ'য়ে যাবে কী, আর কেমন ক'রে ? প্রাণ নারাজ হ'লে কি মনকে নোয়ানো যায় ? হাজার তুতিয়ে পাতিয়েও কি তেলকে জলের সঙ্গে মিতালি করানো যায় ? মা-ই বা কেমন ক'রে বৌমার সঙ্গে সন্ধি করবেন —কোন্ রাজিনামায় ? মতের সঙ্গে মতের বিরোধ এক। সংস্কারের সঙ্গে

সংস্কারের বিরোধ আর। মতের মূল মনের মাটিতে, সংস্কারের মূল প্রাণের গুহায়। প্রারব্ধ কথাটা মনে প'ড়ে যায় যদিও তার নিহিতার্থ কোনোদিনই ওর কাছে আজকের মত স্পষ্ট হয় নি। হবে কেমন ক'রে? প্রাণের কাঁটাবনে কি মনের ফুলবাগান বসানো যায়? প্রতিমাও তো কতরকম দৃঢ় সংকল্পই করেছিল শাশুড়ীর মনের মতন বৌমা হ'তে চেষ্টা করবে। কিন্তু তাঁর একটি বাঁকা দৃষ্টিতেই সব ভেস্তে গেল এক মুহূর্তে। তিনিই ঠিক করেছিলেন বৌমাকে সাদরে বরণ করবেন। কিন্তু বিমানঘাঁটিতে তার বেশভূষায় ও মাথায় সিঁদুর নেই দেখে এমন ঘা খেলেন যে তাঁর সব শুভ সংকল্পই এক ফুঁয়ে তাসের বাড়ির মতন চুরমার হ'য়ে গেল। শ্রীমন্ত প্রতিমাকে বার বার অনুরোধ করেছিল সীমন্তে সিঁদুর পরতে। কিন্তু প্রতিমার কাছে হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুর এমনই বিসদৃশ মনে হ'ত যে, কোনোদিনই ওর ভালো লাগে নি এদুটি চিহ্ন। মনে হ'ত, যদি এ-দুটি শুভ চিহ্ন হয় তবে বিধবারাই বা কেন বাদ যাবে? ওর ভালো লাগত না শুনে যে সব শুভকর্মে বিধবাদের বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। কেন এমন নিষ্ঠুর ব্যবস্থা? স্ত্রীর কাছে স্বামীর জীবন যত দামী স্বামীর কাছে স্ত্রীর জীবনের দাম কি তার চেয়ে এক তিলও কম? বরং বেশি। শাস্ত্রীজির কাছে ও শুনেছিল মহাভারতে ব্যাসদেব বলেছেন (ঠিকই তো) "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" বিধবারা যদি পবিত্র হ'তে চেয়ে একাদশী করে, তবে সধবারা কেন এ-সস্তা উপবাসে পবিত্র হ'তে চায় না? বরং বলা চলে না কি—বিধবাই বেশি পবিত্র যেহেতু ব্রহ্মচারিণী? আবাল্য নিবেদিতাকে আদর্শ ক'রে ব্রহ্মচর্য বলতে তার কণ্ঠে বেজে উঠত সুর, রক্তে জেগে উঠত দোলা। যতই কেন না বিবাহের স্বপক্ষে যুক্তি জড়ো করুক, এ-ধারণা তার প্রায় সংস্কারের পর্যায়ে এসে পড়েছিল যে বিবাহ সাংসারিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হ'লেও ব্রহ্মচর্যই ভাগবত জীবনের আদিম সোপান।

তাই আরো ওর খারাপ লাগত অত্যধিক গিন্নিপনা। আরো মনে হ'ত —যদিও যুক্তি দিয়ে এ-মতকে খাড়া করতে পারত না—যে, সংসারীরা ভগবানের প্রিয় হ'তে পারে, কিন্তু কেবল ব্রহ্মচারীই ব্রহ্মবিৎ হ'তে পারেন। শাস্ত্রীজির কাছে গীতা ও উপনিষদের পাঠ নিয়ে ওর মন আরো বিমুখ হয়েছিল সংসারিয়ানার প্রতি। তবু ইংলণ্ডের গৃহিণীর সঙ্গে খাঁটি ভারতীয় গিন্নির তফাৎ আছে। বিলিতি মেয়েও অবশ্য গিন্নিপনায় দক্ষ হ'তে পারে কিন্তু ভারতীয় মেয়েদের মতন নিখুঁৎ হ'তে পারে কি? বিলিতি গৃহকর্ত্রীরা চলেন

বেশির ভাগ মত মেনে, ভারতীয় গিন্নিরা সংস্কার মেনে। দুয়েরই স্বপক্ষে বা বিপক্ষে নানা যুক্তি দিয়ে দেখানো যায় এ ভালো বা ও মন্দ, কিন্তু খতিয়ে মানুষ চলে দেশকালপাত্রের প্রভাবে। প্রতিমা স্বতঃসিদ্ধের মতনই ধ'রে নিয়েছিল যে ভারতের পরিবেশে মেয়েদের নিখুঁৎ মাতৃমূর্তি গ'ড়ে উঠতে পারে, কিন্তু কেবল য়ুরোপের পরিবেশেই তাদের সচিব ও সখী রূপের বিকাশ সম্ভব। নিজের মা-র মধ্যে এ-দুটি মূর্তির সমন্বয় দেখে ও মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু বিমানঘাঁটিতে নামতে না নামতে তার মনে হ'ল নির্মলা কারুর সখী বা সচিব নয়, শুধু অবিমিশ্র মা আর ষোলোআনা গিন্নি। এ-ধারণা ওর আবছাভাবে গ'ড়ে উঠেছিল প্রথমেই, নির্মলাকে বিমানঘাঁটিতে দেখতে না দেখতে সে-ধারণা সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠল যেমন পাষাণ থেকে ফুটে ওঠে মানুষের মূর্তি।

সব চেয়ে ও ঘা খেল যখন আরো দু-একটি গিন্নি মা এসে পরস্পরের কাছে ওর রূপ নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। একজন বিজ্ঞ হেসেই বললেন: শ্রীমন্তর জন্যে ওর মা একটি তিলোত্তমাকেই বরণ করেছিলেন। তারা জানত না প্রতিমা বাংলা জানে। প্রতিমা শুনে লাল হ'য়ে উঠল। একজনকে খোলাখুলিই বলল নিখুঁৎ বাংলায়: "বিলিতি মেয়েকে যদি আপনাদের এতই অচ্ছুৎ কন্যা মনে হয় তবে শোভাযাত্রা ক'রে এখানে এসেছেন কেন তাকে বরণ করতে?"

তারা চম্‌কে উঠল। কিন্তু এবার নির্মলা এই প্রথম এগিয়ে এলেন ওর স্বপক্ষে, বললেন: "ও দেখতে কারুর চেয়ে কম সুন্দরী নয়—তার উপর বিদুষী ও গুণবতী। আর জানো কি? আমার ছেলেকে ও অসুখে রাতের পর রাত জেগে সুশ্রূষা করেছে—হাসপাতালে যেতে দেয় নি।" ব'লে এগিয়ে এসে ওর মাথায় সিদুঁরের টিপ দিলেন।

প্রতিমার চোখে জল উপ্‌ছে পড়ল। সে গড় হ'য়ে প্রণাম করল: "আমাকে গ'ড়ে নেবার ভার আপনারই মা, আর কারুর নয়।"

॥ বারো ॥

প্রতিবেশিনীদের মধ্যে একটি সুশ্রী মেয়েকে দেখবামাত্র প্রতিমার খুব ভালো লেগে গেল। নাম যমুনা। বি এ পড়ে ডায়োসিসান কলেজে। বয়স উনিশ, কিন্তু দেখলে মনে হয় পনেরো ষোলো। স্বাস্থ্য ভালো নয়। কিন্তু মনের জোর কম ছিল না ব'লে জ্বর গায়ে পরীক্ষা দিয়েও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'য়ে সুনাম কিনেছিল। বাপ কাঠের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে একটি মডার্ণ সুন্দর বাগানওয়ালা বাড়িতে থাকেন। প্রসাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু নন—প্রতিবেশী। নাম রতন ভট্টাচার্য। বিপত্নীক। কিন্তু আবার বিবাহ করতে চাইলেও মনের মতন পাত্রী জোটে নি। স্বভাবে কৃপণ তাই আরো পান নি যা চেয়েছিলেন সব আগে—অর্থাৎ ধনিকন্যা। "দোজবর তথা মাতালকে শ্বশুর জামাই করবেনই বা কী দুঃখে?" বলতেন নির্মলা কটাক্ষ ক'রে। প্রতিমা পরচর্চা ভালোবাসত না তাই শাশুড়ীর ব্যঙ্গবিদ্রূপের দোয়ার দিতে এগুত না—আরো এই জন্যে যে, যমুনার প্রতি তার মায়া পড়েছিল। প্রতিমা তাকে শেখাত আসন। বলত দেহকে পটু না করলে জীবনের অনেক কিছুই বাদ দিতে হয় যা বাদ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যমুনা প্রতিমার কাছে ফরাসী ভাষা শিখত। পড়াশুনোয় তার উৎসাহ ছিল। তবে মাঝে মাঝেই অসুখে পড়ত ব'লে নানা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'লেও জলপানি পায় নি। প্রতিমা বলত সান্ত্বনা দিয়ে: "জলপানি নাই পেলে ভাই। আসল কথা জানতে চাওয়া শিখতে চাওয়া। তোমার মেধা আছে তুমি হার মানবে কেন?" যমুনা প্রতিমাকে দেখে প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল: কী রূপ! তার উপর মুখে বুদ্ধির আভা, চলাফেরায় সুষমা, মতামতে আত্মবিশ্বাস। দুদিনেই সে প্রতিমাকে মুখে দিদি ব'লে ডেকে মনে মনে গুরুবরণ করল। আসন শিখে স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হওয়ার ফলে সে প্রতিমার আরো নেওটো হ'য়ে উঠল।

নির্মলার ভালো লাগত না ওদের অন্তরঙ্গতা। একটা কারণ যমুনার বাবা শুধু মাতাল নয় তার উপর অনাচারী। মেয়ে ছিল এক বিধবা মাসীর তদারকে যাকে যমুনা অভক্তি না করলেও মেনে চলত না। প্রতিমার সঙ্গে

ঘনিষ্ঠতা হওয়ার ফলে যেন সে আরো বেপরোয়া হ'য়ে উঠল। ট্রামে বাসেই বেশি যাতায়াত করত কারণ রতনবাবুর মোটর দরকার হ'ত উড়ন্ত কাজে। প্রতিমা অনেক সময়েই শ্রীমন্তের টুসীটার মোটরে তাকে নিয়ে বেরুত—কখনো গড়ের মাঠে, কখনো জাদুঘরে, বেশির ভাগ সময়ে—দক্ষিণেশ্বরে বা বেলুড় মঠে। শ্রীমন্ত সহযাত্রী হ'লে তিনজনেই বসত—কখনো শ্রীমন্ত সারথি, প্রতিমা মাঝে, যমুনা একধারে—কখনো প্রতিমা সারথি, যমুনা মাঝে, শ্রীমন্ত তার পাশে। নির্মলার একটুও ভালো লাগত না—যুবতী মেয়ের এভাবে শ্রীমন্তের পাশে বসা, কিন্তু প্রতিমা হেসে উড়িয়ে দিত: "তাতে কি? মানুষ সব আগে মানুষ তারপর মেয়ে বা ছেলে।" নির্মলা এধরণের কথা কখনো শোনে নি। কিন্তু ঠেকে শিখেছিল, বুঝেছিল প্রতিমাকে বৌমা ব'লে ক্রমাগত শাসন করার অপচেষ্টা করলে শুধু অশান্তিই ফেঁপে উঠবে, যার ফলে ছেলে আরো পর হ'য়ে যাবে। তবু মাঝে মাঝে প্রসাদকে পীড়াপীড়ি করত শ্রীমন্তকে বোঝাতে। প্রসাদ বলত হেসে: "ও কি নাবালক যে বোঝাব? তাছাড়া ও তো যমুনাকে নিয়ে একলা বেরুচ্ছে না। বৌমা সঙ্গে আছে ওর রক্ষাকবচ। ভয় কিসের?" নির্মলা বলত: "ভয়ের কথা হচ্ছে না—কিন্তু লোকে নিন্দে করে যে!" প্রসাদ হেসে বলত: "ও:। নিন্দে? কে না কাকে নিন্দে করে? তোমাকেই কি তারা রেয়াৎ করে ভাবো? না সামনে আমার গুণগান ক'রে আড়ালে আমার নামে যা তা বলতে ছাড়ে?" নির্মলা রেগে উঠে বলত: "তোমার আমার নিন্দে করে চরিত্র নিয়ে নয়।"

প্রসাদ: ওদের চরিত্রে খুঁৎ খুঁজে পেল ঠিক কোন্‌খানে?

নির্মলা: কী যে উড়ো তর্ক করো তুমি! গা জ্বালা করে। তাহ'লে কি বলতে হবে—সুনাম ব'লে এজগতে কিছুই নেই, কুলাচার, সদাচার—

প্রসাদ: পণ্ডিতি বুলি ছাড়ো। বলো কোথায় কবে শ্রীমন্ত দুরাচারের চালে চলেছে।

নির্মলা (মাতৃগর্বে): ঈশ! আমি কি তেমনি ছেলে পেটে ধরেছি ভাবো তুমি? আমি বলতে চাইছি এইভাবে ওদের যখন তখন মোটরবিহার দেখলে নানা লোকে নানা কথা কয়। তাছাড়া প্রতিমা মোটর হাঁকায় এও কি ভালো বলবে?

প্রসাদ: কী বলছ তুমি? তুমি কি ত্রেতা যুগের সতী অনসূয়া? আমার তো মনে হয়, তুমি মোটর না চালালেই বরং আমার মানহানি হয়।

শিখবে? খুব সহজ। চৌরঙ্গিতে লেকে বড় বড় মোটরে গিশ গিশ করছে তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী··

নির্মলা: যাও—তোমার সঙ্গে কথা কওয়া ঝকমারি। বলো না—

অবুঝকে বোঝাবো কত বোঝ নাহি মানে?
ঢেঁকিকে বোঝাবো কত নিত্য ধান ভানে।

প্রসাদ (হেসে): আই প্রোটেস্ট। আমি বিদ্বান বুদ্ধিমান দেশের দশের একজন—অন্তত: ঢেঁকি কখনই নই। বিশ্বাস না হয় পরখ ক'রেই দেখ না—তোমার শ্রীচরণের চাপ পড়লে আমি উ হু হু হু করতে পারি কিন্তু কিঁচ কিঁচ করব না।

নির্মলা: যাও। তোমাকে···তোমাকে···তোমাকে··(চোখে আঁচল দিয়ে প্রস্থানোদ্যত)

প্রসাদ: শোনো শোনো—(আঁচল ধ'রে) না, আর ঠাট্টা করব না। কিন্তু তুমি ভুলে গেছ যে শাস্ত্রীজি দুতিনটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন যে প্রতিমা নিবেদিতার শিষ্যা? তাছাড়া ও শ্রীমন্তের জন্যে পদে পদে কত সংযম ক'রে চলে—কত কী ছেড়েছে ভেবে দেখেছ কি?

নির্মলা: মেয়েরা স্বামীর ঘর করতে বাপের বাড়ীর কত কী সুখ ছাড়ে তুমিও ভেবে দেখেছ কী?

প্রসাদ: কিন্তু নাবালিকার দুঃখও ছাড়ে, আর ঐ সঙ্গে এক নতুন সুখ পায়—যাকে সবাই চালাত সেই সবাইকে চালায়।

নির্মলা (বিরস কণ্ঠে): পোড়াকপাল! আমি এ-সংসারে দাসীবৃত্তি ক'রে কাকে চালাচ্ছি বলতে পারো? তুমি কোনো কথা কানে তোলো না। শ্রীমন্ত কিছু বললেই মুখ ভার করে আর তোমার লক্ষ্মীপ্রতিমাটি তাঁর নিজের তালেই আছেন—মোটর, হৈ হৈ, বনভোজন···

প্রসাদ: অবিচার কোরো না। প্রতিমা হৈ চৈ করবার মেয়ে নয়—একটু আধটু লেকে বা বটানিকাল গার্ডেনে যায় বটে, কিন্তু সব চেয়ে বেশি যায় বেলুড় মঠে আর দক্ষিণেশ্বরে। না, শোনো একটু মন দিয়ে। প্রতিমা এদেশের পরিবেশে গ'ড়ে ওঠে নি। মানুষ হয়েছে এমন এক দেশে যেখানে মেয়েরা শুধু যে ছেলেদের সঙ্গে অবাধে মেশে তাই নয়, মোটর হাঁকায়, পাহাড়ে চড়ে, সমুদ্রে সাঁতার দেয়—গত যুদ্ধে তারা শুধু ট্রেঞ্চে গিয়ে বন্দুক ধরে নি এই যা, কিন্তু বাস হাঁকিয়েছিল ট্রাম, চালিয়েছিল, টিকিট-কলেক্টর হয়েছিল,

এঞ্জিনিয়ারদের সহকারী হ'য়ে নতুন নতুন ব্যারাক তৈরি করেছিল, হাঁসপাতালে সার্জন হয়েছিল—করে নি কী ?

নির্মল (ঝাঁঝালো সুরে) : গৃহস্থালিকে মান দেয় নি···শিশুদের লালন করে নি···

প্রসাদ : অমন কথা বলো না। তারা হাজার হাজার অনাথ শিশুর দেখাশোনা করেছিল, পুরুষদের দেশরক্ষার কাজে সহায় হ'তে এমন কি পুলিশ শান্ত্রীও হয়েছিল। ওরা মস্ত জাত, নির্মলা। তবে হয়েছে কি জানো ? প্রাণশক্তি ওদের এত বেশি যে তা নিয়ে ওরা কী করবে ভেবে পায় না।

নির্মলা : কী করবে ? করবে মদ খেয়ে পরপুরুষদের বুকে জড়িয়ে ধ'রে দলে দলে লাফালাফি, রাতে ঘরে না ফিরে ঘুমিয়ে নেবে দিনের বেলায়, আবার রাতে রংমহলের রঙ্গিনী হ'য়ে নাচ সুরু করতে। আমার কাজ নেই এমন প্রাণশক্তিতে।

প্রসাদ : কিন্তু কোনো শক্তি উপচে পড়লে তার অপব্যয়ও হবেই। আগুন নিয়ে যারা খেলা করে তারা থেকে থেকে আগুনে পুড়বেই···

ক্রিং··· ক্রিং · ক্রিং···

প্রসাদ (টেলিফোনে) : কে ?

অপরিচিত স্বর (টেলিফোনে) : আপনার পুত্রবধূ আর একটি মেয়ের মোটর এক বাসের ধাকায় উল্টে পড়ায় তাঁরা জখম হয়েছেন। মেয়েটির বাবা রতন ভট্টাচার্য আপনাদের প্রতিবেশী, আপনি তাঁকে নিয়ে সোজা চিত্তরঞ্জন হাঁসপাতালে আসুন এক্ষুনি।

প্রসাদ : আচ্ছা, বহু ধন্যবাদ। কোন্ হাঁসপাতাল বললেন ?

স্বর : চিত্তরঞ্জন।

প্রসাদ : আচ্ছা, বহু ধন্যবাদ, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

শ্রীমন্ত ছিল পাশের ঘরে। প্রসাদ বেরিয়ে এসে সব বলতে সে শিউরে উঠল : "কিন্তু জখম হয়েছে কে ? দুজনেই ?"

প্রসাদ : ওরা তো তাই বলল। এখন এসো, মোটরে কথা হবে। আয়।

শ্রীমন্ত মোটরে উঠে বসে। একটু পরে বলল : "ও যমুনাকে মোটর চালাতে শিখিয়েই এই বিভ্রাট বাধিয়েছে।"

প্রসাদ (চম্‌কে) : যমুনা ? তাকে কেন শেখাতে গেল ?

শ্রীমন্ত : যমুনা ধরেছিল।

প্রসাদ (রুষ্ট) : যমুনা বাপের মত নিয়েছিল ?

শ্রীমন্ত : জানি না। কিন্তু তাঁকে সঙ্গে নিলেন না কেন ?

প্রসাদ : এসময়ে সে বাড়ি থাকে না। তাছাড়া আমি চাইছি দুজনকে এক্ষনি নিয়ে আসতে।

শ্রীমন্ত : ওরা কি অনুমতি দেবে ?

প্রসাদ : বেশি চোট না লেগে থাকলে দেবে খুশী হ'য়েই। আশা করি কোনো হাড় টাড় ভাঙে নি।

শ্রীমন্ত : এ্যাকসিডেন্ট হ'ল কেমন ক'রে ?

প্রসাদ : একটা বাসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে।

শ্রীমন্ত (নিজেকে সামলে নিয়ে করজোড়ে) :

প্রণতক্লেশনাশায় হরয়ে পরমাত্মনে।

বাসুদেবায় শান্তায় গোবিন্দায় নমো নম :॥

প্রসাদ (জুড়ে দেয়) :

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে !

সর্বস্যার্তি হরে দেবি ! নারায়ণি ! নমস্তুতে॥

শ্রীমন্ত চোখ বুজে কেবল ডেকে চলে ঠাকুরকে।

প্রসাদ (একটু পরে) : বেশি ভয় পাবার দরকার নেই। হয়ত সামান্য চোট লেগেছে।

শ্রীমন্ত : কিন্তু মেয়েছেলে তো।

প্রসাদ : এখনো তোর মুখে এই কথা ? প্রতিমাকে কি তুই চিনিস নি ?

শ্রীমন্ত (লজ্জা পেয়ে) : কিন্তু যমুনা ?

প্রসাদ (আতপ্ত কণ্ঠে) : তার জন্যেই তো ঘটেছে এ-বিভ্রাট। আটপৌরে মেয়ে—কী দরকার মোটর চালানোর ?—তার উপর কলকাতার রাস্তায় চৌরঙ্গিতে···

॥ তেরো ॥

চিত্তরঞ্জন হাঁসপাতালে তিনতলায় একটি ঘরে প্রতিমাকে শয্যাশায়ী দেখে প্রসাদ চোখ মুছলেন। শ্রীমন্ত নার্সকে বলল: "খুব বেশি চোট লেগেছে কি?"

নার্স: না। খুব বেঁচে গেছেন। বাসের সামনে পড়েন নি ওঁরা। মাডগার্ডে ধাক্কা লেগে ওঁদের টুসীটার উল্টে পড়ে। একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়—অন্যটি একাই উঠে দাঁড়িয়ে দেখেন সামনেই আমাদের হাঁসপাতাল। তারপর আমরা অজ্ঞান মেয়েটিকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে আসি। অন্যটি—কর্সা মেয়েটি—খুব সাহসী। কথা বললেন যেন কিছুই হয়নি।

শ্রীমন্ত: কী হয়েছে ঠিক?

নার্স: বিশেষ কিছু নয়—বাঁ হাঁটুতে আর ডান কনুইয়ে চোট লেগেছে। একটু বাদে এক্সরে করা হবে, তারপরে আপনারা নিয়ে যেতে পারেন।

প্রসাদ: এক্সরে করতে যদি দেরি হয় তো নিয়ে যাই, আমি ওর শ্বশুর—

নার্স: তা হয় না, এক্স-রে রিপোর্ট না পেলে আমরা ছাড়পত্র দিতে পারি না--এই যে তিনি এসেছেন আর ভাবনা কি?

এক্স-রে ডাক্তার (প্রসাদকে দেখে নমস্কার ক'রে): এই যে প্রসাদবাবু! বেশি চোট লাগে নি। ভয় পাবেন না। বসুন।

॥ চোদ্দ ॥

ওদের এক্স-রে করার ঘরে নিয়ে গেলে শ্রীমন্তকে প্রসাদ বললেন বেশ একটু উষ্ণ সুরেই: "যমুনার মতন মেয়েকে প্রতিমা কেন মোটর হাঁকানো শেখাতে গেল? যত নষ্টের গোড়া ঐ মেয়েটা।"

শ্রীমন্ত: এমন কথা বলবেন না বাবা। আপনি নিজেই কতবার যমুনার বুদ্ধির প্রশংসা করেছেন, দুঃখ করেছেন মা যমুনাকে দেখতে পারেন না ব'লে। অ্যাকসিডেণ্ট হয়ই। আপনাকে তো বলেছি—আমার দক্ষবন্ধু নিশান্তর মোটরের মাডগার্ডেও আর এক মোটরের ধাক্কা লেগেছিল।

প্রসাদ: সে তো নিশান্তের দোষে নয়।

শ্রীমন্ত : আপনি রেগে গেছেন তাই এমন কথা বলছেন। এ্যাকসিডেন্ট কবে কার দোষে ঘটে ধরা যায় কি সব সময়ে? আপনি কি ভুলে গেছেন আমিও একবার এক সাইক্লিস্টকে জখম করার জন্যে দণ্ড দিয়েছিলাম দুশো টাকা?

প্রসাদ (একটু চুপ ক'রে থেকে): থাক এ-তর্ক। কিন্তু প্রতিমা যেন আর যমুনাকে মোটর চালাতে না দেয়—দিলে আমি...আমি···আমি···

শ্রীমন্ত (হেসে): হতভম্ব হ'য়ে যাব, এই তো? আমারও ঐ একই বক্তব্য বাবা: কবে কখন কিসে কী হয় আমরা কিছুই বুঝি না, বা ভুল বুঝি। এ আমার কথা নয় যে কাটবেন। আপনার বিচক্ষণ বন্ধু শাস্ত্রীজির কথা। এই প্রতিমার কথাই দেখুন না। কেউ কি ভেবেছিল তার মতন সাহসী মেয়ে আমার মতন ভীরুকে বিয়ে ক'রে আমাকে রাতারাতি (হেসে) মহাবীর না হোক মানুষ ক'রে তুলবে? আর মা কি ভেবেছিলেন ম্লেচ্ছ বৌমাকে উলু উলু ক'রে ঘরে তুলবেন? বাবা, অপরাধ নেবেন না, আপনি সব বিষয়েই সমজদার, কিন্তু আপনার কি মনে হয় না প্রতিমা যমুনাকে ভালোবেসেছে বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে এখানে সে একটিও সখীর দেখা পায় নি? তাছাড়া এও কি সত্যি নয় যে, ওর মতন মেয়ে নিজের কথা ভাববার আগে পরের কথা ভাবে? ও আমাকে দু তিনবার বলেছে: আহা, যমুনা বেচারির কী কষ্ট! মাতৃহারা, তার উপর বাপ থেকেও নেই—অমানুষ। থাকবার মধ্যে—এক পাড়াগেঁয়ে বিধবা মাসী। যমুনাও প্রতিমার আশ্রয় চেয়েছে কি ঠিক এই জন্যেই নয়?

প্রসাদ (একটু পরে): কিন্তু কেউ চাইলেই তাকে আশ্রয় দিতে হবে একথা কোন্ সংহিতায় আছে শুনি?

শ্রীমন্ত : দরদের মানবসংহিতায় বাবা। প্রতিমার কাছে শুনেছিলাম ওর এক দাদুর কথা যিনি একলা থাকতেন স্ত্রী মারা যাবার পর। কিন্তু ঘরভরা বিড়াল কুকুরছানা পাখী···কোনো রুগ্ন বা আহত কুকুরকে ঘরে এনে দেখাশুনো ক'রে তিনি গভীর আনন্দ পেতেন। প্রতিমা তার এই দাদুটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। বলে তাঁর ছোঁয়াচেই ওর মধ্যে প্রথম জাগে অনুকম্পার আনন্দ। আরো একটা কথা বলি বাবা—যদিও বলব বলব মনে ক'রেও ভরসা পাইনি প্রসঙ্গটা তুলতে। কথাটা এই যে প্রতিমা এখানে এসেছিল মূলতঃ নিবেদিতার মতন ভারতবর্ষের সেবা করতে। কিন্তু কোথায় ছাত্রী পাবে?

নিবেদিতা পেতেন নানা কারণে—প্রথম কারণ শ্রীমা সারদামণির আশীর্বাদ ও সমর্থন। কিন্তু প্রতিমা এখানে স্কুল ক'রে দুঃস্থ মেয়েদের শেখাতে চাইলেও সুযোগ কোথায়? তাদের আসা যাওয়ার ব্যবস্থাই বা করবে কেমন ক'রে? আমি এ নিয়ে বেলুড় মঠের দু একটি ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কথা কয়েছি। তাঁরা শুনে শুধু গালে হাত দিয়ে ভাবেন আর ভাবেন: তাই তো!

এই সময়ে নার্স নিয়ে এলো প্রতিমাকে। বলল: "প্রতিমা ঘা খায় নি তাই বাড়ি ফিরতে পারে, কিন্তু যমুনাকে অন্তত চার পাঁচদিন হাঁসপাতালে থাকতে হবে, কারণ তার বিষম মাথা ঘুরছে, জরও হয়েছে। মাঝে মাঝে একটু আধটু ভুলও বকছে—delirious.

প্রতিমা: সে হবে না। যমুনাকে এখানে একলা ফেলে আমি ফিরব না আরাম করতে।

নার্স: এ আরামের কথা নয় মাদাম—

প্রতিমা: আমি লণ্ডন থেকে এসেছি সিস্টার—এক নার্সের কাছে আট মাস first aid এর পাঠ নিয়েছিলাম। যমুনার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। ওকে যদি যেতে না দেন আমি এখান থেকে নড়ছি না।

প্রসাদ: এ তোমার অন্যায় মা!

প্রতিমা: না বাবা, ক্ষমা করবেন। যমুনাকে আমি মোটর চালাতে শিখিয়েছি। আমার ভুল হয়েছিল সাত তাড়াতাড়ি কলকাতার রাস্তায় ওকে মোটর চালাবার অনুমতি দিয়ে। আমার এ-ভুলের প্রায়শ্চিত্তও আমাকেই করতে হবে।

এই সময়ে ডাক্তার এসে শিষ্টাচার সম্মত সম্ভাষণাদি সেরে সব কথা শুনে একটু ভেবে প্রতিমাকে বললেন: "নিয়ে যেতে পারেন ওকে। আমরা ওঁকে রাখতে চাইছিলাম ওঁরই মঙ্গলের জন্যে। কিন্তু উনি জ্বরের ঘোরে যে ভাবে কেবলই 'প্রতিমাদি প্রতিমাদি' করছেন তাতে মনে হয় ওঁকে আপনার কাছ ছাড়া করলে অন্যায় হবে। তাই আমি আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি ওঁকে নিয়ে যেতে—আরো এই জন্যে যে, উপস্থিত আমাদের বেড-এর অভাব অত্যন্ত বেশি। ওঁকে এ্যাম্বুলেন্সে শুইয়ে নিয়ে যেতে হবে, আর বলাই বেশি যতটা পারেন হট্টগোলের পরিধির বাইরে।"

প্রতিমা: বহু ধন্যবাদ। ওকে আমি আমার পাশের ঘরেই রাখব যতদিন ও পুরোপুরি সেরে না ওঠে।

॥ পনেরো ॥

প্রতিমা জেদী মেয়ে, কিছুতেই রাজী হ'ল না যমুনাকে ওর মাসিমা ও বাপের তদারকে রাখতে। বলল শ্রীমন্তকে: "ও আমার কাছেই প্রথম সত্যিকার স্নেহ পেয়েছে। তাই ওর মন খারাপ হবেই হবে—বিশেষ ক'রে অসুখে নানা মিথ্যে কল্পনা মানুষকে পেয়ে বসে ব'লে। ওকে এ-সময়ে আমার কাছছাড়া করা হ'লে ও সইতে পারবে না।"

প্রতিমার পাশের ঘরটি প্রসাদ সযত্নে ওর সাজসজ্জার কক্ষ ক'রেই সাজিয়েছিলেন ভালো আয়না ডিভান ডেস্ক প্রভৃতি দিয়ে। প্রতিমা সেই ডিভানেই মোটা তোষক বিছিয়ে যমুনাকে শুইয়ে রতনবাবুকে খবর দিল। তিনি মোটের উপর খুশীই হলেন। সুখের পায়রা তো। মেয়েকে যে একটুও ভালো বাসতেন না তা নয়, তবে গলগ্রহ মনে ক'রে ওর বিয়ের জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু সবাই জানত হাত উপুড় করা তাঁর স্বভাব নয়। তাই যমুনা সুশ্রী মেয়ে হ'লেও তার পাণির জন্যে কোনো প্রার্থীরই অভ্যুদয় হ'ত না। রতনবাবু যথাবিধি আগুন হ'য়ে উঠতেন যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রসাদ হেসে বলতেন: "ভায়া, যৌতুকের একটা ভালো দিকও আছে একথা ভুলো না! বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে মেয়ে কেউ চায় না, সবাই চায় ছেলে—ডি এল রায় অকারণ লেখেন নি:

আমি চাই পুত্র বিবাহে আনে বয়স্থা
কন্যাদায়গ্রস্ত টাকার বস্তা,
আর নিজের মেয়ের বিয়ে হ'য়ে যায় সস্তা
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।"

রতনবাবু তীক্ষ্ণ গোঁফে চাড়া দিয়ে বলতেন: "এ একটা কথাই নয় দাদা। মানুষ বিয়ে করবে ভালো বৌ-কে ঘরণী করতে, দুচার হাজার টাকা সিন্ধুকে পুরতে নয়। আমার আপত্তি 'দি ভেরি প্রিন্সিপ্‌লে'—অর্থাৎ যে যৌতুক চায় তাকে বলা—তফাৎ যাও, কিন্তু যে সেধে আসে যৌতুক দাবি না ক'রে তাকে দেব যথাসাধ্য। ? আমার ঐ এক মেয়ে—ওকে ছাড়া আর কাকেই বা আমার সম্পত্তি দেব বলো ?"

প্রসাদ : কিন্তু সম্পত্তি তো বাঁধা—সেদিনই কাঁদুনি গাইছিলে সুদ দিতে দিতে প্রাণান্ত। যমুনাকে দিয়ে যাবে কী শুনি—তোমার ঐ টুসীটায় আর ছেঁড়া সতরঞ্চি ?

রতনবাবু : কী বলছেন আপনি দাদা ? আমার লাইফ ইনশিয়োর—

প্রসাদ : সে তো শুনি বাতিল হ'য়ে গেছে পর পর তিনবৎসর প্রীমিয়ম দাও নি ব'লে।

রতনবাবু (মাথা চুলকে) : তিনবৎসর না—তবে সম্প্রতি একটা বাজিতে বাজিমাৎ করতে না পারার দরুন এক ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা ধার করেছি। ওদের তুতিয়ে পাতিয়ে…

প্রসাদ : থাক থাক ভাই, মিথ্যে-কথার ফুলঝুরির অনেক গুণ আছে কেবল ফুল কাটে না এই যা।

বলা বাহুল্য যমুনা এমন মিথ্যুক লম্পট পিতৃদেবকে শ্রদ্ধা করতে পারে নি। চেষ্টা যে করে নি তা নয়। প্রতিমাকে বলেছিল কেঁদে : "দিদি, আপনাকে আমার সবচেয়ে হিংসে হয় কী জানেন? আপনার রূপ গুণের জন্যে নয়—যদিও আপনার ভালোবাসবার শক্তি দেখে আমি সত্যি চমকে উঠেছি—আমি আপনাকে হিংসে করি আপনি এমন দেবতুল্য বাপের প্রভাবে গ'ড়ে উঠেছেন ব'লে। জানেন দিদি, আমি দেহে অবলা হ'লেও মনে অবলা নই। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে দুঃখের অনাদরের কোলে মানুষ হওয়ার জন্যে ভাবতেও শিখেছি অল্পবয়সে—যাকে আপনারা বলেন 'প্রিকোশাস'। তাই আরো আপ্রাণ চেষ্টা করি পড়াশোনায় কৃতী হ'য়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। দিদি, একথা কাউকে বলি নি, কিন্তু আপনাকে সব কথা জানিয়ে একটু হাল্কা হ'তে চাই ব'লেই বলছি যে. আমার মন সময়ে সময়ে ধিক ধিক ক'রে ওঠে যখন বাবার নানা বেলেল্লামির কথা কানে আসে। মনে অনুতাপ হয় কারণ ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি বাপ মার প্রতি ভক্তি যার নেই সেই মরার পরে নরকে যাবেই যাবে। কিন্তু বাপের জন্যে যাকে জীবদ্দশায়ই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তার কি আর নরকের ভয় থাকতে পারে, বলুন তো ?

কিন্তু যমুনা বাপের "বেলেল্লামি" নিয়ে ঐ একবারই আলোচনা করেছিল দরদী দিদির সঙ্গে। পিতৃনিন্দা ক'রে তার মন গ্লানিতে এমন কালো হ'য়ে এসেছিল যে সে আর বাপের নাম মুখেও আনত না।

প্রতিমার দরদী মন নরম স্নেহে গ'লে গেল। ইংলণ্ডেও এমন বাপ অনেক

আছে যাদের কুলাঙ্গার উপাধি দেওয়া চলে। কিন্তু তার নিজের জীবনের গতিবিধি আবদ্ধ ছিল সাত্ত্বিক গণ্ডির মধ্যে। একদিকে আদর্শবাদী বাপ মা, অন্যদিকে নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ ও সব কিছুতেই সাহসের দীক্ষা। আলোক রাজ্যের বাসিন্দা আঁধার রাজ্যের খবর পেতে পারে কিন্তু সময়ে সময়ে বিষণ্ণ হ'লেও অবসন্ন হয় না—আলোয় চোখ মেলার আনন্দে অন্ধকারের দুর্লগ্নকে কতকটা মায়া ব'লেই মনে না ক'রে পারে না। আশার পাখী কিছুতেই পারে না নিরাশার ভূগর্ভকে পুরোপুরি বাস্তব ব'লে মানতে। শাস্ত্রীজির কাছে আরো শুনেছিল সংসারে অনেক কিছুই আমাদের মনকে কম বেশি রাঙিয়ে তোলে বটে। কিন্তু রঙের রঙ হ'ল সৎসঙ্গ; অনেক কিছুই আমাদের বল দেয়, কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড় খুঁটি প্রেমের অভয়—তাই যে এই অভয়মন্ত্র রাতদিন জপ করে ভয় তার কাছে আসতে ভয় পায়। একথার সবচেয়ে উজ্জ্বল সমর্থন সে পেয়েছিল যৌবনে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সংস্পর্শে এসে সে নিবেদিতার আশ্চর্য কাহিনী পড়ে। তার ডায়রিতে সে সযত্নে টুকে নিয়েছিল নিবেদিতার উদ্ধৃত একটি বাণী স্বামীজির অভয়ে-ঝঙ্কৃত: "Never forget to say to yourself the difference between a firefly and the blazing sun ··such is the difference between the householder and the sannyasin.

"Everything is fraught with fear: Renunciation alone is fearless." (সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্)*

॥ ষোলো ॥

কিন্তু যমুনাকে নিজের দায়িত্বে পাশের ঘরে রাখার ফলে প্রতিমার নানা সমস্যা ফের ফুলে উঠল—আর এবার বহুমুখী আঘাতে।

প্রথম আঘাত পেল শাশুড়ীর কাছে, বলাই বাহুল্য। তিনি আগুন হ'য়ে উঠলেন: "বলি নি আমি? আমার মন ভগবান। তেলে জলে কি মিশ খায়? ওদের চালচলন ম্লেচ্ছ অনাচারি, আমাদের চালচলন গ'ড়ে উঠেছে মুনি ঋষির উপদেশে। একে তো মেয়েছেলেদের মোটর হাঁকানোই বিশ্রী,

* WANDERINGS WITH SWAMIJI—NIVEDITA

তার উপর আশ পাশে এই চালকে চালু করার কর্মফল—মোটরের দুর্ঘটনা—ভেঙে চুরমার হ'য়ে দুই মেয়েই মারা যেত শুধু আমাদের ঠাকুরের কৃপা বাঁচিয়েছে। কিন্তু তার পরেও ছেদ নেই—চলল মেয়ে সমানে নিজের মর্জিকে ঘোড়শোয়ার ক'রে—এক লম্পট বাপের মেয়েকে এনে তুলল নিজের পাশের ঘরে! দেখেশুনে আমি সত্যি থ হ'য়ে গেছি—কী বলব ভেবে পাচ্ছি নে।"

শ্রীমন্ত (হেসে): যা বলেছ মা, অতঃপর আর কিছু না বললেও চলবে।

নির্মলা: চলবে? এ কেমন কথা? এখনো এ-বাড়ির গিন্নি আমি, মনে রাখিস।

প্রতিমা (মৃদু স্বরে): রাখব মা। আর আমাকে যদি আপনার গিন্নিপনার বাধা ব'লে মনে করেন তাহলে আমি আর কোথাও উঠে যেতে রাজি আছি—অবিশ্যি, যমুনা সেরে উঠলে।

নির্মলা: আর কোথাও উঠে যাবে কোথায় শুনি? আর খর্চা দেবে কে?

প্রতিমা: সে আপনাকে ভাবতে হবে না মা। আমি বাবাকে আজই তার ক'রে দেব। পানিহাটিতে গঙ্গার ধারে একটি বাড়ি দেখে এসেছি। পানিহাটি দক্ষিণেশ্বরের কাছে। সেখান থেকে রোজ সকালে যেতে পারব ঠাকুরের ঘরে—বেলুড় মঠে।

নির্মলা: আর শ্রীমন্ত? ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকবে?

শ্রীমন্ত: কী গোল করছ মা একটা তুচ্ছ জিনিস নিয়ে? একটি নিরীহ মেয়ে অসুস্থ হ'য়ে মাসখানেক আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে—তাতে কার কী অসুবিধে হয়েছে শুনি?

নির্মলা: শুধু আশ্রয় নেওয়া? ও...ও...কী বলব আমি কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

শ্রীমন্ত (জোর ক'রে হেসে): একথা মা আজ প্রথম শুনলাম তোমার মুখে। তোমার জিভের কোনো লাগাম নেই এইই আমরা দেখে এসেছি বরাবর।

নির্মলা (রুষ্টকণ্ঠে): বড় বাড় বেড়েছে মেম বৌকে পেয়ে, না? ভাবছিস মা সেকেলে মেয়ে, অবলা, একটু দাবড়ে দিলেই বোবা হ'য়ে যাবে। মনে রাখিস আমি প্রতাপচন্দ্র তর্কতীর্থের নাৎনি, যিনি ভয় কাকে বলে জানতেন না।

শ্রীমন্ত : তাঁর আশীর্বাদে আমারো ভয় কেটে গেছে মা। প্রণাম : তুমি যদি এক রুগ্না মেয়েকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যে আমাকে ত্যজ্যপুত্র করো তা'হলে আমিও পানিহাটিতে বাসা বাঁধতে পারি।

নির্মলা (চোখে আঁচল দিয়ে) : অলক্ষুণে কথা তুই মুখে আনতে পারলি বাবা? আমি আজ গলায় কলসী বেঁধে গঙ্গায় ডুবে মরব। মা গঙ্গা আমাকে নাও—তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে চায় না। (ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না)

শ্রীমন্ত (নত হ'য়ে মা-র পা ছুঁয়ে) : এমন কথা বলে না মা। তোমাকে আমি চাই না এ কি হ'তে পারে কখনো? আমার জন্যে তুমি যা সয়ে এসেছ আমি কি জানি না? কিন্তু কী করব মা? অন্যায়কে তো ন্যায় বলতে পারি না। আমার দাদুর কথা মনে করো মা, তিনি বলতেন না কি উঠতে বসতে : ন চ সত্যাৎ পরো ধর্ম :—সত্যের মতন ধর্ম আর নেই। লক্ষ্মীটি মা, একটু স্থির হ'য়ে ভেবে দেখ, যমুনার বিকার এখনো কাটে নি, থেকে থেকে সে "দিদি দিদি" ব'লে কেঁদে ওঠে। ওর বাবা যাই হোন যমুনা যে ভালো মেয়ে তুমি নিজেই তো কতদিন বলেছ। তাছাড়া তুমি বাড়ির কুকুর বেড়ালকেও ঘৃণা করো না, তোমার শুচিবাই সত্ত্বেও তাদের খাওয়াও, পাখীদের জন্যে রোজ খই ছড়িয়ে রাখো ছাদে। কিন্তু রাগলে তুমি সব ভুলে যাও। তাই ভুলে বসলে যে, প্রতিমার সঙ্গে যদি আমার বিচ্ছেদ হয় তাহ'লে শুধু যে আমরা অসুখী হব, বাবা অসুখী হবেন, শাস্ত্রীজি অসুখী হবেন। তাই নয় পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই অসুখী হবে। তখন কি তুমি পারবে সুখী হ'তে? মা, যুগ বদলেছে—কাজেই অনেক কিছু সবাইকেই সইতে হয় নানা সংকটে। তুমি একটু ধৈর্য ধ'রে ভাবলেই বুঝবে যে প্রতিমা যমুনার ভার নিয়ে তাকে এখন ছাড়তে পারে না। ছাড়লে তার মাথা কাটা যাবে, আমিও তার কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

নির্মলা : আমি একটি ভালো নার্স মোতায়েন ক'রে দিচ্ছি—ও যাক চ'লে। ও হয়েছে আমার চক্ষুশূল।

প্রতিমা : মা, শুনুন একটু স্থির হ'য়ে। ওকে কথা দিয়ে আমিই এখানে ডেকে এনেছি, নৈলে ওকে হাসপাতালের নার্স হাসপাতালেই রাখতে চেয়েছিল। আমি ওকে এখানে টেনে এনেছি দুটি কারণে। প্রথম কারণ, ওকে আমি স্নেহ করি শুধু ওর নানা গুণ আছে ব'লে নয় ও আমাকে পেয়ে

প্রথম মুক্তির স্বাদ পেয়েছে ব'লে। একথা হয়ত আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না. কিন্তু অন্য কারণটি হয়ত আপনি বুঝবেন যদি একটু শান্তমনে বিবেচনা ক'রে দেখেন। ওকে মোটর চালাতে শিখিয়েছিলাম আমিই—ওর মনের নানা কোণে ভয় জ'মে আছে ব'লে। আমি দেখেছি কোনো শক্ত ভার নিলে মানুষ শক্ত হ'য়ে ওঠে সহজে। কিন্তু আমার একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল কলকাতার বাইরে না গিয়ে চৌরঙ্গির মতন রাস্তায় ওকে মোটর চালাতে দিয়েছিলাম ব'লে। ও চালাতও মোটের উপর ভালোই বলব। কিন্তু হ'ল কি, যারা ভয়কে ছেলেবেলা থেকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে তাদের মন সহজেই নার্ভাস হ'য়ে পড়ে। নৈলে ও বাসটাকে সহজেই এড়িয়ে ডান দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে পারত। কিন্তু নার্ভাস হবার জন্যে সব গোলমাল হ'য়ে গেল। সে যাই হোক, ওকে যে আমি মোটর হাঁকাতে শিখিয়েই তাড়াতাড়ি কলকাতার বড় রাস্তায় চালাতে হুকুম দিয়েছিলাম সে-ভুলের জন্যে প্রধানত আমিই দায়িক। দায় নিয়েও তার ফল ভুগব না এ অন্যায়। তাই আরো ওকে আমি আমার কাছে এনে দুদিন রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও যখন আপনার চক্ষুশূল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—যেকথা আমি সত্যিই ভাবতেও পারি নি—তখন আপনার উপর ওর ভার চাপানো আমার অন্যায় হবে। মা-র এক ইংরাজ বন্ধু এখানে আছেন—তিনি আমাকে স্নেহ করেন—সেদিনও বলেছেন কিছুদিন বালিতে গঙ্গার ধারে তাঁর বাড়িতে কোনো week-end কাটাতে। আমি তাঁকে টেলিফোন ক'রে যমুনাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে থাকতে পারি যতদিন না ও সম্পূর্ণ সেরে ওঠে।

প্রসাদ: এ হ'তেই পারে না। ও এখানেই থাকুক—(নির্মলাকে) তুমি এর পরেও যদি না করো তবে ফল ভালো হবে না। দুর্ভোগ যথেষ্ট হয়েছে, এখন আরো একটা জট পাকাতে চাও কেন?

নির্মলা (চোখ মুছে): আচ্ছা। আমি রাজী আছি। কিন্তু ও সেরে উঠলেই ওকে পাঠিয়ে দিতে হবে ওর বাপের কাছে।

প্রতিমা (হেসে): দেব মা দেব। আমি রোখালো মেয়ে বটে কিন্তু ঝাঁঝালো নই। আপনাকে কষ্ট দিতেও চাই না সত্যিই—বিশ্বাস করুন। তবে কি জানেন? আমি যে-পরিবেশে মানুষ হয়েছি সে-পরিবেশ ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবেশ নয়। তাছাড়া আমি না হিন্দু না ইংরেজ—সময়ে সময়ে আমার এমনও মনে হয়েছে আমি পূর্বজন্মে ফরাসী ছিলাম। কিন্তু সে যাক। আপনার

কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাচ্ছি আমার ভুলের জন্যে। যমুনাকে মোটর চালাতে শেখানোর জন্যে নয়, তবে ও কতটা পারবে তা আমি ভেবে দেখি নি এই ভুলের জন্যে। আর একটা কথা মা। আমি আমার ইংরাজ বন্ধুটির উৎসাহ পেয়ে উঠে প'ড়ে লেগেছি কয়েকটি দুঃস্থ মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবার। আপনাদের কোনো খরচ হবে না। যা খরচ লাগে আপাতত বাবা দেবেন। আমার নিজেরো কিছু সঙ্গতি আছে। যমুনা তখন আমার খুব কাজে আসবে।

নির্মলা (অনিশ্চিত স্বরে): আচ্ছা। আমি আর কী বলব বলো? হয়রান হ'য়ে গেছি।

॥ সতেরো ॥

প্রতিমা শোবার ঘরে ফিরে এসে বসল সামনের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বারান্দায়। বলল: "একটু দেরি হয়ে গেল। যমুনা কিছুতেই ছাড়ে না।"

শ্রীমন্ত (ঈষৎ বিরক্ত): এ তোমার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

প্রতিমা (মৃদু হেসে): তোমরা বলো না—কর্মফল?

শ্রীমন্ত: কিন্তু এ-অপকর্ম তো তোমার নয়।

প্রতিমা: কিন্তু আমিই তো ওকে উস্কে দিয়েছি।

শ্রীমন্ত: সামান্য। তার জন্যে সকলের সঙ্গে লড়াই করা চলে না।

প্রতিমা (ওর একটা হাত নিজের দুহাতের মধ্যে ধ'রে নরম স্বরে): শোনো একটু শান্ত হ'য়ে। তোমাদের দেশের একটি নীতিপাঠ আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করে: যে শরণ নেয় তাকে আশ্রয় দেওয়া। আমার মন ভিজে ওঠে ভাবতে যুধিষ্ঠির চার ভাই ও স্ত্রীকে দ্রৌপদী পথে হারানোর পর যখন মাত্র একটি শরণাগত কুকুরের সঙ্গে সশরীরে স্বর্গে পৌঁছলেন তখন ইন্দ্র তাঁকে কুকুরটিকে দূর ক'রে দিতে বলবামাত্র তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে কুকুরটি তাঁর আশ্রিত—তাকে যদি স্বর্গের পাসপোর্ট না দেওয়া হয় তবে তিনিও চান না স্বর্গবাস। কী চমৎকার বলো তো?

শ্রীমন্ত: মানি। কিন্তু ও তো কল্পনা—রূপকথা।

প্রতিমা: স্বামীজি বলতেন রূপকথা—মিথলজির মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে

এক একটা জাতির সেবা আদর্শ। এ আমার ছোট মুখে বড় কথা, মানি। তবু একথা একটুও বাড়ানো নয় যে, যমুনা যখন আমার পা জড়িয়ে ধ'রে বলল: তাকে বাপের তদারকে রাখলে সে বাঁচবে না—আমি ছাড়া আর ওর আপন বলতে কেউ নেই—তখন আমার মধ্যে সেই মা জেগে উঠল যে আজ বাস্তবে রূপ নেয় নি।

শ্রীমন্ত (নরম হ'য়ে): বেশ। ও মেয়েটিও ভালো। তার উপর তোমাকে যখন সাক্ষাৎ গুরুবরণ করেছে দেখতে পাচ্ছি···

প্রতিমা: হাল্কা ঠাট্টা করতে নেই কারুর জীবনমরণ সমস্যা নিয়ে।

শ্রীমন্ত: জীবনমরণ···

প্রতিমা: হ্যাঁ···ও একেবারে অন্ধকারে চলেছে কোথায় ও জানে না। বলল: "দিদি, জীবনে অনেক দুর্ভাগ্য আছে কিন্তু বাপকে শ্রদ্ধা করতে না পারার মতন শাস্তি আর নেই। আমি নিশ্চয় পূর্বজন্মে অনেক পাপ করেছিলাম তাই এমন বাপকে অন্নদাতা ব'লে মানতে হ'ল। আমাকে যদি একটা সামান্য টাইপিস্টের চাকরি পেয়ে ঘিঞ্জির মধ্যে একলা কাটাতে হ'ত তাহ'লে সে জীবনও আমি বরণ ক'রে নিতাম। কিন্তু আমি এখনো তো বি এ পাশ করি নি। আর করলেই কি চাকরি পাব? আজকাল সুপারিশ না থাকলে চাকরাণীও হওয়া যায় না।"

শ্রীমন্ত: আহা। বেচারী! শোনো আমি এক কাজ করব। তুমি সেদিন বলেছিলে: তোমার মা-র ইংরেজ বন্ধু তাঁদের আউট-হাউসের দুটি ঘর তোমার স্কুলের জন্যে ছেড়ে দিতে রাজী আছেন। ও সেখানে আপাতত একটি ঘরে থাকুক অন্যটিতে বিশ পঁচিশটি মেয়ে এসে তোমার কাছে শিখবে যা আর কারু কাছে শেখা যায় না।

প্রতিমা: একলা ও কী ক'রে থাকবে? তাই আপাতত আমার কাছেই থাকুক—না আমার পাশের ঘরে নয়, নিচের ঘরে। তোমাদের মস্ত বাড়ি, কারুর অসুবিধে হবার কথা নয়।

শ্রীমন্ত: থাকার অসুবিধে নেই মানি। কিন্তু খাওয়া পরার?

প্রতিমা: এমন কথা তোমার মুখে শুনব আশা করি নি শ্রীমন্ত! তোমার মা নানা সময়ে তীর্থে যেতে হাজার হাজার টাকা খরচ করেন—লোক লস্কর মোটর ধুমধাম—কী নয় বলো? আর এই একটি দুঃস্থ মেয়েকে দুবেলা দুমুঠো অন্ন দিতে পারবেন না—না তাঁর অজস্র শাড়ীর দুটো

পুরোনো শাড়ী দিতে তাঁর বাধবে? তাছাড়া আমারও তো শাড়ী শায়ার অভাব নেই…

শ্রীমন্ত (ঈষৎ উদ্বিগ্ন): মানে দাঁড়াচ্ছে পোষ্যকন্যা, এই তো?

প্রতিমা: নাম যা ইচ্ছে দিতে পারো, আসলে দাঁড়াচ্ছে কত খরচ পড়বে। তোমরা ধনী, আমিও নিঃস্ব নই—জানো কি, বাবা লণ্ডনে কতগুলি ছেলের হস্টেলের খরচ জোগান? অন্তত দশবারোটি।

শ্রীমন্ত (লজ্জা পেয়ে): টাকার জন্যে কথা হচ্ছে না প্রতিমা। আমিও স্বভাবে কৃপণ নই তুমি জানো। আমার ভয় অশান্তিতে।

প্রতিমা: ভয় ভয় ভয়! এই ভয়ই আমাদের মুক্তির পথ বিকাশের পথ আগলে ব'সে আছে। মানি তোমার মা…কিছু মনে কোরো না…কী বলব? …সহজে বাগ মানবার পাত্রী নন। কিন্তু তুমি আর আমি মিলে যদি তোমার বাবাকে পটাতে পারি তবে তিনি একটু বেকায়দায় পড়বেন না কি? তাছাড়া শোনো, ও কিছু নিবেদিতার মতন পণ নেয় নি আমাদের দেশের সেবা করবে। আজ না হোক কাল পরশু ওর বিয়ে হবেই হবে—তখন ওকে নিয়ে তোমাদের কারুরই এত শত দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে না।

শ্রীমন্ত: কিন্তু ধরো, ও যদি তোমার আদর্শ ই বরণ করে তোমাকে গুরু মেনে? অনেক মেয়েই বিয়ে করে বাধ্য হ'য়ে যেমন আবার অনেক মেয়ে চাকরি করে বাধ্য হয়ে। তোমাকে যখন ও ভালোবেসেছে তখন হয়ত ও এই প্রথম দলেরি মেয়ে, কে বলতে পারে।

প্রতিমা: আমার মনে হয় না ও সে-জাতের মেয়ে যারা ঘরণী কি মা হ'তে না চেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। আর দেখেছ তো, যারা চাকরি করে সে-সব মেয়েরা ঠিক রাজরাণীর পদবী পায় না। অন্ততঃ বিলেতে বা ফ্রান্সে নয়। তারা চলে ঠিক ঘরোয়া চালেই কেবল স্বামী ও সংসারকে পাশ কাটিয়ে। লিদিয়াও একথা আমাকে বলেছিল বেশ জোর দিয়েই। তাদের জীবন চলে বটে কতকটা নিজের মর্জির টাট্টুঘোড়ায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কেবল মাঝে মাঝে উদোম ছোটে কোনো পুরুষের ডাকে। কিন্তু সে দুদিনের জন্যে। ইংলণ্ডে কয়েক মিলিয়ন মেয়ের এই ভাবেই কাটে—ঠিক স্বৈরিণী বলব না, তবে কুমারী নয়। যমুনাকে এসব কথা আমি খুলেই বলেছি, কারণ আমি লাফ দেওয়ায় বিশ্বাস করলেও কোনোদিনই অন্ধ হ'য়ে লাফ দেওয়ায় বিশ্বাস করি নি। কিন্তু কথায় কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে, এখন কথা হচ্ছে—তুমি

যমুনার তরফে দাঁড়াবে না তোমার মা-টির তরফে। কিছু মনে কোরো না শ্রীমন্ত, তোমার মাতৃভক্তিকে আমি মন খুলেই সাবাস বলি, কেবল দুঃখ এই তাঁর মাতৃস্নেহকেও ঠিক তেমনি তারস্বরে 'ব্রাভো' বলতে পারি না। তিনি ভালোবাসেন ষোলোআনা নয়, পাঁচসিকে-পাঁচআনা—কেবল চান তুমি চিরটাকাল তাঁর ন্যাওটো হ'য়েই থাকবে। এ-ধরণের possessive ভালোবাসার মধ্যে স্নেহের সৌরভ চার আনা থাকলেও কর্ত্রীর গৌরবই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে বারো আনা।...কী? রাগ করলে?

শ্রীমন্ত: না, রাগ ঠিক নয়, তবে...তবে...ভাবছি।

প্রতিমা: কী?

শ্রীমন্ত: যমুনাকে এখানে রাখার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি ফলবে কি না। তোমার বাবার মুখেই শুনতাম ঘাড় ঘাড় কিসে যে কী হয় মানুষ জানে না...দুপা এগুলে কী ঘটবে বলতে পারে, কিন্তু দশ পা-র পরে অনেক সময়েই আমরা ভাবি এক হয় আর!

প্রতিমা (আতপ্ত স্বরে): তাই ব'লে তো আর মানুষ হাত পা গুটিয়ে আসন ক'রে নাক টিপে ব'সে থাকতে পারে না। প্রতিপদেই আমাদের ঠিক করতে হয় পরের পা কোথায় ফেললে সহজে এগুনো যাবে। জীবনের এমন কোনো ছকই কাটা যায় না যে-ছকে প্রাণের খুঁটি চাললে সরাসর গোলকধাম প্রাপ্তি।

শ্রীমন্ত (দীর্ঘশ্বাস ফেলে): তুমি হয়ত ঠিকই বলেছ। অন্তত যমুনাকে একটা ট্রায়াল না দিলে অন্যায় হবে—বিশেষ যখন ও তোমাকে বরণ করেছে ওর দিশারিণী ব'লে।

প্রতিমা: আমার রক্তে ফরাসী বাস্তববাদ প্রবল। বড় বড় কথা আমি কোনোদিনই ভালোবাসিনি।...হয়ত ব্রহ্মচর্যের জয়ধ্বনি ক'রে হার মেনে আরো শিখেছি যে আদর্শবাদ নৈলে বাঁচা বিড়ম্বনা হ'লেও সাঁতার না শিখে ডুবজলে নামলে হাত পা ছুড়ে ডুবে মরাই হয়, তীরে ওঠা হয় না।

শ্রীমন্ত (সদুঃখে): তোমার একথা শুনে দুঃখ হ'ল প্রতিমা। কারণ তোমার মতন মেয়ের স্বপ্নভঙ্গ করতেই আমি এসেছিলাম একথা ভাবলে (তোমার ভাষায়) আমার নিজেকে সাবাস দিতে লজ্জা হয়।

প্রতিমা (ওর কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে): ছি ছি, এমন কথা বলে? তোমার ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে আমি কত কী যে পেয়েছি আমি কি জানি না?

আমার মনের কত কাঁটাঘাসে গোলাপ ফুটেছে, প্রাণের কত শুকনো শাখায় ফুলের ফুলঝুরি ঝরেছে—সবচেয়ে বড় কথা, আমার নিঃসঙ্গ জীবনে এমন একজন সাথীকে অন্তরের অন্দরে পেয়েছি যাকে খুঁজেছি অজান্তে কত জায়গায়, কিন্তু কোথাও পাইনি আমার স্নেহ দিয়ে গ'ড়ে তুলতে শুধু তাকে আমার মনের মতন ক'রে নয়, নিজেকেও তার মনের মতন ক'রে গ'ড়ে তুলে। শ্রীমন্ত, এ-জীবনে নানা আশাই ভরসা দেয় কিন্তু কথা রাখে না। কেবল প্রেমেই পারে দিতে যার ছোঁওয়ায় সমস্ত অন্তর জেগে ওঠে। শুনি, এ প্রেমের রঙ ধোপে টেঁকে না। হবে। বাবার ভাষায় "জানি না তো কিসে কী হয়।" কেবল এটুকু জানে আমার প্রতি রক্তবিন্দু যে এ-জীবন মরীচিকা নয়, একে ধারণ ক'রে আছে দুটি জিনিষ—এক নিঃস্বার্থ কর্মের উদ্দীপনা আর এক প্রেমের তারিণী শক্তি। এ-শক্তিরও যে খবর পেয়েছি সেও তো তোমাকেই ভালোবেসে। এখন চাই এর পূর্ণিমাবিকাশ—নিঃস্বার্থ কর্মে। ফের বড় বড় কথা হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস কোরো—এ আমার ভ্রান্তবিলাস নয় রক্তেজাগা প্রত্যয়—যার আলোয় ভুবন আলো।

শ্রীমন্ত উঠে দাঁড়াতেই প্রতিমা ওর গাঢ় আলিঙ্গনে ধরা দেয়।

॥ আঠারো ॥

যমুনার জ্বর ছেড়েও ছাড়ে না। প্রতিমার ডাক্তার বন্ধু লরেন্স এসে বললেন: "রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।

পরীক্ষার ফল—টাইফয়েড।

তারপর সুরু হ'ল ঘটা ক'রে চিকিৎসা। ওর অসুখ সঙিন দেখে এমন কি নির্মলার মধ্যেও জেগে উঠল যার নাম চিরন্তনী মা—যা প্রতি মেয়ের রক্তে নিহিত। প্রসাদ এক নিপুণ ধাত্রীর মোতায়েন করলেন যে অ্যান্টিবায়োটিক্স চিকিৎসায় পারঙ্গম।

দিন পনেরো বাদে যমুনা পথ্য করল। ওর বাবা রতনবাবু—সুখের পায়রা—মেয়ের মুখোও হ'লেন না, তার মাসিমাকেও পাঠালেন না। তাঁর সংসারশকটও তো চলা চাই। মাসিমাই maid of all work—রাঁধুনী, কিঙ্করী, সেবাদাসী।

প্রতিমা চুপ ক'রে ব'সে ছিল না। এ দু সপ্তাহে নিজের স্কুলের নানা আত্মকর্মের অনুক্রমণিকা সাঙ্গ করেছিল। দুটি ঘরে টেবিল বেঞ্চি কালো বোর্ড মানচিত্র গ্লোব ইত্যাদি। সামনের লনে নরেন্দ্র সাহেব দোলনা টাঙাবার অনুমতি দিলেন, আরো নানা পড়ুয়াদের খেলার সরঞ্জাম। অল্পের মধ্যে বেশ একটি শিশু শিক্ষায়তন গ'ড়ে উঠল।

কিন্তু তারপরে সুরু হ'ল ছাত্রীসংগ্রহপর্ব। পড়ুয়াদের বাপ মা প্রফুল্ল মনেই প্রতিমার প্রস্তাবে সায় দিলেন মুখ্যত এইজন্যে যে প্রতিমা বলল স্কুলের ফী দিতে হবে না। তারা তো অবাক। বয়স ধরা হ'ল ছয় সাত থেকে দশ—বালক বালিকা দুইই স্বাগত। প্রতিমা শ্রীমন্তকে বলল: "সুরুটা ছোট বয়েসের হওয়াই ভালো। বীজের ম'ত। চারাগাছ গজালে সে আপনিই তার প্রার্থিত রস মাটি থেকে টেনে নেয়, আলোকে বরণ করে সানন্দে, হাওয়ায় মাথা নেড়ে বলে: 'এসেছ? এসো এসো…'"

পড়ানো সুরু করল প্রথম প্রতিমা আর শ্রীমন্ত। প্রতিমা নিল ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ইতিহাসের ও ভূগোলের গল্প করার ভার। শ্রীমন্ত ভার নিল পাটীগণিত ও বর্ণপরিচয়ের। যমুনা মাঝে মাঝে এসে দেখত, শিখত কী ভাবে শেখাতে হয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের।

প্রথম সুরু হ'ল দশটি শিশু নিয়ে—ছ'টি মেয়ে ও চারটি ছেলে। পাড়া প্রতিবেশীরা ক্রমশ খুশী হ'ল দেখে বিশেষ ক'রে ওদের স্বাস্থ্যের উন্নতি। ধনীরা পাঠাত না তাদের শিশুদের। প্রতিমাও চাইত না। ওর উদ্দেশ্য তো ভারতের সেবা—গুরু শিষ্যের কাছে মাইনে নেবেন কেন? গরিব ছেলে মেয়েই বেশি আসত বিশেষ ক'রে নানা মিল ও ফ্যাক্টরির অনাদৃত রোগা ছেলেমেয়ে। প্রতিমা দুপুরে তাদের জন্যে কিছু স্যাণ্ডউইচের ও কলার ব্যবস্থা করল। শেষে ঘোলের সরবৎ। ওদের মধ্যে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যেত: আর একটু আর একটু…। অনুযোগও সুরু হ'ত: ও দুবার নিয়েছে আমি মোটে একবার…ও দুটো কলা হাতিয়েছে আমি মাত্র একটি…শিশুদের মধ্যে সব আগে জেগে ওঠে সুবিচারের দাবি। এ যদি পায় ওরও পাওয়া চাইই চাই—নৈলে কুরুক্ষেত্র।

মাসখানেক বাদে যমুনা যোগ দিল। সে শুধু ইংরাজী পড়াত—বিশেষ ক'রে রূপকথা। আর শেখাত ইংরাজীতে কথা কওয়াতে।

॥ উনিশ ॥

মাসতিনেকের মধ্যে ওদের স্কুলের সুনাম হ'ল। কয়েকটি ভদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরাও পড়ুয়া হ'য়ে এল। কিন্তু হঠাৎ এক মুস্কিল: লরেন্স সাহেব প্রতিমাকে বললেন তাঁর স্বদেশে ফিরবার সময় আসন্ন। তাঁর বাংলোটিতে চারটি শোবার ঘর, একটি বৈঠকখানা, একটি খাবার ঘর। তাছাড়া সামনের লনে দুটি বাইরের ঘর। প্রতিমা তৎক্ষণাৎ আশি হাজার টাকা দিয়ে বাড়ীটি কিনে নিল।

দুদিনেই বাংলোতে আসবাবের আমদানি হ'ল, কিন্তু বেশি না। কয়েকটি সস্তা টেবিল চেয়ার সতরঞ্চি খাট ইত্যাদি। ঠিক হ'ল শ্রীমন্ত ও প্রতিমা এসে থাকবে। প্রসাদ আশীর্বাদ করলেন কিন্তু নির্মলা বললেন: এ হ'তেই পারে না। তখন প্রসাদ দুতিন দিন ধ'রে তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করালেন: নির্মলা যখন ইচ্ছা এসে থাকতে পারেন কিন্তু পুত্র পুত্রবধূর জীবন তাদের স্বনির্বাচিত পথে চলাই বাঞ্ছনীয়। যুগধর্ম, উপায় কী? বিশেষ ক'রে বৌ-রা কেউই চায় না শ্বশুর শাশুড়ীর শাসন অনুশাসন মেনে চলতে—দুঃশাসন তো নয়ই। প্রসাদ নির্মলাকে না জানিয়ে শ্রীমন্তকে একলক্ষ টাকা দিলেন স্কুলের খর্চা। তা থেকে শ্রীমন্ত বহির্বাটীতে দুটি ঘর তৈরি করল—একটি উপরতলায় অতিথিদের জন্যে। নিচের তলায় ঘরটিতে যমুনা এসে বসল পরমানন্দে। পরে আরো দুটি ঘর করা হ'ল স্কুলের জন্যে—একবৎসর পরে, আরো এইজন্যে যে, দৌড় ঝাঁপ ড্রিলে শিশুদের স্বাস্থ্যের আশ্চর্য উন্নতি হয়েছিল।

শ্রীমন্ত দুচারদিন পরে আসবাবপত্র বাড়াতে চাইল। কিন্তু প্রতিমা আপত্তি করল: "না পড়ুয়ারা দেখুক আমরা বিলাসী জীবনের ব্যবস্থা করতে স্কুল করিনি। ভারতের আদর্শ চিরদিনই বিলাসবর্জন…"ইত্যাদি।

প্রতিবেশীরা খুশী হ'ল। সত্যিই তো, মেমসাহেব এত শাদাশিদে হয়ে থাকতে পারে। যারা আগে ওকে সন্দেহের চোখে দেখত তারাও ওর মধুর ব্যবহারে, সরল হাসিতে প্রসন্ন হ'য়ে বলল বিজ্ঞস্বরে: "শ্রীমন্ত ভুল করে নি।" তারা ক্রমশ ওর আরো অনুরক্ত হ'য়ে উঠল এই জন্যে যে প্রতিমা নিয়মিত পাঠ

দিত রামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামীজির পত্রাবলী ও নিবেদিতার নানা বই থেকে। বলত সহজ ভাষায়, যেন গল্পচ্ছলে। ফলে পড়ুয়ারা সবাই ওর জয়ধ্বনি সুরু করে দিল।

কিন্তু তারপরই পড়ল নীলাকাশ থেকে বাজ: হঠাৎ থ্রম্বোসিসে তিন ঘণ্টায় প্রসাদ ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন।

শ্রীমন্ত প্রার্থনা করল গৃহবিগ্রহের পায়ে চোখের জলে: "আমার সব অপরাধ ক্ষমা কোরো প্রভু। তাঁর আত্মা যেন শান্তি পায়।

কিন্তু নির্মলার আচরণে সবাই আশ্চর্য হ'ল। সম্পদে যে-মানুষ এমন কি স্বামীর প্রতিবাদও সইতে পারত না, শোকের অন্ধকারে সে হ'য়ে উঠল শুধু অনধীর নয়, যেন আলোর অনির্বাণ শিখা। কেবল স্বামীর পায়ে মাথা রেখে একটু কাঁদল।

॥ কুড়ি ॥

অধীর হ'ল সবচেয়ে বেশি শ্রীমন্ত। বাইরে কান্নাকাটি নয় কিন্তু নিজেকে যেন গুটিয়ে নিল। এমন কি, স্কুলের কাজ থেকে ছুটি নিল দু সপ্তাহ। প্রতিমা ত্রস্ত হ'য়ে শাস্ত্রীজিকে টেলিফোনে সব জানালো। তিনি তৎক্ষণাৎ মার্থাকে নিয়ে উড়ে এলেন। মার্থা যথাবিধি নির্মলাকে নমস্কার ক'রে মেয়েকে একান্তে টেনে নিয়ে বললেন গাঢ় কণ্ঠে: "তুমি আর শ্রীমন্ত কিছুদিনের জন্যে চলো ছুটি নিয়ে। আমরা যাচ্ছি ইতালিতে, তোমরাও চলো।"

প্রতিমা টুকল: "সে হয় না মা। আমি নিবেদিতা নই জানি। কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশটি গরিব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার নিয়ে এখনই ছুটি নিতে পারি না।

শাস্ত্রীজি: কিন্তু তোমরা ফিরে আসবে তো একমাসের মধ্যেই। এখানে তোমার শরীরও ভালো যাচ্ছে না।

প্রতিমা (জোর ক'রে হেসে): একটু মাথা ঘোরে মাঝে মাঝে। রক্তের চাপ সামান্য বেড়েছে, কিন্তু ডাক্তার দাওয়াই দিয়েছেন, বলেছেন দু'দিনেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

শাস্ত্রীজি: মা, কেন লুকোচ্ছ? গীতায় বলেছে: "অশান্তস্য কুতঃ সুখম্"—ঘরে তো শান্তি নেই।

প্রতিমা: অশান্তি আর তেমন নেই বাবা। আমার শাশুড়ী অনেক

বদলে গেছেন। তাছাড়া তাঁকে নিয়েও এক মহাসমস্যা। তিনি গত দুমাস আমাদের কাছেই আছেন।

শ্রীমন্ত: নিয়ে যান কিছুদিনের জন্যে। ওর শরীরটা সত্যিই ভালো যাচ্ছে না। এদেশের গরম ওর সয় না। (হেসে) এখানে অন্তত নিবেদিতার সঙ্গে ওর মিল আছে।

প্রতিমা (হেসে): ধন্যবাদ! কেবল দুঃখ এই যে, আর কোথাও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। দর্পহারী আমাকে সাজা দিয়েছেন ভালো: ভারতবর্ষে টেনে এনে খুলে দেখালেন আমার স্বরূপ।

শ্রীমন্ত: অমন কথা ঠাট্টা ক'রেও বলতে নেই। ফী না নিয়ে গরিব ছেলেমেয়েদের পড়ায়, খাওয়ায়, দেখাশোনা করে এ-যুগে কজন? আগে আগে অনেক চিন্তামণিই বলতেন—এরি নাম ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। এখানে তাঁরাও তোমার গুণগান করছেন। আর তোমার ছাত্র ছাত্রীরা তোমায় কী বলে জানো? মা মণি। বলে: মা-র কাছেও তারা কেউ কোনোদিন এত স্নেহ পায় নি।

প্রতিমা (সগর্বে): খুশী হলাম শুনে যে ওরা সমজদার—আপনজনকে চিনেছে আপনার ব'লে। কারণ আমি ওদের সত্যিই ভালোবেসেছি—আরো এই জন্যে যে, আমার মধ্যে যে-মা এতদিন ঘুমিয়ে ছিলেন ওরাই তাঁকে জাগিয়েছে। তাই বলতে পারি, সেন্টিমেন্টাল না হ'য়ে, যে ওরা আমার কাছে যত কৃতজ্ঞ তার চেয়েও বেশি আমি কৃতজ্ঞ ওদের কাছে।

মার্থা (প্রতিমার পিঠে হাত রেখে): এ তোমারি যোগ্য কথা মা। লণ্ডনেও আমি কয়েকজন বাঙালী প্রফেসরের কাছে শুনেছি তোমার গুণকীর্তন। মা, স্কুল ভালো চালালে বিলক্ষণ লাভ হয়। কিন্তু তুমি কোনোদিনই লাভ চাও নি, চেয়েছ তোমার আদর্শের পথে চলতে, তাই পড়ুয়াদের কাছ থেকে ফী নাও নি। এ-টাকাসর্বস্ব যুগে তোমার সুর অনেকের বিজ্ঞ কানে উদ্ভট মনে হবে। তাই কেউ কেউ আমার কাছে ঠাট্টা ক'রে এমন কথাও বলেছেন যে, এর নাম আদর্শ-বাদ নয়—একটা অভিনয়—তুমি চাইছ নতুন কিছু ক'রে বড় হ'তে নিঃস্বার্থতার চটক যার গোপন স্বার্থের ছদ্মবেশে। এককথায় এ একটা pose, তার বেশি নয়।

প্রতিমা: মা, একথা ষোল আনা সত্যি না হ'লেও কিছুটা সত্যি আছে, কারণ আমি যে করার মতন কিছু করছি এই আত্মপ্রসাদকে হাজার চেষ্টা ক'রেও মন থেকে মুছে ফেলে দিতে পারি নি যেমন পেরেছিলেন নিবেদিতা।

মার্থা : নিবেদিতা নানা দিকেই অনন্যা ছিলেন, মানি মা—একশোবার। কিন্তু তাঁর মনেও যে এ-ধরণের আত্মপ্রসাদ কখনো আসে নি সাব্যস্ত করলে কেমন ক'রে ?

প্রতিমা (আতপ্ত স্বরে) : তুমি কী বলছ মা, জানো না। নিবেদিতার মন বিধাতা আদৌ সে-ধাতু দিয়ে গড়েন নি, গড়েন নি, গড়েন নি।

শাস্ত্রীজি : মা, নিবেদিতা ছিলেন মহীয়সী—কে না মানবে সসম্ভ্রমে ? কিন্তু তিনি কিছু দেবী হ'য়েই জন্মান নি—নানা সময়ে নানা ঘা খেয়ে নিজের নানা দুর্বলতার পরিচয় পেয়েছিলেন। এ আমার কল্পনা নয়। তাঁর নানা বইয়েই দেখতে পাবে—বিশেষ ক'রে তাঁর MY MASTER AS I SAW HIM-এ—যে, তাঁকেও কম ভুগতে হয় নি তাঁর নিহিত সুপীরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সের দরুণ, যার জন্যে স্বামীজি তাঁকে বারবার ধম্‌কে বলেছিলেন : "নত হ'তে শেখো, তুমি যে অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে মেয়ের চেয়ে বড় একথা মন থেকে মুছে ফেলে দাও।" (হাত তুলে) শোনো মা, আমার কথা শেষ হয় নি। কোনো মহৎ মানুষের মধ্যে খাদ ছিল একথা বললে তাঁর অন্তর্লীন সোনাকে নাকচ করা হয় না, বরং খাদকে পুড়িয়ে সে-সোনা আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে এই চমৎকার আবিষ্কার ক'রে গায়ে কাঁটা দেয়। মা, আমরা কেউই নিখুঁৎ নই, আর ঠিক সেই জন্যেই চাই নিখুঁৎ হবার অধ্যবসায়কে বরণ ক'রে আরো আন্তরিক, আরো নির্মল, আরো নিরহঙ্কার হ'তে পুরোপুরি সজাগ হ'য়ে। আমাদের শাস্ত্রে পাবে—কলি আমাদের মধ্যে উঁকি দেন, infiltrate করেন—আমাদের কোনো না কোনো অশুদ্ধির ছিদ্র দিয়ে। তাইজন্যেই অর্জুনের মতন মহাবীরকেও কৃষ্ণ তিরস্কার করতে বাধ্য হয়েছিলেন : "ক্লীব হ'য়ে হৃদয়দৌর্বল্যকে আমল দেওয়া তোমার সাজে না।"

মার্থা (হাত তুলে) : হয়েছে, হয়েছে। আমার মামণিকে অত চোখা চোখা কথা বলতে হবে না। সে হাজার বলুক না কেন সে দুর্বল, আমি মা তো, জানি—তার মতন অবলা আরো দুদশ হাজার জন্মালে এ-জগতের চেহারাই বদলে যেত। ভেবে দেখেছ কি একবার—কতশত বাধা ডিঙিয়ে তবে ও এ-দুরন্ত জগতের কাঁটাবনে পথ কেটে চলেছে ? কজন মেয়ে বা ছেলে পারে শুনি যা ও পেরেছে—যে-পারার একটিমাত্র নাম আছে : অসাধ্যসাধন ? এই যমুনা মেয়েটির কথাই একবার ভেবে দেখ না। এক লম্পট বাপের অসুস্থ মেয়ে—তাকে আশ্রয় দিতে ওকে কী বেগ পেতে হয়েছে—যার ফলে যমুনা আজ

নিজের পথ খুঁজে পেয়েছে? সকলের সঙ্গে একা লড়তে হয় নি ওকে?

প্রতিমা (কাঁদো কাঁদো স্বরে): তুমি অমন ক'রে আমার মাথা গরম ক'রে দিও না মা। একেই আমি দারুণ অহঙ্কারী রোখালো মেয়ে—কোথায় তুমি আমাকে শাসন করবে আমার চোখ খুলে দিয়ে, না তুমি ধরলে épatant, épatant épanta,-র স্বর! [বলিহারি!]

মার্থা (প্রতিমার মাথা বুকে টেনে): মা, আমি যে চাই তোমাকে আবার একটু কাছে পেতে। তুমি তো এখনো মা হও নি, তাই জানবে কেমন ক'রে—মা-র প্রাণ কিরকম অস্থির হ'য়ে ওঠে—বিশেষ লক্ষ্মীপ্রতিমা মেয়ের মুখে কালো ছায়া পড়তে দেখলে?

শাস্ত্রীজি (করুণ মাথা নেড়ে): যা যায় তা আর ফেরে না মার্থা! যে-প্রতিমাকে তুমি কাছে চাইছ সে উবে গেছে। এখন যাকে প্রতিমা বলে আদর করছ সে তোমার সেকালকার দুলালীর ছায়ামূর্তি।

মার্থা: কক্ষনো না। মাত্র একবৎসরেও ছায়া হ'য়ে গেল? মেয়ে আমার একটু আধটু বদ্‌লে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু মা-কে কি ও-ই ভুলতে পারে?

প্রতিমা মার্থার কোলে মুখ ডুবিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

শাস্ত্রীজি (ত্রস্ত): কী হয়েছে মা? মাথা ঘুরছে ফের?

প্রতিমা (মুখ তুলে): না বাবা। আমার মাথা কখনো কখনো ঘোরে বটে, কিন্তু আমার শরীর বেশ ভালোই আছে...

মার্থা: কাকে বোঝাচ্ছ মা? তোমার চোখের নিচে কালি, কথায় মিড়ে ক্লান্তি, চলতে ফিরতে টলো...

প্রতিমা: কক্ষনো না। এই দেখ (লাফ দিয়ে উঠে) আমি ছেলে-মেয়েদের রোজ ড্রিল শেখাই, ওদের সঙ্গে দৌড়ই, কখনো কখনো লেক-এ নিয়ে যাই সাঁতার শেখাতে...

মার্থা (বাধা দিয়ে): আর যা-ই কেন করো না মা, জলে নেমো না, নেমো না, নেমো না। কখন মাথা ঘুরে উঠবে...

প্রতিমা: তুমি কি পাগল হয়েছ মা? মা কানে কম শোনো আজকাল? এইমাত্র বললাম না যে, আমার মাথা ঘোরে কালে ভদ্রে? তবে এ-বৎসর গরমটা একটু বেশি পড়েছিল কিনা...

মার্থা : তাই তো বলছি মাসখানেক ছুটি নিয়ে ইতালিতে বিশ্রাম নিতে। চাঙ্গা হ'য়ে ফিরে এসে ফের কাজ সুরু কোরো। কী বলো শ্রীমন্ত? একেবারে বোবা ব'নে গেলে কেন? তোমার কি মনে হয় না ওর একটু বিশ্রাম দরকার?

শ্রীমন্ত : হয় মা। আমি ওকে কদিন থেকে বলছি শিলং যেতে আমার সঙ্গে। ও বলে : পাহাড় ওর মন টানে না। বললাম স্টীমারে বা বজরায় তেজপুর থেকে ডিব্রুগড় যেতে। কী সুন্দর দৃশ্য মা? তোমরাও কেন চলো না।

মার্থা (শাস্ত্রীজীকে) : কী বলো?

শাস্ত্রীজি : প্রশ্ন হচ্ছে···বেয়ান কী বলেন?

শ্রীমন্ত : তবেই তো ফাঁশালেন আপনি। তিনি এত অবসন্ন হয়ে পড়েছেন যে কোথাও নড়তে চান না—এমন কি, গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে চান না। বিধবা হবার পর থেকে তিনি কেমন যেন অন্য মানুষ হ'য়ে গেছেন। খাওয়া দাওয়া ঘরসংসার কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারেন না।

মার্থা (ভাবিত) : তাই তো! তাহ'লে কী করা যায়?

শ্রীমন্ত : আমি ঠিক করেছিলাম তাঁকে যমুনার তদারকে রেখে প্রতিমাকে নিয়ে যাব আসামে শরীর সারতে। এতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু সেখানেও আমার মন খুঁৎ খুঁৎ করে। তাঁর এ-অসহায় অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে নৌকাবিহার করা কি ঠিক হবে?

মার্থা : এ তোমার অন্যায়, শ্রীমন্ত! তোমার মা-র দুঃখ আমি যে বুঝি না তা নয়। কিন্তু তাঁর জীবন একটানা সুখে সম্পদেই কেটেছে, সংসারে সর্বময়ী হ'য়ে আনন্দও পেয়ে এসেছেন চল্লিশ বৎসর ধ'রে। কিন্তু যিনি ছিলেন এ-আনন্দের কেন্দ্র তিনি প্রস্থান করলে আর কেউ কি তাঁর স্থান নিতে পারে কখনো? নিয়তিকে ঠেকাবে কে? বহুবৎসরের সহবাসের পরে হঠাৎ বিয়োগ—ঘা খেতে হবেই। তাই ব'লে কি আশপাশের সকলেই মনমরা হ'য়ে থাকতে পারে, না থাকা উচিত?

শ্রীমন্ত (ভেবে) : আপনার একথা ঠিক মা। আমাকে প্রতিমার কথাও ভাবতে হবে।

শাস্ত্রীজি (প্রসন্ন) : সাধু সাধু! কর্তব্য কি শুধু মা-রই প্রতি? না স্ত্রীর কথা কম জরুরি?

শ্রীমন্ত : মা-র কাছে একদিন সন্তর্পণে এ-প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। তিনি রাজী আছেন এখানে থাকতে, আমরা আসামে গেলে। কিন্তু স্কুল?

মার্থা : স্কুল চালাবার ভার আমি নিলাম, তোমার বাবাকেও নিতে বাধ্য করব। তোমরা দুজন ঘুরে এসো।

প্রতিমা (সাশ্রুনেত্রে) : মা, সত্যিই সংসারে মা-র তুলনা নেই।

শাস্ত্রীজি (হেসে) আর বাপ বেচারা? শুধু হুকুমবরদার? (সকলের কলহাস্য)

॥ একুশ ॥

তাই স্থির হ'ল : মার্থা প্রতিমার কাছে তালিম নিলেন কী ভাবে শিশুদের লেখাপড়া শেখাতে হবে। খেলাধুলো-পরিচালনার ভার নিলেন শাস্ত্রীজি। পড়াশুনোরও কিছু কিছু।

এই সময়ে এক দৈব যোগাযোগ হ'য়ে গেল : নির্মলার এক সখীর ছেলে পনেরো বৎসর আগে হিমালয়ে এক গুরুর কাছে যোগসাধনার দীক্ষা নিয়ে তাঁকে কখনো কখনো লিখতেন গুরুদেবের কথা নির্মলা জানতে চাইতেন ব'লে। তিনি এসে নির্মলার আতিথ্য গ্রহণ করলেন। প্রতিমা খুশী হ'য়ে তাঁকে বহির্বাটীতে দোতলার ঘরে রাখল। তাঁর নাম মুক্তানন্দ। তিনি প্রতিমাকে দেখে এক আঁচড়েই চিনে নিলেন অনন্যা ব'লে।

প্রতিমা বলল : "আপনি থাকুন এখানে সাধুজি, আমি মাসখানেক বাদে ফিরে আপনার কাছে সংস্কৃত পড়ব। অল্প একটু জানি কিন্তু দেবভাষায় সত্যিকার দীক্ষা হয় নি এখনো।" সাধুজি প্রতিমাকে আশীর্বাদ ক'রে বললেন : "বেশ, আমি এখানে তিনমাস থাকব।"

প্রতিমা : না, অন্তত ছমাস।

সাধুজি : (হেসে) সে হবে, আপনি এলে দেখা যাবে। আমি কবে কোথায় যাব তার স্থিরতা নেই, জন্ম-যাযাবর তো।

॥ বাইশ ॥

প্রতিমা শ্রীমন্তের সঙ্গে প্রস্থানের পর মুক্তানন্দ শাস্ত্রীজিকে বললেন তিনিও স্কুলের কাজের কিছু ভার নেবেন—কর্মযোগ হ'ল যোগের মতন যোগ…

ইত্যাদি। শাস্ত্রীজি খুশী হ'য়ে শ্রীমন্তকে লিখলেন গৌহাটির এক বন্ধুর ঠিকানায়: "মুক্তানন্দ চমৎকার পড়ান ছেলেমেয়েদের, তারাও তাঁকে খুব ভালোবেসে ফেলেছে, ডাকে 'সাধুদা'। তিনি তাদের আরো মন টানলেন আসন শিখিয়ে। মেয়েদের তিনি শেখান না, তবে দেখে দেখে যমুনা কয়েকটি আসন শিখে মেয়েদের শেখায় ··ইত্যাদি।

শ্রীমন্ত মা-কে যমুনার হেপাজতে রেখে গেলেও একটি বয়স্কা নার্সকে মোতায়েন ক'রে গিয়েছিল মা-র দেখাশুনো করতে। সেই সঙ্গে তাকে ব'লে গিয়েছিল দুদিন অন্তর মা-র খবর দিতে তার গৌহাটির বন্ধুর ঠিকানায়।

* * *

গৌহাটিতে ওরা একটি চমৎকার বড় বজরা পেয়ে গেল। অগ্রিম মোটা বকশিশ পেয়ে মাঝি বলল: "আমি খুব ভালো রাঁধি—আর এমন রান্না নেই যা আমার অজানা···ইত্যাদি।"

চলল বজরা কখনো মন্দাক্রান্তা ছন্দে, কখনো তর তর ক'রে পাল তুলে। প্রতিমার মন আনন্দে রঙিন হ'য়ে উঠল। কী সুন্দর দৃশ্য! মনে প'ড়ে গেল শাস্ত্রীজির কাছে কালিদাসের রঘুবংশ পড়া:

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমাল তালীবনরাজিনীলা···এখানে ওখানে পাল তুলে চলেছে ছোট বড় ডিঙি বা নৌকোয় জেলেদের দল। থেকে থেকে এক একটা স্টীমার তাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় ঠাট্টার ধূমোদ্গার ক'রে। তার পরেই ডিঙিগুলো নাচে, নৌকোগুলো দোলে। সময়ে সময়ে, স্টীমার বেশি বড় হ'লে, তার আশপাশের ঢেউয়ে ওদের বজরাও একটু আধটু শিউরে ওঠে। কখনো এক ঝাঁক মাছরাঙা পাখী জলের উপর দিয়ে উড়ে যায়—প্রায় জল ছুঁয়ে—ছোঁ মেরে মাছ ধরতে। "ঐ দেখ," বলে শ্রীমন্ত, "কী আমুদে শাহজাদার দল—চলেছেন নর্তকী বারুণী হার্মোনিয়ম নিয়ে। গানও গাইছে নটীরা শুনতে পাচ্ছ?" কখনো, যখন সান্ধ্য আলোকে ব্রহ্মপুত্রের জল ইন্দ্রনীল রঙে রঙিয়ে ওঠে, শোনা যায় বাঁশির তানে আসামের স্নিগ্ধ ভাটিয়ালি সুর, কখনো বা কোনো মাঝির মুখে শোনা যায় অসমিয়া সরল লোকসঙ্গীত—ভাষাটা পুরো ধরতে পারে না, কিন্তু সুর নিছক বাংলা বাউলের যার সম্বন্ধে লিখেছিলেন কবি অতুলপ্রসাদ:

কী জাদু বাঙলা গানে! গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা!

শুনতে না শুনতে, আশ্চর্য, প্রাণে বেজে ওঠে অনাদি অশেষ জলের সুর—ছল ছল ছলাৎ, সেই সঙ্গে দাঁড় তাল দেয় কল কল কলাৎ…যে উঠছে আর যে পড়ছে উভয়েরি সুর যেন একই ছন্দে বাঁধা। ভাষা দিয়ে এ রহস্যের তল পাওয়া যায় না, কিন্তু মন তাঁর দেয়:

> পেয়েছি রে পেয়েছি—যাকে ভালোবেসেছি,
> যায় না রে ধরা যাকে তবু গান গেয়েছি
> সে-অধরা মহিমার যার ছোঁয়া চেয়েছি।

হেঁয়ালি? তথাস্তু—কেবল, বিশ্বের কোন্ প্রকাশটা হেঁয়ালি নয়?

প্রতিমার স্বাস্থ্য ফিরে এল দু সপ্তাহের মধ্যেই। দেরি হবে কেন? আনন্দের চেয়ে বড় দাওয়াই কি আছে এ-জগতে? আর যেমন তেমন আনন্দ তো নয়—প্রেম হাসি কবিতা গান—সবার উপর, প্রকৃতির মোহিনী মূর্তি যে মোহের অন্তে অবসাদ নেই। আর কত রকম সাজ প্রসাধন তাঁর! সকালে হাসির কলধ্বনি, দুপুরে চোখ-ধাঁধানো আলো অথচ জলের সঙ্গে কী স্নিগ্ধ মিতালি! বিকেলে অস্তালোকে নদীর আর এক মূর্তি—বিদায় নিয়েও বিলম্ব করা রঙের পর রঙ চড়িয়ে, মাখিয়ে, বদ্‌লে। সময়ে সময়ে সে-রাঙা আলোয় নদীর জল যখন ঝিকমিক ঝিকমিক ক'রে ওঠে তখন মনে হয় যেন এক দৈবী প্রভার কাঁপন। রাতে চুম্‌কি তারাকাটা ওড়না-পরা আকাশ যেন ওদের নীরব ভাষায় আশীর্বাদ করতে থাকে ভাষার স্নেহস্পর্শের জুড়ি হ'তে চেয়ে। কয়েক দিন বাদে তৃতীয়া-চতুর্থী পঞ্চমীর বাঁকা চাঁদের একদল হাল্কা মেঘের সঙ্গে রকমারী লুকোচুরি—এ-সৌন্দর্য আভাষ দেয় কার? মানুষের অন্তরের সুষমার, যেমন গোলাপ আভাষ দেয় অন্তরের এক ফুলবাগানের। যদি অন্তরে এ-বাগান না থাকত তবে বাইরের বাগান গ'ড়ে উঠত কার ইঙ্গিতে? স্বপ্ন তার নানা রঙ নিয়ে আমাদের মন দোলাত কি যদি সে-দোলনায় কল্পনা না দুলত তালে তালে, রঙ্গে বিভঙ্গে? তাই স্বপ্নকে "নেই" ব'লে নামঞ্জুর করবে কোন্ বাস্তববাদী! "না না না," বলে প্রতিমা শ্রীমন্তের বুকে মাথা রেখে, "না, স্বপ্ন আসলে আগমনীর গান। তাই বলে আমাদের নিত্যানিয়তই: ওরে আমি হঠাৎ বাস্তব জাগরণে এলে তোরা বিশ্বাস করতে পারবি না ব'লেই আমি আসি প্রথমে ঘুমের ঘোরে…আদর্শ অধরা নয়, যাকে ধরা যায় তারি প্রস্তুতি।"

॥ তেইশ ॥

মাসখানেক ধ'রে কাটল এই স্বপ্নকে জাগরণে দেখার আনন্দে। প্রতিমা বলল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে : "আইল অফ ওয়াইট-এ নয় শ্রীমন্ত, এখানে—আসামেই —আমাদের সত্যিকার মধুচন্দ্র-উৎসব হয়েছে।" শ্রীমন্ত বলল, "সত্যি কথা। আর কেন—বলব? সৃষ্টি প্রথম জেগে'ছিল স্থলের কোলে নয়- জলের কোলে। আর সে-কোলের মধ্যে প্রথম পেয়েছি তোমার কোলের পূর্ণ স্বাদ। কিন্তু—not to pine for what is naught—এবার ফিরবার সময় এল।" প্রতিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: "ফিরব তো বটেই—ভবিতব্য। তবে আর দুদিন সবুর করো—শিলংকে একবার ছুঁয়ে যেতে চাই, নইলে মান থাকবে না।" শ্রীমন্ত সায় দিয়ে ডিব্রুগড়ে একটি হোটেলে উঠে খোঁজ নিতে গেল বিমানঘাঁটিতে বিমানে শিলং-প্রয়াস সম্ভব কিনা। যদি সম্ভব না হয় তবে কলকাতা? উত্তর মিলল: কলকাতার প্লেন কয়েক ঘণ্টায় পৌঁছায়, শিলং-এ এখনো প্লেন যায় না।

শ্রীমন্ত ডাকঘরে গিয়ে তিনটি চিঠি পেল : মা-র, মুক্তানন্দ স্বামীর আর শাস্ত্রীজির।

হোটেলে ফিরে প্রতিমার পাশে ব'সে সে প্রথম খুলল মা-র চিঠি। দুজনে পড়ল :

বাবা শ্রীমন্ত!

তেজপুর থেকে তোদের চিঠি পেয়েছি। তোরা আনন্দে আছিস, বৌমারও শরীর সারছে—এ সবই ঠাকুরের কৃপা, বাবা। কিন্তু বাবা, আমার এখানে আর ভালো লাগছে না। আমার এক বিধবা মাসিমা কাশীতে আছেন গঙ্গাতীরে শিবালয়, তিনি ডেকেছেন। শেষ জীবনে কাশীবাস সব দিক দিয়েই ভালো। সংসার তো দেখলাম। কিছুই থাকে না। আমার শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। বুক ধড়ফড় করে, চোখে ঝাপসা দেখি, চলতে পা কাঁপে, কখনো কখনো মাথাও ঘোরে। তা বয়েস হ'ল তো—সত্তর পেরিয়ে একাত্তরে পা দিয়ে'ছি- জরার আর দোষ কী বল্? তাছাড়া এজন্যে আর দুঃখও নেই। মুক্তানন্দজি আমাকে একটি শিবমন্ত্র দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে একটি রুদ্রাক্ষের মালা। রোজ পঞ্চাশবার মালা ফিরিয়ে সকালে একটু দুধ আর ফল খাই। রাতে উপোস। দুপুরে দুটি অন্ন মুখে দিই, ব্যস। কিন্তু

এমন অরুচি হয়েছে···ডাক্তারেরা বলছেন ইঞ্জেকশন নিতে। কিন্তু গুরুদেব প্রায়ই বলেন হেসে: 'ডাক্তারের হাতে পড়া মানে কুমোরের চাকে পড়া—কেবল ঘুরতে ঘুরতেই প্রাণ যাবে এক রোগের ডাক থেকে আর এক রোগের ডাকে।' সেদিন আরো বলছিলেন: 'ঔষধং জাহ্নবীতোয়ো বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ।' আমি কাশীর গঙ্গাজলই পান করব আর ডাকব নারায়ণ বৈদ্যকে অর্থাৎ সদাশিবকে। একথা বলছি প্রসন্ন মনেই বাবা, তোর আর বৌমার মঙ্গল কামনা ক'রে। আমার ভাগ্য ভালো যে, এমন দেবকুমার গুরু পেয়ে গেছি। আমি বড় কান্নাই কেঁদেছিলাম সদ্‌গুরুর জন্যে। যাকে তাকে তো আর গুরুবরণ করা যায় না বাবা! স্বামী মুক্তানন্দ গুরুর মতন গুরু। ওঁর মন তো নয়—যেন গঙ্গাজল। বহুভাগ্যে মিলেছে এমন গুরু। তোরাও তাঁর কাছে দীক্ষা নিলে নিশ্চিন্ত হতাম। তবে তিনি বলেন: কার গুরু কিনি জানেন এক আদিগুরু সদাশিব। তবে তোদের ভাগ্য ভালো যে, তোদের বাড়ীতে তিনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন। বৌমাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন তবে বলেন: তার এখনো গুরুবরণের লগ্ন আসে নি। তোর সম্বন্ধেও ঐ কথা। যাই হোক তোরা সাত তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস নি আমার জন্যে। আমার ভার গুরুদেবকে দিয়েছি, (যদিও ঠিক জানি না তিনি নিয়েছেন কি না) আর স্কুলের ভার নিয়েছেন তো তোর শ্বশুর শাশুড়ী। তাঁদের সঙ্গে আমার বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ হয় না, তবে গুরুদেব বলেন: স্কুল তাঁরা ভালোই চালাচ্ছেন। আর হ্যাঁ, সম্প্রতি গুরুদেব দশবারোটি ছেলেমেয়েদের সংস্কৃত শেখানো সুরু করেছেন। বলেন: দেবভাষা প্রত্যেকেরই শেখা উচিত। কেবল যমুনার কাছে শুনলাম তারা সংস্কৃত শিখতে চায় না, চায় ইংরাজী শিখতে। তুই এসে ওদের পটিয়ে সংস্কৃতর দিকে মুখ ফিরিয়ে দিস। তবে এ আমার অনধিকার-চর্চা।

তোর অনেক সময় নিলাম বাবা—যা মনে আসে লিখে গেলাম। চিরদিন মুখহল্‌সা তো। তবে বলা রইল—তোদের পড়তে ভালো না লাগলে নদীর জলে ফেলে দিস, আমি কিছু মনে করব না।

তোরা আমার আশীর্বাদ নিস। একটি নাতির মুখ দেখে কাশী যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে-ও তো অদৃষ্টের কথা। সদাশিব যা ঠিক করবেন তাই তো হবে বাবা! আমরা কি কিছু পারি, না করি?

তোর মা

॥ চব্বিশ ॥

প্রতিমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল : "সাধুজি দেখছি তোমার মাকে ঢেলে সাজিয়েছেন। তিনি কি শঙ্করপন্থী ?"

শ্রীমন্ত : জানি না। তবে শুনেছি তিনি নাকি স্বপ্নে দীক্ষা পেয়েছিলেন। মরুক গে। তোমার বাবার হস্তাক্ষর দেখছি। পড়ো। (দুজনে পড়ল)

মা

প্রতিমা,

তোমাকে চিঠি লিখছি দুটি কারণে। প্রথম, তোমার শরীর সেরেছে শুনে তোমাকে জানাতে তোমাদের তাড়াতাড়ি ফিরবার দরকার নেই। স্কুল বেশ উজিয়েই চলেছে তরতর ক'রে—পড়ুয়াদের সংখ্যাও বেড়েছে। দ্বিতীয়, এইটি বলতেই একটু কুণ্ঠা জাগছে মা, কিন্তু মার্থাও বলল তোমাকে লেখা ভালো। ব্যাপারটা এই যে, যমুনা একটু বেশি ঝুঁকছে মনে হয় মুক্তানন্দজির দিকে। তিনি ওকে ঠিক কী চোখে দেখেন বলতে পারি না, কিন্তু যমুনা ক্রমশ কেমন যেন আনমনা হ'য়ে পড়ছে—সকলেরই চোখে পড়ছে। মার্থা একদিন হঠাৎ ওর ঘরে ঢুকে দেখে ওর চোখ ফোলা। সে বলে—কিছু না, সে সব তার কাছেই শুনো। আমার বক্তব্য এই যে, যমুনা আজকাল প্রায়ই ক্লাস নেয় না মাথাধরার অজুহাতে। উপস্থিত মার্থা ওর বদলি হয়ে গুরুগিরি করে। কিন্তু আমার মনে হয় তোমরা মুক্তানন্দজিকে খোলাখুলি একটা চিঠি লিখলে মন্দ হয় না। শুনলাম তিনি ওকেও শিবমন্ত্র দিয়েছেন। তাই তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারো—যমুনার শরীর খারাপ হয়েছে কিনা। মানে, গুরুকে শিষ্যার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করাটা অশোভন হবে না।

আর একটু আছে। তোমার মা-র আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে। খুব শান্ত, স্নিগ্ধ। তবে নিজের ঘরেই থাকেন। একবার মাত্র আসেন দুপুরে আমাদের খাওয়ার সময়ে—জিজ্ঞাসা করতে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না।

তোমরা কবে আসবে শুধু এইটুকু জানিও, ব্যস। আমাদের স্নেহ তো রইলই।

তৃতীয় চিঠিটির খামের উপর লেখা হস্তাক্ষর দেখে শ্রীমন্ত খামটা তুলিয়ে বলল: "বলো ত কে লিখেছে?"

প্রতিমা: আমি কি ভেল্কি জানি?

শ্রীমন্ত: তবু··

প্রতিমা: বিরক্ত কোরো না। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার! খাম খুললেই তো সব জলের মতন সাফ হয়ে যাবে।

শ্রীমন্ত: তা ব'লে আন্দাজ করতে বাধা কি?

প্রতিমা: তুমি ভারি নাছোড় প্লাস আবদেরে। (একটু পরে) আমার মনে হয় সাধুজি লিখেছেন, আর আরো বলব? লিখেছেন খুব সম্ভব যমুনার সম্বন্ধেই।

শ্রীমন্ত: দূর্!

প্রতিমা: দূর্ কেন? এইমাত্র বাবার চিঠিতে পড়লে না যমুনার বিমনা ভাবের কথা?

শ্রীমন্ত: সে তো তার বাবার জন্যেও হ'তে পারে··কোথায় হয়ত ফের কী বেলেল্লামি করেছেন।

প্রতিমা: যমুনা তার বাপের জন্যে লজ্জাই পায়। কতবার বলেচে আমাকে—কিন্তু মরুক গে, পড়ো।

শ্রীমন্ত (খামটি খুলে): তুমি ঠিক বলেছ—সাধুজিই বটে।

দুজনে পড়ে সাগ্রহে:

প্রিয়বরেষু,

আপনাদের এখানে আমি দিব্যি আরামে রাজার হালে আছি, কিন্তু সেজন্যে মৌখিক ধন্যবাদ দিয়ে আপনাদের স্নেহের অমর্যাদা করতে বাধে। এ-চিঠি আপনাকে লিখ্‌ছি আমি একটি বিশেষ কারণে।

শাস্ত্রীজি আমাকে বললেন তিনি আপনাকে লিখেছেন যমুনার কথা। আমি গুরুটুরু কিছু নই। তবু আমি তাকে মন্ত্র দিয়েছিলাম সে শান্তি চেয়েছিল ব'লে—যেমন আপনার মাতৃদেবীকেও দিয়েছিলাম কিন্তু আপনার মাতৃদেবী শান্তির আভাষ পেলেও যমুনা পেল না তার ভাবান্তরের জন্যে। সে-সম্বন্ধে আমি কিছু লিখতে চাই না, কারণ যমুনা প্রতিমা দেবীকে খুব সম্ভব লিখেছে। লিখুক বা না লিখুক, যেহেতু আমি তার এ-ভাবান্তরের জন্যে কতকটা দায়িক

সেহেতু আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে উধাও হ'তেই হবে। উপস্থিত আমি এর বেশি কিছু বলতে চাই না।

আমি ভেবেছিলাম—আপনারা ফিরলে তবে ফের নিরুদ্দেশ-যাত্রা শুরু করব। তবে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?— আমি দুতিন দিনের মধ্যেই উধাও হব দেবতাত্মা হিমালয়ের কোল পেতে। এবার ইচ্ছা আছে অমরনাথ যাবার—যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ তুষারশিবের পা ছুঁয়ে ইচ্ছামৃত্যু বর পেয়েছিলেন। আপনারা "র‍্যাশনালিস্ট" হয়ত এসব রূপকথা মনে করেন—জানি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি—আরো এই জন্যে যে একথা লিখেছেন স্বয়ং নিবেদিতা—যাঁর এজাহার অপ্রতিবাদ্য। আর একটা কথাঃ আমার আরাম এখানে বিলাসের কোঠায় উঠেছিল। আরাম ভালো কিন্তু বিলাস নয়। ইতি।

আপনাদের স্নেহ-ঋণী

॥ পঁচিশ ॥

উভয়েই নিশ্চুপ। প্রথমে প্রতিমা মুখ তুলল।

শ্রীমন্ত: কী? ভেবে কিছু কূল কিনারা পেলে?

প্রতিমা: কূল না পেলেও কিনারা—টেলিফোন। আমাদের এক্ষণি ফেরা দরকার।

শ্রীমন্ত: যমুনার জন্যে?

প্রতিমা: হুঁম্।

শ্রীমন্ত: কিন্তু সে কি তোমার কাছে কিছু ভাঙবে মনে করো?

প্রতিমা: ভাঙবেই ভাঙবে, কেবল মুক্তানন্দজি প্রস্থান করার পরে।

শ্রীমন্ত: ভাষ্য?

প্রতিমা: তাও বলতে হবে? উনি যতদিন এখানে থাকবেন যমুনা আশা কুহকিনীকে আঁকড়ে ধ'রে থাকবেই থাকবে।

শ্রীমন্ত: কিন্তু মুক্তানন্দজির মতন জন্মবৈরাগীর মন যমুনার দিকে ঝুঁকবে এ-দুরাশাকে কি আশা বলা চলে?

প্রতিমা (হেসে): তুমি নাবালকই র'য়ে গেলে। মুক্তানন্দজির সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি বলো তো—মানে data? আর বৈরাগীদের পুনর্মূষিক

হ'তে কি কখনো দেখা যায় নি ইতিহাসে বা পুরাণে?—না, আমি ঠাট্টা ক'রে এ-উপমা দিই নি। তবে আমার একটা সাংঘাতিক ভুল হয়েছিল: সাধুজি ও যমুনাকে এক বাড়ীতে রেখে আসাটা আমার উচিত হয় নি। আমার বাবার কথাই ধরো না। তিনি স্বভাব বৈরাগী ছিলেন না বটে, কিন্তু দেশকে ভালোবাসতেন মনেপ্রাণে। শাস্ত্র চর্চা ক'রেও কম প্রেরণা পান নি ব্রহ্মচর্যের। এ হেন ভারিক্কি মানুষ এক বিদেশিনী মোহিনীকে দেখে বহুদিনের সংস্কার সংকল্প বংশ রুচি সব কিছুকে বাতিল ক'রে র'য়ে গেলেন ইংলণ্ডে দেশছাড়া হ'য়ে। শ্রীমন্ত, আমি নিজে মেয়েছেলে, তাই আর কিছু জানি বা না জানি এটুকু জানি যে, ছেলেরা কোনোদিনই মেয়েদের জানে না তাদের স্বরূপে। হয় তাদের বাড়িয়ে দেবী পদবী দেয়, না হয় ধ'রে নেয় যে তারা ছলনাময়ী, ফাঁদ পাততেই আছে। এ দুটি কল্পনাই অসত্য। সত্য হচ্ছে এই যে, মেয়েরা মেয়ে তাই তাদের মধ্যে যেমন মেয়েলি দুর্বলতা আছে তেমনি নানা মেয়েলি সাজ সরঞ্জামও আছে যাদের দৌলতে কমনীয়াও হ'তে পারে মহনীয়া, কাজেই বরণীয়াও বটে।

শ্রীমন্ত (হেসে): ঝোঁকের বশেও এভাবে মুখোষ খুলে ফেলতে নেই প্রতিমা। তবে মেয়েলি নানা কমনীয়া দুর্বলতা সত্ত্বেও আমি মেয়েদের বরণীয়া মনে করি—ভবিষ্যতেও করব, অন্তত ততদিন যতদিন তুমি বিমনা হ'য়ে আমাকে তালাক দিয়ে প্রস্থান না করবে কোনো মহামুক্তানন্দ স্বামীকে পাকে ফেলতে।

প্রতিমা (আতপ্ত কণ্ঠে): এ চটুলতার সময় নয়—যমুনার আজ শিরে সংক্রান্তি, মনে রেখো।

শ্রীমন্ত: রাখব গো রাখব, কারণ আমি তো অন্তত বিমনা হই নি। তাছাড়া তাকে আমরাই টেনে এনেছি আমাদের এলাকার মধ্যে। তবে (ভেবে) সব আগে মুক্তানন্দজিকে একটু বাজিয়ে দেখতে চাই তিনি জন্ম-বৈরাগী না জন্মভীরু।

প্রতিমা: না শ্রীমন্ত। তিনি বিবেকানন্দ স্বামী না হ'লেও খাঁটি বৈরাগ্যানন্দ স্বামী। তবে কি জানো? জন্মবৈরাগীও বিবাহ করলেই যে রাতারাতি সংসারী হ'য়ে পড়বেন এমন কোনো কথা নেই। তাছাড়া যদি সত্যি ভালোবাসা আসে তবে সে-ই হ'য়ে দাঁড়ায় অভয়দাতা, মানে সংসারের কান্না-কাটি সত্ত্বেও সাধক ভগবানকে ডাকাডাকি করতে পারে। এ শুধু আমার

কল্পনার যদি-বাদ নয়। আমার বাবাকে চাক্ষুষ করেছি তো। তিনি বৈরাগী সন্ন্যাসী নন ব'লেই যে ভগবানের করুণা হারিয়ে একেবারে ভক্তির জ্ঞানের কোঠায় দেউলে হ'য়ে হাহাকার করছেন একথা তো সত্যি নয়। আমার অনেক সময় এমন কথাও মনে হয়েছে যে, যারা প্রথম জীবনে নিটোল ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা পায় তারা পরে বাইরে গৃহস্থী হ'লেও অন্তরে সাধকই থাকে। (থেমে) এ আমার ছোটমুখে বড় কথা, তাই তোমাকে বাবার দরবারেই পেশ করব—তিনি তাঁর প্রাঞ্জল ভাষায় বলবেন যা আমি বলতে চেয়েও গুছিয়ে বলতে পারছি না। কিন্তু উপস্থিত আমিও চাই মুক্তানন্দজির গহন মনের তল পেতে—যদি পারি।

শ্রীমন্ত : পারলে কী করবে শুনি ?

প্রতিমা : আদিপর্ব শেষ হ'লে সে-উদ্যোগপর্বের অবতারণা করা যাবে—যদিও শান্তিপর্বের হদিশ পেতে এখনো অনেক দেরি। (গাঢ় কণ্ঠে) আমার সত্যি যমুনার জন্যে মন কেমন করছে। চলো ফিরে যাই কলকাতা। এই যে টেলিফোন : হ্যা লো ! Calcutta Please, number···(শ্রীমন্তকে) ধরো।

শ্রীমন্ত (টেলিফোনে) : হ্যা লো !

স্বর : একটু সবুর করুন···

* ············ *

স্বর : পেয়েছি, ধরুন।

শ্রীমন্ত : হ্যা লো !

স্বর : কে ?

শ্রীমন্ত : আমি শ্রীমন্ত, ডিব্রুগড় থেকে কথা কইছি। আপনার চিঠি এইমাত্র পেয়েছি। আমরা আজই উড়ে ফিরছি—বোধ হয় বিকেলে কলকাতা পৌছব।

শাস্ত্রীজি : বেশ বেশ। মুক্তানন্দজিও খুশী হবেন।

॥ ছাব্বিশ ॥

দমদমে বিমান ঘাঁটিতে নামতেই শাস্ত্রীজি প্রতিমাকে জড়িয়ে ধ'রে একগাল হেসে বললেন: "মুখে ফের সেই গোলাপী আভা ফুটেছে রে! বলি নি?"

মার্থা (মেয়েকে আলিঙ্গন ক'রে): কী যে আনন্দ হচ্ছে তুই সেরে উঠেছিস ব'লে!

প্রতিমা: শ্—শ্! সেরে উঠেছি? আমার অসুখ হ'ল কবে শুনি? কিন্তু সে যাক, যমুনার খবর কি বলো।

মার্থা: সে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। তাকে আমার পাশের ঘরে এনে রেখেছি।

প্রতিমা: এ না হ'লে মা! আমিও ঠিক ঐ কথাই বলছিলাম শ্রীমন্তকে: যে, ওকে মুক্তানন্দজির নিচের ঘরে রেখে আমি মস্ত ভুল করেছিলাম।

শাস্ত্রীজি: তিনিও ঠিক এই কথাই বলেন। বলতে কি, কতকটা এই জন্যেই তিনি চ'লে যেতে চাইছেন।

প্রতিমা: তাঁরও মন একটু টলেছে না কি?

শাস্ত্রীজি: অতটা বলা চলে না। তবে বলেন—এমন সুশীলা সুভদ্রা মেয়ে তিনি বেশি দেখেন নি নব্যাদের মধ্যে।

শ্রীমন্ত: এরি মধ্যে জট পাকালো কেমন ক'রে?

শাস্ত্রীজি: না, জটের প্রশ্ন ওঠে না। তবে সন্ন্যাসীরাও মানুষ তো। আর রূপ গুণের জুড়িগাড়ি মন না টানে কার?

মার্থা: কী যে বলো! যমুনাকে উনি স্নেহ করেন সত্যিই। কিন্তু ওঁর দৃষ্টির মধ্যে দূষ্য আমি কিছুই দেখি নি।

প্রতিমা: কিন্তু যমুনার···

মার্থা: পরচর্চা আমি ভালোবাসি না—তুমি জানো। তাছাড়া···

শাস্ত্রীজি: জল্পনা কল্পনা এখন থাক—চলো বাবা, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে।

ওরা সবাই শ্রীমন্তের বড় মোটরে উঠে বসে।

॥ সাতাশ ॥

শ্রীমন্ত প্রতিমাকে নিয়ে সব প্রথম মুক্তানন্দজির ঘরে গিয়ে তাঁকে যথাবিধি প্রণাম ক'রে আসন নিল দুজনে দুপাশে।

মুক্তানন্দ (হাসিমুখে) : শুনেছিলাম আপনারা শিলং যাবেন ?

শ্রীমন্ত : যাওয়া হ'ল না আপনার জন্যেই। আপনি হঠাৎ চ'লে যাচ্ছেন এ বড় দুঃখের কথা।

মুক্তানন্দ : চ'লে যাচ্ছি বলবেন না। যেতে হচ্ছে।

শ্রীমন্ত : কেন ? আপনার সঙ্গে একটু খোলাখুলি কথা বলতে চাই—অবিশ্যি যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

মুক্তানন্দ : গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন যে ব্রহ্মচারীর জীবন এমন হবে যে, কোনো কিছুই যেন তাকে লুকোতে না হয়—এক সাধনার সম্পর্কে ছাড়া।

শ্রীমন্ত : কিন্তু জীবন থেকে কি সাধনাকে একেবারে আলাদা করা যায় সাধুজি ? আপনি যেজন্যে চ'লে যাচ্ছেন সেটা সাধনার সমস্যা ব'লেই যে জীবন থেকে লক্ষ যোজন দূরে তা তো নয়।

মুক্তানন্দ : আমি চ'লে যাচ্ছি ঠিক কী জন্যে জানেন না তো আপনারা কেউই ?

শ্রীমন্ত (আশ্চর্য) : আপনি নিজেই আভাষ দেন নি কি ,

মুক্তানন্দ : শুনুন তবে খুলেই বলি। গুরুদেব আমাকে ব'লে দিয়েছিলেন একটা কথা যা আমি পুরোপুরি মেনে চলি নি ব'লেই আমার···মানে এই জট পাকিয়েছে। কিন্তু আপনারাও ভালো করেন নি যমুনাকে একলা আমার কাছে রেখে চ'লে গিয়ে।

প্রতিমা : কিন্তু আপনি তো মুক্ত পুরুষ সাধুজি ! আপনার ভয় কি ?

মুক্তানন্দ : আমি মুক্ত পুরুষ কে বলল ? মানি, গুরুদেবের কৃপায় আমি এমন কিছু পেয়েছি যা হাটবাজারে বিকোয় না। কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই আমার আরো বেশি সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীমন্ত : কেন ? যত এগুবেন ততই তো বেশি শক্তি সঞ্চয় করবেন। করেন নি কি ?

মুক্তানন্দ : এবার আপনি সাধনার অন্দরমহলের খবর চাইছেন। তাই আপনার এ-প্রশ্নের উত্তর দেব না, কেন না দিলে আপনি ভুল বুঝবেন। শুধু বলি—যেকথা গুরুদেব বারবার বলতেন—সাধনায় এগুলে মনের জোর বাড়ে একথা সত্যি হ'লেও একথাও সমান সত্যি যে, মানুষ যতই উঁচুতে ওঠে ততই তার বেশি সাবধান হওয়া চাই—শুধু এইজন্যেই নয় যে, বেশি উঁচু থেকে পড়লে বেশি আঘাত লাগে, এজন্যেও বটে যে, বেশি শক্তি সঞ্চয় করলে বাধা বিরোধও বেশি প্রকট হয়।—কখনো স্থূল ভাবে, কখনো বা সূক্ষ্মভাবে।

প্রতিমা : কী ধরণের বাধা বিরোধ ? ব্যাঘাত ?

মুক্তানন্দ : এ-প্রশ্নের উত্তর দেব না কারণ এও হ'ল সাধনার রাজ্যের কথা যার মানচিত্র—জিওগ্রাফি—সাধনা না করলে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তবে নানা সাধুর কথা আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন বা পড়েছেন যাঁরা একটা দুটো তিনটে প্রলোভনকে জয় করার পরে চতুর্থ প্রলোভনকে তফাৎ যাও বলতে পারেন নি ব'লেই ঝুম্ ক'রে পড়ে গিয়েছিলেন। আমার ভুল হয়েছিল যমুনার সঙ্গে একান্তে সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা করায়। তবে আমি সত্যিই ভেবেছিলাম ও যোগ করতে চায়। নৈলে ওকে মন্ত্র দিতাম না কখনই। তাছাড়া প্রথম প্রথম আমার সত্যিই মনে হয় নি যে, ও যোগের দিকে ততটা ঝোঁকে নি যতটা...মানে ঝুঁকেছিল যোগীর দিকে। আরো, আমি ভেবেছিলাম ও যখন জানে আমি গুরুবাদী ব্রহ্মচারী তখন আমার সঙ্গে—কিন্তু থাক শ্রীমন্তবাবু। আমি সত্যিই অনুতপ্ত যে, আমি ওকে যোগের রাজপথে রওনা ক'রে দিতে চেয়ে অজান্তে মনস্তাপের চোরা গলিতে টেনে এনেছি। আমি জানি—ও সামলে উঠবেই উঠবে, কিন্তু আমি কাছাকাছি থাকলে ওর দেরি হবে ধাতস্থ হ'তে।

শ্রীমন্ত : কিন্তু আমরা আপনাকে এত তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে চাই না যে। আপনাকে বলেছিলাম—ফিরে এসে আমরা আপনার পুণ্য সঙ্গ পেতে চাই বেশ কিছুদিন।

প্রতিমা : হ্যাঁ, আমিও আপনার কৃপার্থিনী।

মুক্তানন্দ : আপনারা জিজ্ঞাসু নম্র সরল, তাই সদাশিবের কৃপা পাবেনই পাবেন—শুধু "পাবেন" বলছি কেন ?—এখনই পাচ্ছেন, নৈলে আমার মতন অকিঞ্চনকে এত স্নেহ আদর যত্ন করলেন কেন ? তবু যে আপনাদের কাছে বারবার মন্ত্রগুপ্তির কথা বলেছি সে খানিকটা বাধ্য হ'য়েই বলব—মানে, আমি

তীর্থপন্থী সাধক ব'লে। গুরুদেব আমাকে অগুন্তিবার বলেছেন, সাবধান করতে চেয়ে যে, সাধক পারে না সিদ্ধপুরুষের চালে চলতে। শুধু প্রস্থান করবার আগে একটি কথা ব'লে যেতে চাই: যদি ভাগবতী কৃপাধন্য হ'য়ে বস্তুলাভ করতে চান—মানে, "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—যে-ধন পেলে আর কোনো লাভকেই লাভ মনে হয় না—তাহ'লে গুরুবরণ করলে প্রাপ্তির পথে কাঁটাবনও ফুলবাগান হ'য়ে দাঁড়াবে এই জীবনেই।

প্রতিমা (হেসে): নৈলে বারবার জন্মাতে হবে—এই না? হ'লই বা। এ-জগৎটা কি এতই দুঃসহ যে একবার জন্মালেও মন হাঁপিয়ে ওঠে?

মুক্তানন্দ: সকলেরি ওঠে না—যারা অনুকূল পরিবেশে দিব্যি হেসেখেলে দিন কাটাতে পারে। কিন্তু একবার চোখ চেয়ে দেখুন তো, শতকরা কজন মানুষের পরিবেশ আশা দিয়ে নিরাশ না করে—বিষাদকে পাশ কাটিয়ে আনন্দ পরিবেষণ করে? একটা উপমা মনে এল: বড় জাহাজ হঠাৎ ডুবলে দুচারজন বাঁচতে পারে কিন্তু সাড়ে পনেরো আনা যাত্রীই ডোবে। এ-সংসারের হাজারো ঝড়তুফান কাটিয়ে নন্দনকাননের বন্দরে পৌঁছয় কজন? আমি বলছি না আনন্দ মায়া। উপনিষদে বলেছে বটে: কেই বা বাঁচতে চাইত যদি আকাশে আনন্দ না ঝলমল করত? কিন্তু তবু আজ পর্যন্ত এমন কি কৃষ্ণও জগতকে "দুঃখালয় অশাশ্বত" ব'লে দেগে দিয়ে জীবকে ডেকেছেন তাঁর চরণে ঠাঁই চাইতে। আর ভাবুন এ-যুগের বৈজ্ঞানিক কুরুক্ষেত্রের কথা। দেখেশুনে আরো হাঁপিয়ে উঠতে হয় না কি? রবীন্দ্রনাথ বিশ্বানন্দী কবি—তাঁকে প্রণাম না করবে কে? কিন্তু তিনিও কি গান নি জীবন্মুক্তির গান:

এই কথাটা ধ'রে রাখিস মুক্তি তোকে পেতেই হবে।
যে-পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে।

শ্রীমন্ত: মানে, জীবনে যখন জ'লে পুড়ে মরতে হয় তখন চলো বৌদ্ধ ফু দিয়ে তার শিখাকে নিভিয়ে নির্বাণের পথে?

মুক্তানন্দ (হেসে): শ্রীমন্তবাবু, আপনার ফাঁদে আমি পা দিচ্ছি না। জীবনটা আমার কাছে আজো হেঁয়ালি মনে হয়। তাই আমি চাবি খুঁজছি। কিছুই জানি না আমি। জানি কেবল এইটুকু যে, যাঁরা ধন্যজন্মা হয়েছেন এ-চাবি পেয়ে তাঁদের কাছেই ধর্ণা দিতে হবে সে-চাবির জন্যে। তাই আমি আমার গুরুদেবের চরণে আশ্রয় নিয়েছি। এ পর্যন্ত যা পেয়েছি তাকে দিশা বলা চলে, কিন্তু লক্ষ্যসিদ্ধি নয়।

প্রতিমা: আপনি কথায় কথায় আপনার শ্রীগুরুদেবকে দাঁড় করিয়ে বেচারী আমাদের আর এগুতে দেন না।

মুক্তানন্দ: প্রতিমা দেবী, আপনার আন্তরিকতা বুদ্ধি ও চরিত্র দেখে আমি এত খুশী হয়েছি যে একটা উপমা দিতে চাই। কি জানেন? স্থলচারী হ'লে মোটরকার বাহন হ'তে পারে, কিন্তু আকাশচারী হ'তে হ'লে পাখার দরকার, তাই বাহন বদল করতে হয়। গুরু হ'লেন এই পাখা ওরফে বাহনের দীক্ষাদাতা। অবিশ্যি তাঁকে খেদিয়ে বুদ্ধির অহঙ্কারকে গুরুবরণ করা যায়, কিন্তু তাহ'লে নন্দনকাননের পাসপোর্ট মেলে না, ডুবতে হয় রসাতলে। যে একবার ওড়ার আনন্দস্বাদ পেয়েছে সে পারে না আর রসাতলে ঘর বাঁধতে। কিন্তু আরো কারণ আছে যে জন্যে আমি নিজে গুরুবরণ করেছিলাম। তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েই যে আমি শিবনেত্র পেয়ে গেছি তা নয়, কিন্তু এটুকু দেখতে পেয়েছি যে, তিনি সংসারের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা অশ্রু হাসিকে ঠিক আমাদের দৃষ্টি দিয়ে দেখেন না, আমাদের শ্রুতি দিয়ে শোনেন না। যা আমরা দেখি নি তাই দেখে তিনি অন্য মানুষ হ'য়ে গেছেন, তাই তাঁর চালচলন আমাদের কাছে সুবোধ্য মনে হয় না, ঠিক যেমন প্রেমিকের চালচলন সুবোধ্য মনে হয় না স্বার্থবাদীদের কাছে। কিন্তু বিকাশ মানেই তো এই, নয় কি? অর্থাৎ যে জেগেছে সে দুঃস্বপ্নকে বাতিল করে, যে সমজদার সে বেদরদীকে নামঞ্জুর করে। যে ভজনের আনন্দ পেয়েছে সে ভোজনানন্দকে মান দেয় না। কিন্তু আপনারা এখন জিরোন। আমি কাল রাতে যাব তো। তাই যদি চান তো কাল সকালে ফের আলাপ হবে—কেবল তর্কালাপ নয়—আলোচনা।

॥ আটাশ ॥

কিন্তু পরদিন আলোচনার বৈঠক বসল না। নির্মলার হঠাৎ জ্বর। তাপ উঠল একশো পাঁচ। শ্রীমন্ত ও প্রতিমা পর পর তাঁর শিয়রে ব'সে কেবল শুনতে থাকে তাঁর বিকারের প্রলাপ: "গুরুদেব, আমাকে ছেড়ে যাবেন না। আমি তাহ'লে বাঁচব না...আপনিই আমার সব...দেখিয়ে দিয়েছেন আমাকে সংসার মায়ার খেলা...!" ইত্যাদি।

সন্ধ্যায় শ্রীমন্ত তাঁকে ডেকে আনল। তিনি এসে নির্মলার কপালে হাত রেখে বললেন: "ভয় নেই মা, তোমার জ্বর না ছাড়লে আমি যাব না।"

আশ্চর্য রাত দুটোয় ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। ভোরবেলা মুক্তানন্দ দুটি জবাফুল তুলে তাঁর মাথায় ঠেকিয়ে বললেন: "বলেছি তো, ভয় নেই। শুধু তুমিই তো আমাকে চাও না, আমিও তোমাকে চাই যে…"

নির্মলা: কিন্তু আপনি যে বলেন আপনি কারুরই গুরু নন, তাই ভয় করে। আপনারি কৃপায় আমি স্বপ্নে সদাশিবের দর্শন পেয়েছি। হয়ত মনের ভুল…

মুক্তানন্দ: না মা। স্বপ্নে ইষ্টদর্শন কালেভদ্রে হয়, কিন্তু যখন হয় তখন সে-দর্শনের ফলে পাপবদ্ধ জীব হ'য়ে দাঁড়ায় পাপমুক্ত শিব। শোনো মা, আমি একটি কাগজে চারটি লাইন লিখে তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি রোজ ত্রিসন্ধ্যা আবৃত্তি করবে:

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থানো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতভয় সূদন মামনাথং
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥

এ-কাগজটি যত্ন ক'রে রেখে দিও মা, কেমন?

নির্মলা (সাশ্রুনেত্রে): আমি মাদুলি ক'রে রাখব। প্রণাম প্রণাম প্রণাম, গুরুদেব।

* * *

রোগিণীর ঘর থেকে বেরিয়ে মুক্তানন্দজি প্রতিমা ও শ্রীমন্তকে বললেন: "চলুন আমার সঙ্গে, যমুনাকে বলে যাই।

শ্রীমন্ত (আশ্চর্য): কিন্তু আমাদের যাবার কী দরকার?

মুক্তানন্দ (হেসে): আমি তৈলঙ্গ স্বামী নই শ্রীমন্তবাবু। বস্তুলাভ হ'লে সাধক যে-জীবন্মুক্তির বর পায় আমি পাই নি এখনো, শুধু মুক্তির একটুখানি প্রসাদ ভাঙিয়ে খাচ্ছি। কিন্তু দেখুন তাতেই কত বড় ভুল ক'রে বসেছি যমুনা মুক্তি চায় ভেবে।

শ্রীমন্ত: কিন্তু আপনি কি তাকেও টানেন নি যেমন টেনেছিলেন মা-কে?

মুক্তানন্দ: আমি ওকে চেয়েছিলাম ধর্মের দিকে টানতেই, আমার দিকে নয়। এই শাদা কথাটির মর্মগ্রহণ করতে এত বেগ পাচ্ছেন কেন?

প্রতিমা : শুনুন সাধুজি, আপনি যে ধার্মিক আমরা সবাই জানি। কিন্তু যমুনার সঙ্গে কাল আমার খোলাখুলিই কথাবার্তা হয়েছে। আমি ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেই একই ধুয়ো গেয়ে চলে : আপনার মধ্যে দিয়েই ও আলো পেয়েছে, আপনি এখন ওকে ছেড়ে গেলে ও বাঁচবে না। ও চায় আপনার সেবাদাসী হ'য়ে আপনার সেবা করতে।

মুক্তানন্দ (হেসে) : প্রতিমা দেবী, শেক্সপীয়র অকারণ বলেন নি : "Men have died from time to time and worms have eaten them, but not for love." ও বাঁচবে ঠিকই, আর যদি আমাকে সত্যি ভালোবেসে থাকে তবে আমার প্রার্থনাও ওর মনে সক্রিয় হবে—এই প্রার্থনা যে, ওর ভালোবাসার মোড় ফিরুক ভগবানের দিকে।

প্রতিমা : আপনাকে একটা কথা বলতে চাই—যদি কথা দেন আপনি কিছু মনে করবেন না।

মুক্তানন্দ : আমি সিদ্ধপুরুষ না হ'লেও গীতার কথায় পুরো বিশ্বাস করি যে, মুক্তিকামী সাধকের আদর্শ হবে কোনো কিছুতেই "উদ্বেজিত"—কি না upset—না হওয়া। আমি অনেক পোড় খেয়েছি প্রতিমা দেবী। আপনি যা মুখে আসে বলতে পারেন—এমন কি আমাকে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়েও।

প্রতিমা : (হেঁট হ'য়ে তাঁর জানু ছুঁয়ে) : ছি ছি, এমন কথা বলে? আপনি পুণ্যাত্মা, ভগবানের জন্যে সব ছেড়েছেন, আপনাকে আমরা সবাই গভীর শ্রদ্ধা করি। তবে কি জানেন? আমাদের মনে হয় আপনারা বাস্তব—মানে, the real world, the world of tact-কে—বরখাস্ত ক'রে বাস করেন এক কল্পনার কোলে যেখানে না কি অঝরা ফুল ফোটে, কাঁকরেও মেলে মখমলের কোমলতা, ফলে আপনারা অনেক কিছুই বলেন যা ধোপে টেকে না। এর একটা সেরা প্রমাণ—আপনারা মনে করেন মাটির মানুষকে মন্ত্রের তুক-তাকে অলকার অমানুষ বানানো চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে।

মুক্তানন্দ : আপনার শুধু শেষ অভিযোগটির উত্তর দেব। আমরা বলি বটে যে, দুরাচারও ভগবতী কৃপায় জপ তপ ক'রে ধর্মাত্মা হ'তে পারে। কিন্তু সত্যিই কি এ-অত্যুক্তি কেবলমাত্র শ্রুতিমধুর উচ্ছ্বাস, মিথ্যে জলতরঙ্গের টুং টাং, জলে আল্পনা? এইমাত্র চাক্ষুষ করলেন না কি নির্মলা দেবীর কী গভীর রূপান্তর হয়েছে দৈবী কৃপায়? একথা সত্যি যে এ-ধরণের পরিবর্তন জগতে

খুব কমই ঘটে। কিন্তু মহৎ বিকাশ মাত্রই কি বিরল নয়? আর বিরল কেন জানেন? কারণ যে-কোনো প্রচেষ্টায় ঐকান্তিক হ'তে পারা এত দুঃসাধ্য যে মানুষ দুদিন চেষ্টা ক'রে হাঁপিয়ে উঠে সস্তা সুখেরই কারবারী হ'য়ে কাল কাটায় দুর্লভকে আকাশ কুসুম নাম দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা স্মরণ করুন: একজন মাটি খুঁড়ে জল চাইছে। এখানে কিছুক্ষণ খুঁড়ে না পেয়ে, আর এক জায়গায় খোঁড়ে শাবল দিয়ে, সেখানেও না পেয়ে আর এক জায়গায়। যদি এক জায়গায় খুঁড়ত মিলত তৃষ্ণার জল। কিন্তু হ'লে হবে কি, সৃষ্টিলীলা চলেছে আবহমানকাল চাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়ার দুঃখের সংঘর্ষে। মহাজনেরা একথা জানেন তাই দুঃসাধ্যকে অসাধ্য ব'লে হাল ছেড়ে দেন না। কারণ তাঁরা হাড়ে হাড়ে জানেন যে, জপ তপ ধ্যান প্রার্থনা কর্মযোগ অষ্টাঙ্গ যোগ ··প্রতি সাধনায়ই নিবেদিতার ভাষায় a lion in the path পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকে। জপ করবে দিনে ছ ঘণ্টা? সাধ্য কি? দু'ঘণ্টার পরেই সাধক অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। ধ্যান? মন চোখবাঁধা বলদের মতন কেবলই ঘোরে আর ঘোরে কিছুদিন। তারপর উঠে বলে: অশান্ত মনকে শান্ত করা আমার কর্ম নয়। প্রাণায়াম? এ-পথে সার সার বিপদ, বিশেষ কুম্ভকে। প্রার্থনা? কণ্ঠই সোচ্চার হয় হৃদয় যোগ দেয় না, কাজেই স্তব-স্তুতি হ'য়ে ওঠে নিষ্প্রাণ শুষ্ক আবৃত্তি। তবু কয়েকজন ধন্যজন্মা এমন শক্তি নিয়ে জন্মান যে বাধার আড়ালকে বাতিল করেন দুশ্চর তপস্যায়। তাঁরাই হ'য়ে ওঠেন জনগণমনের অধিনায়ক, সুফল সাধন, কীর্তিমান—শুধু যোগাযোগেই নয় বিজ্ঞানে, শিল্পে, ব্যবসাবাণিজ্যে দর্শনে, জনসেবায়—কিসে নয়? যমুনাকে আপনারা পরে এই কথাটি ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলবেন, কারণ আমাকে এখন প্রস্থান করতেই হবে।

প্রতিমা: এ আপনি কী বলছেন সাধুজি? আপনি ওকে বোঝালে যদি ও না বোঝে তবে আমরা বোঝাব কেমন ক'রে শুনি?

মুক্তানন্দ: ওকে ভালোবেসে। একথা বলছি, শুধু এইজন্যেই নয় যে, আপনারা ওর রক্ষাকবচ, আশ্রয়দাতা—বলছি বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, আপনারা দুজনে ভগবান্‌, জন্মেছেন প্রেম ও ঐকান্তিক কবচ কুণ্ডল নিয়ে।

॥ ঊনত্রিংশ ॥

মুক্তানন্দজি প্রস্থান করার সময়ে যমুনা তাঁকে প্রণাম ক'রে হাতজোড় ক'রে বলল: "আমাকে ভুলবেন না।"

মুক্তানন্দ: না মা। কিন্তু তোমার আমাকে ভোলাই চাই।

যমুনা: কী নিয়ে থাকব, গুরুদেব?

মুক্তানন্দ: তোমাকে তো বলেছি বহুবারই—নাম নিয়ে। যত পারো মন্ত্রটি জপ করবে।

যমুনা (বিষণ্ণ): ভালো লাগে না যে।

মুক্তানন্দ: কারুরই লাগে না মা। গীতায় বলেছে সাত্ত্বিক সুখ প্রথম দিকে বিষের মতন বিস্বাদ মনে হয়, পরে মনে হয়, অমৃতের মতন সুস্বাদু। (শ্রীমন্তকে) আপনাকে আর কী বলব? শুধু পুনরুক্তি—আপনি ভাগ্যবান (প্রতিমাকে দেখিয়ে)—এমন জোড় কালে ভদ্রে মেলে।

প্রতিমা: কিন্তু শুনতে চাই—আমিও ভাগ্যবতী ওঁকে পেয়ে।

মুক্তানন্দ (হেসে): জোড় মেলার কথা যখন বললাম তখন কি দেওয়া হ'ল না এ-সার্টিফিকেট আরো জোর গলায়?

প্রতিমা (হেসে): আমি তো আপনাদের মতন নই—শ্রুতিমধুর কথা বারবার শুনতে চাই।

মুক্তানন্দ: আচ্ছা তাহ'লে আরো খুলে বলব, পরে।

প্রতিমা: কবে?

মুক্তানন্দ: যেদিন ফের দেখা হবে?

শ্রীমন্ত: হবে তো?

মুক্তানন্দ: অবধারিত। জয় গুরু!

* * *

যমুনা আঁচলে চোখ মুছে ঘরে ফিরেই শয্যা নিল। প্রতিমা শ্রীমন্তকে বলল: "ওর মুখ রাঙা। নিশ্চয় জ্বর হয়েছে ফের।"

প্রতিমা ঠিকই ধরেছিল। ডাক্তার এসে বলল বুকে ব্রঙ্কাইটিস, কিন্তু ভয়ের কোনো কারণ নেই, তিন দিনেই ভালো হয়ে যাবে। প্রতিমা রতন

ভট্টাচার্যকে ফোন করল। কিন্তু তিনি বললেন তিনি পঞ্জাব রওনা হচ্ছেন। বোঝা গেল মেয়েকে তিনি ফিরে চান না।

যমুনা শুনে বলল: "কেন বাবাকে লিখতে গেলি দিদি? তিনি কোনোদিনই আমাকে চান নি, মনে ক'রে এসেছেন গলগ্রহ। তুমিও মুখ ফিরিয়ে নিও না দিদি। তাহ'লে আমি বাঁচব না।"

প্রতিমা (ওর কপালে হাত রেখে): ছোট বোন কি দিদিকে এমন কথা বলে? ছি!

যমুনা: বলি ভয় পাই ব'লে। আমি যে অপয়া মেয়ে দিদি, যেখানেই যাই অশান্তি আনি।

প্রতিমা: অপয়া টপয়া সব বাজে কথা। আসল কথা—নিষ্ঠা চেষ্টা, কর্তব্য ক'রে যাওয়া—বলি নি কি উঠতে বসতে?

যমুনা: কাজে যে মন বসে না দিদি, কী করব?

প্রতিমা: অমন হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকলে কষ্ট কমবে না ভাই, মনকে স্ববশে আনতেই হবে।

যমুনা (সাশ্রুনেত্রে): আচ্ছা দিদি, আমি কথা দিচ্ছি—চেষ্টা করব। আমাকে ক্ষমা করো দিদি। আর···আর···(ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না) আমাকে তাড়িয়ে দিও না। আমার বাবার কাছে আমি যাব না কিছুতেই।

প্রতিমা (ওকে বুকে টেনে নিয়ে): দিদি কি কখনো বোনকে তাড়িয়ে দিতে পারে? (থেমে) সংসারে সবাইকেই নানা সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় ভাই। বিপদ আপদ আসে আমাদের শক্ত সমর্থ করতে, আর অপরের ব্যথার ব্যথী হওয়ার দীক্ষা দিতে। শোনো, মা কাল বলছিলেন—তুমি যদি রাজী হও তবে লণ্ডনে দু'তিন মাস তাঁর কাছে কাটিয়ে আসতে পারো।

যমুনা (প্রতিমার কোলে মুখ ডুবিয়ে): তুমি মানুষ নও দিদি, দেবী মা-র দেবী মেয়ে। (একটু পরে মুখ তুলে চোখ মুছে) না, আমি লণ্ডনে যাব না হাওয়া খেতে—প্রাণপণে চেষ্টা করব তোমাদের মনের মতনটি হ'তে। তোমার আশীর্বাদ থাকলে পারবই পারব।

॥ ত্রিশ ॥

শাস্ত্রীজি মার্থার সঙ্গে লণ্ডনে ফিরে গিয়ে লিখলেন প্রতিমাকে : "পৌঁছেছি ঠিকই। তোমার অসুস্থতা কেটে গেছে এজন্যে আশ্বস্তও হয়েছি কম নয়। কিন্তু মা, যমুনার কথা ভুলতে পারছি না। বেচারী মেয়ে! ওকে যদি ব'লে ক'য়ে এখানে পাঠাতে পারো তো আমি ওকে একটি নার্স-ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানে ভরতি ক'রে দিতে পারি যাতে কয়েক বৎসর বাদে ও কোনো হাঁসপাতালে বা আরোগ্যালয়ে কায়েম হতে পারে ধাত্রীর পদে। ও দেখতে সুশ্রী, কালো মেয়েও নয়। এখানে এখনো বর্ণ কৌলীন্য বেশ মজবুত, শ্বেতচর্ম সমাদৃত—তবু কৃষ্ণচর্মকে ওরা আজকাল তেমন হেনস্থা করে না যেমন আগে করত। তবে নিপুণ নার্স হ'লে ও কলকাতায়ও ভালো চাকরি পেতে পারে। আরো একটা সম্ভাবনা আছে : এ-প্রেমে-পড়ার রাজধানীতে ওকে কোনো সৎপাত্র বধূবরণও করতে পারে, বলা যায় না। মোট কথা, ওর জন্যে তুমি বেশি ভেবো না। যথাকালে ওর মন সুস্থ হবেই হবে! এই ওর প্রথম আসক্তি, তাই এত বেশি ঘা খেয়েছে। কিন্তু যৌবনের স্বার্থ—দুঃসাধ্যকে সুসাধ্য করা, পরাজয়কে মোড় ফিরিয়ে জয়ের তীর্থমুখী করা। তাছাড়া প্রথম যৌবনের আসক্তি জোয়ারের জলের মতন হু হু ক'রে বেড়ে উঠলেও পরে ভাঁটিয়ে আসেই আসে। না না, এ আমার মনগড়া থিওরি নয়—এখানে ডজন খানেক প্রেমিকাকে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে দেখেছি নানা বিচিত্র ভূমিকায়। যমুনার আসক্তি একটু অন্য জাতের ওরফে জটিল যেহেতু ওর ক্ষেত্রে প্রেমদেব ধর্ম ও গুরু এই ডবল ছদ্মবেশে এসে হাজিরি দিয়েছে। মরুক গে। আমার যা মনে হয় লিখে গেলাম—কিন্তু কেবল তোমার জন্যে। আর এক কথা : ওর সঙ্গে একবার তোমরাও যুগলে এসে দু'দিন আমাদের ঘর আলো করো না কেন? যমুনা একটু ভরসা পাবে তোমাদের সঙ্গে এলে। হ্যাঁ, মুক্তানন্দজির যদি উদ্দেশ পাও তো আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে ভুলো না—তিনি ভাবের ঘরে চুরি করেন নি ব'লে, মন্ত্র দিয়েও গুরু হ'তে না চাওয়া—নমস্কার তাঁকে।

আমাদের স্নেহাশিস নিও, আর পারো তো হুশ ক'রে উড়ে এসো।"

॥ একত্রিশ ॥

সংসারে কোনো দুঃখই নেই যা কালাতিপাতে কিছুটা সুসহ হ'য়ে না আসে। যমুনা মাসখানেক বাদে একটু একটু ক'রে ফিরে পেল কর্মে প্রবৃত্তি, স্কুলের কাজে ফের মন বসালো। ইতিমধ্যে স্কুলের পড়ুয়াদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল। প্রতিমা লণ্ডনে মন্তেসরি শিক্ষাপদ্ধতির যে পদ্ধতি শিখেছিল, এখন বিশেষ কাজে এল এখানে ওখানে সে-পদ্ধতির কিছু বাদ দিয়ে—যাকে বলে adaptation ; শ্রীমন্তও ওর দেখাদেখি এ-পদ্ধতি কতকটা আয়ত্ত করল যার ফলে ওদের ভালোবাসা আরো মজবুত হ'য়ে উঠল! শাস্ত্রীজি শ্রীমন্তকে একটি পত্রে লিখেছিলেন ওদের দুজনকেই অভিনন্দন ক'রে যে, প্রেমে রোমান্সের সৌরভ ক্রমশ ফিকে হ'য়ে এলেও এক অভিনব পূর্ণতা এসে কিছুটা ক্ষতিপূরণ করে দুটি নব আগমনীতে : সন্তান ও কর্মে পরস্পরের সহযোগিতা। বর্তমান ক্ষেত্রে প্রথমটি ওদের ভাগ্যাকাশে উদয় না হ'লেও দ্বিতীয়টি এসে যেন বলল : "দুঃখ কী? আমি তো এসেছি।" তাছাড়া শিশুদের সরলতা প্রাণশক্তি ও কলহাস্যের জাদু ওদের মিলনমন্দিরে যেন এক অচিন্তনীয় দেয়ালি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। যে-কোনো জীবনের সফলতা আশপাশের অন্তত কয়েকটি জীবনকে রঙিয়ে তোলে, ঠিক যেমন কোনো ধ্বংসপথের যাত্রী আশপাশের যাত্রীদের কিছুটা নিচু দিকে টানে। তাই যমুনার বিষাদ ধূসর মনেও প্রতিমার আদর্শবাদের ছোপ লাগল বৈকি। বুদ্ধিমতী মেয়ে তো, তাই একদিন কথায় কথায় প্রতিমাকে বলল : "দিদি, আমি যে পরিবেশে গ'ড়ে উঠেছি সেখানে আদর্শবাদকে নিশানা করে সবাই তীরন্দাজি করত ; বলত : জীবনের জুড়িগাড়ি চালায় সুবিধাবাদ আর টাকার গরম। কিন্তু এ-জুড়িগাড়ি যে ক্ষণিক মায়া—মানে, থেকেও নেই—এই দারুণ সত্যটিকেই আমরা ভুলে ব'সে থাকি। তাই দিদি, তোমাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা কী ক'রে জানাব ভেবে পাই না সত্যিই। প্রথম দিকে মনকে সান্ত্বনা দিতাম এই ব'লে যে তোমাদের সহযোগিতা ক'রে একটু একটু ক'রে শুধব তোমাদের স্নেহের ঋণ। কিন্তু এ-সামান্য সহযোগিতা তো সত্যিকার সেবা নয়। আমি চাই

তোমাদের মনের মতনটি হ'য়ে তোমাদের হুকুমবরদার হ'তে। তা যদি কোনোদিন হ'তে পারি···কিন্তু হায় রে! আমার ইচ্ছার আগ্রহের বহর যত বড় শক্তি নৈপুণ্যের বহর যে তার সিকির সিকিও নয়, কী করব বলো?

প্রতিমা (ওর গালে সাদরে টোকা মেরে): কী সেন্টিমেণ্টাল তুই যমুনা! (থেমে) তবে তোর বয়সে বোধহয় আমিও এমনিই সেন্টিমেণ্টাল ছিলাম।

যমুনা: সেন্টিমেণ্টাল! কক্ষনো না।

প্রতিমা: নয়? সেন্টিমেণ্টাল না হ'লে কি কেউ এত অন্ধ হয় যে সমানে আমাদের সহযাত্রী হ'য়ে চ'লেও ভাবে—চলায় তাল কাটছে? তুই কি জানিস ছেলেমেয়েরা তোকে যেমন ভালোবাসে তেমন ভালো আমাকেও বাসে না?

যমুনা (প্রসন্ন কোপে): কী যে বলো দিদি! যাও! কোথায় তুমি আর কোথায় আমি! কিসে আর কিসে—ধানে আর তুষে।

প্রতিমা: এক্ষেত্রে উপমাটার অপপ্রয়োগ হয়েছে। কারণ আমাদের ছেলেমেয়েরা যতটা ভালোবাসে তার চেয়ে বেশি করে ভয় বা সমীহ্। তোর বেলায় ঠিক উল্টো: যতটা ভয় করে তার চেয়ে বেশি আপন মনে করে। দেবিকা সেদিন কী বলেছে জানিস? পরশু আমি সুরেশকে শাসন করতে চেয়ে দুদিন তার সঙ্গে কথা কই নি। সে কান্নাকাটি করে ডাক ছেড়ে। দেবিকা তাকে চুপি চুপি বলে: "ওরে ভাই, কান্নাকাটি ক'রে কিছু হবে না। তুই ধর গিয়ে যমুনাদিকে তিনি দিদিজিকে ধরলে দেখবি তিনি তোকে কোলে টেনে নেবেন।" কে?

শ্রীমন্ত (মেঘলা মুখে ঘরে ঢুকে): আমি। বড় খারাপ খবর (যমুনাকে) তোমার বাবা মোটর চালাতে গিয়ে এক গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে প'ড়ে যান ছিটকে। পা ভেঙে গেছে। তোমাকে দেখতে চাইছেন—হাঁসপাতালে।

যমুনা (রুক্ষ স্বরে): নিশ্চয় মাতাল হ'য়ে মোটর চালিয়েছিলেন। আমি যাব না।

শ্রীমন্ত: তিনি যাই করুন, তোমার বাবা। তাছাড়া নার্স টেলিফোন করেছে তিনি যা খাচ্ছেন বমি হ'য়ে যাচ্ছে। অন্ত্রে একটা বিষম খোঁচা লেগেছে। তোমার কর্তব্য এখন তাঁর সেবা করা। কে জানে তিনি বাঁচবেন কি না।

যমুনা (ভেবে): আচ্ছা দাদা, যাব। কিন্তু কর্তব্য ব'লে নয়, আপনি বলছেন ব'লে।

প্রতিমা : অমন কথা বলতে নেই। কর্তব্য হয়ে ওঠে বিড়ম্বনা যদি অনিচ্ছায় করা হয়।

যমুনা : তুমি তো তাঁকে জানো না দিদি…

প্রতিমা : নাই জানলাম। এটুকু তো জানি যে তিনি আজ দুঃস্থ আর তোমার পথ চেয়ে আছেন। ভাই ধর্ম মানে শুধু মন্ত্র জপ নয়। চাই অসহায়ের সহায় হওয়া যতটা পারি।

॥ বত্রিশ ॥

রতনবাবু (যমুনাকে হাঁপাতে হাঁপাতে) : আমি পাপিষ্ঠ মা, তাই আমার এ-সাজা হয়েছে। কিন্তু তোমাকে ডেকেছি তোমার সেবা পেতে নয়…তোমাকে যে-অনাদর করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই এই কথাটি তোমাকে জানাতে…আর… আর তোমাকে বলতে যে তোমার মাসিমাকে তুমি দেখো… তিনি আজ একেবারে নিঃস্ব অসহায়। তিনি কাশীবাসী হ'তে চাইছেন… আমার বাড়ীটা বেচে বোধহয় ষাট সত্তর হাজার টাকা পাবে.. দেনা প্রায় বিশ হাজার।…তাহ'লে তোমার হাতে থাকবে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার। তোমার মাসিমাকে তুমি মাসে মাসে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা পাঠালেই চলবে…তিনি থাকবেন তাঁর এক বিধবা ননদের সঙ্গে। (শ্রীমন্তকে) : ধন্যবাদ শ্রীমন্তবাবু। যমুনাকে দেখবেন… তার জন্যে কিছু টাকা রেখে গেলাম…

যমুনা (কেঁদে) : আমি টাকা চাই না বাবা! তুমি সেরে ওঠো, আমি তোমার দেখাশুনো করব।

রতন : না মা, আমি জানি বাঁচব না, বাঁচবার সাধও নেই। কী হবে বেঁচে বলো? সদ্বংশে জন্মিয়েও আমি কুলাঙ্গার নাম কিনেছি—তোমার দিকে চেয়েও দেখি নি। মদ আর জুয়াখেলা এই দুই পাপে মজেছি। কুবুদ্ধি আর কার নাম? স্বখাত সলিলে ডুবে মরা… তুমি ফিরে যাও যে-কদিন বাঁচি নার্সেরাই আমাকে দেখবে… দুচারদিন বৈ তো নয়।

যমুনা : না বাবা, যতদিন না তুমি সেরে ওঠো আমি থাকব।

রতন : না মা। আমার অন্ত্রে বিষম ঘা লেগেছে…আমি কিছুদিন ডাক্তারি পড়েছিলাম মেডিকাল কলেজে। আমি সেরে উঠব না।

যমুনা গেল না। শ্রীমন্ত ফিরে গিয়ে প্রতিমাকে সব বলল। প্রতিমা ছুটে এল এক সাহেব ডাক্তার নিয়ে। কিন্তু ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে মাথা নেড়ে চ'লে গেলেন। রতনবাবুর মৃত্যু হ'ল সেই দিনই রাত দুটোয়।

॥ তেত্রিশ ॥

বিধাতার লীলার তল পাবে কে? এক একজন মানুষ থাকে যারা জীবদ্দশায় কারুরই চোখে পড়ে না, কিন্তু ইহলোক থেকে প্রস্থান করলে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রতনবাবু ছিলেন এই শ্রেণীর মানুষ, দুর্বৃত্ত বলা যায় না, কিন্তু সুশীল বললেও কেউ সায় দেবে না। একদিকে বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল—অন্যদিকে বিধবা মাসশাশুড়ীর কথাও ভেবেছিলেন মৃত্যুযন্ত্রণার মাঝে! সবচেয়ে আশ্চর্য—যমুনা চ'লে যাবার পরে তাঁর এক উকিল বন্ধুকে ডেকে উইল ক'রে তাঁকে বলে গিয়েছিলেন যমুনার দেখাশুনো করবে ও যমুনার মাসিমার কাশীবাসের ব্যবস্থা করবে।

যমুনা বাপকে কোনোদিনই শ্রদ্ধা করতে পারে নি। তবু আশ্চর্য এই যে, তাঁর মৃত্যুর পরে নিজেকে মনে করল অনাথা। নানা সময়ে মনে পড়ে তাঁর অট্টহাস্য, বেপরোয়া চাল-চলন, চোখ-জুড়োনো আসবাব পত্রে ঘর সাজানো··· ইত্যাদি।

বাড়ীটি বিক্রয় হ'ল। যমুনার নামে প্রতিমা ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রাখল, দশ হাজার মাসিমার নামে। তিনি কাশীবাসী হলেন নিশ্চিন্ত হ'য়েই।

কিন্তু যমুনার মন উঠল অশান্ত হ'য়ে। প্রতিমাকে একদিন বলল কেঁদে যে স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়াতে আর মন বসে না। প্রতিমা বলল: "তাহ'লে বিবাহ ক'রে গিন্নি হওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

যমুনা (একটু চুপ ক'রে থেকে): যাঁকে একবার মনে মনে বরণ করেছি তাঁর দেওয়া মন্ত্র জপ ক'রে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।

প্রতিমা (হেসে): কী পাগল! ধর্মে যার আস্থা নেই মিথ্যে মন্ত্র জপ ক'রে সে কোন্ বৈকুণ্ঠে পৌঁছবে?

যমুনা: তাহ'লে কী করব দিদি? ব'লে দাও তুমিই।

প্রতিমা (ভেবে) : বাবা বলেছিলেন নার্স ট্রেনিং…

যমুনা : নার্স হ'তেও যে মন চায় না দিদি !

প্রতিমা (বিরক্ত) : তাহ'লে যা ভালো বোঝো করো।

যমুনা (ভেবে) : আচ্ছা লণ্ডনে গিয়ে দেখি...আমি আর ভাবতে পারি না দিদি। লিখে দাও শাস্ত্রীজিকে যে আমি চেষ্টা করব। না—আমাকে দুদিন সময় দাও। রাগ কোরো না দিদি…(দ্রুত প্রস্থান)

* * *

দিন পনেরো বাদে যমুনা প্রতিমাকে বলল : "আমি লণ্ডনে যাব দিদি ঠিক করেছি।"

প্রতিমা (একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে) : কিন্তু ঠিক করেছ হঠাৎ কি নার্স হ'তে চেয়ে ? না, তাকাও আমার চোখের দিকে।

যমুনা : তুমি টের পেলে কেমন ক'রে দিদি ?

প্রতিমা : কাল কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল…

যমুনা (মুখ নিচু ক'রে) : হ্যাঁ দিদি। তাই।

প্রতিমা : কিন্তু সাধুজি লণ্ডনে কতদিন থাকবেন তা যখন জানো না…

যমুনা (একটু চুপ ক'রে থেকে) : দিদি, মরার বাড়া তো গাল নেই। লণ্ডন ছেড়ে যদি তিনি চ'লে যান…

প্রতিমা : তখন ফের হা হুতাশ করা যাবে—এই তো ?

যমুনা : না দিদি। পোড় খেয়ে এখন শক্ত হ'য়ে উঠেছি। তিনি ওখানে লেকচার দিচ্ছেন আমি শুনতে চাই। হয়ত এখন তিনি শিষ্য করেন…

প্রতিমা : না। বাবা লিখেছেন লণ্ডনেও তিনি শুধু মন্ত্র দেন মাত্র—গুরু হ'য়ে বসতে চান না।

যমুনা : শাস্ত্রীজি লিখেছেন ? কই আমাকে বলো নি তো।

প্রতিমা : কেন বলি নি কি বুঝতে পারো না ?

যমুনা (চোখ মুছে) : আমি…আমি তো কিছু চাই না দিদি, চাই শুধু তাঁর লেকচার শুনতে—যেমন আর সকলে শুনছে। এ-ও কি অন্যায় বলবে ?

প্রতিমা : না কেবল মনে রেখো ভাবের ঘরে চুরি করলে…

যমুনা : না দিদি। আমি কথা দিচ্ছি—যদি আমি নার্স হ'তে না চাই তবে শুধু তাঁর লেকচার শুনবার জন্যে ওদেশে থাকব না, ফিরে আসব তোমার পায়ে।

প্রতিমা : না বোন্, পায়ে না—কোলে। আমি জানি তুমি দুর্বল হ'লেও দুর্মতিকে প্রশ্রয় দাও না, দিলে তোমাকে এখানে ধরে রাখবার চেষ্টা করতাম না।

যমুনা (গতজোড় ক'রে) : তোমার এ-স্নেহ যেন আমি না হারাই দিদি। তুমি না থাকলে (চোখে আঁচল দিয়ে) আমার…আমার…

প্রতিমা : না, কথায় কথায় কান্নাও একটা মুদ্রাদোষ হ'য়ে দাঁড়ায়। (ওকে বুকে টেনে) শোনো যমুনা, আমি আজই বাবাকে টেলিগ্রাম করছি যে তুমি যাচ্ছ তাঁর কাছে। কেবল…

যমুনা : কী দিদি ?

প্রতিমা : মনে রেখো জীবন একটা হেঁয়ালি হলেও গীতার ঠাকুর মিথ্যা বলেন নি যে, সুমতি কল্যাণকৃৎ-এর দুর্গতি হ'তে পারে না। তাই মন্ত্র জপ ছেড়ো না—জপ ক'রে ফল পাও বা না পাও।

॥ চৌত্রিশ ॥

যমুনাকে দমদমে বিমানে তুলে দিয়ে প্রতিমা ফিরে বলল শ্রীমন্তকে : "কিন্তু এখন আর একটি মেয়ে চাই যে—তার কী ?"

শ্রীমন্ত : মিলে যাবে, ভেবো না।

প্রতিমা : না ভেবে করি কী ? যমুনা শুধু যে ভালো শিখিয়ে আমাদের তল্লি বইত তাই তো নয়, ছেলেমেয়েরা ওকে সত্যিই ভালোবেসেছিল তাই নির্ভয়ে বলত ওর কাছে তাদের সব কথা।

শ্রীমন্ত (গালে হাত দিয়ে) : হুঁম্…মুক্তানন্দজিকে এখানে না ডাকলেই হ'ত।

প্রতিমা : ছেলেমানুষি কোরো না। ভবিতব্যকে কি ঠেকানো যায় ? না কেউ জানে কিসে কী হয় ? তোমার নিজের কথাই একবার ভেবে দেখো না গো ! কেউ কি ভেবেছিল এমন মুখচোরা ছেলে এক বিদেশিনীকে দেখতে না দেখতে কলকণ্ঠ হ'য়ে উঠতে পারে ? আমি তো একবারও বলি নি (সুর ক'রে) "আমি এসেছি আমি এসেছি বঁধু হে, নিয়ে এই হাসি রূপ গান।"

শ্রীমন্ত : গান বাদ। তবে হাসি আর রূপেই যখন বাজিমাৎ করলে তখন গানের আর কী দরকার ?

প্রতিমা : আ—হা! বাজি মাৎ করলেন কে শুনি? অরকে ডাক দিয়ে উহু উহু ক'রে আমার মন গলালো কে? মা-র দোহাই দিয়ে আমাকে দূরে ঠেলে কাছে টানল কে? চিঠি লিখে টেলিফোনের নম্বর জানালো কে? (থেমে) কিন্তু ঠাট্টা রাখো। একটা সত্যিই ভাববার কথা আছে। যমুনা লণ্ডনে গেল মুক্তানন্দজিকে না জানিয়ে। তিনি যদি ভাবেন—ও তাঁর পিছু নিয়েছে?

শ্রীমন্ত : কে কার পিছু নেয় প্রতিমা? শুধু মৌমাছিই কি ফুলকে সাধে? ফুলও কি মৌমাছিকে চায় না?

প্রতিমা : ছি ছি! মুক্তানন্দজি একেবারে নিটোল সাধু। যমুনাকে যদি সত্যিই চাইতেন তবে এমন আচম্‌কা বদরীনারায়ণের দিকে ধাওয়া করবেন কেন? সাধুকে সন্দেহ করতে আছে?

শ্রীমন্ত : আমাকে আভাষে বলেছিলেন যে গুরু তলব করেছেন।

প্রতিমা : রাখো রাখো! ঠিক এম্‌নি সময়েই গুরুর টনক নড়ল?

শ্রীমন্ত : এবার সন্দেহ করছে কে শুনি? না শোনো, আমি কাল তাঁকে লিখেছি যে যমুনা যাচ্ছে লণ্ডনে নার্স হ'তে।

প্রতিমা (চম্‌কে) : মস্ত ভুল করেছ। ওসব ব্যাপারে কেন মিথ্যে ঢুঁ মারতে গেলে? যমুনা গেছে তার নিজের দায়িত্বে। তোমার চিঠি পেয়ে হয়ত মুক্তানন্দজি ভেবে বসবেন যমুনাকে আমরাই গছিয়ে দিচ্ছি ওঁকে।

শ্রীমন্ত : এমন কথা ভাববেন কী দুঃখে? আমি রতন বাবুর মৃত্যুর কথা লিখে জুড়ে দিয়েছি যে যমুনা পৈতৃক সম্পত্তি পেয়ে চায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে।

প্রতিমা : তাহ'লে তো আরো জট পাকিয়েছ—কামিনীর সঙ্গে কাঞ্চন।

শ্রীমন্ত : তুমি কি এইমাত্র বললে না—তিনি নিটোল সাধু?

প্রতিমা : কিন্তু নিটোল কি টোল খায় না কোনোদিনই? তাছাড়া আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে : কে বলতে পারে জোর ক'রে যে কাছ থেকে যাকে দেখে তাঁর মনে দাগ পড়ে নি দূর থেকে তার স্মৃতি তাঁকে উতলা করবে না?

শ্রীমন্ত : ও বাবা! wheels within wheels! আমি এতশত ভেবে দেখি নি। আমার মনে হয়েছিল যমুনা বহু কষ্টে যে-ঘূর্ণি কাটিয়ে সবেমাত্র তীরে উঠেছে সাধ ক'রে ফের তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

প্রতিমা খানিকক্ষণ ভেবে লণ্ডনে টেলিফোন করল।

শাস্ত্রীজি (টেলিফোনে) : কে ?

প্রতিমা : বাবা, আমি প্রতিমা। শোনো মন দিয়ে। যমুনা আজ সকালে লণ্ডন রওনা হয়েছে। তোমাকে আমি তার করেছি। কিন্তু শোনো : শুনছ তো ?…আচ্ছা। শ্রীমন্ত বলল দিন দুই আগে মুক্তানন্দজিকে যমুনার কথা খুলে লিখেছে।

শাস্ত্রীজির স্বর (টেলিফোনে) : মুক্তানন্দজিকে কেন ?

প্রতিমা (হেসে) : বোধহয় রেকমেণ্ড করতে, আর কী বলব ?

শাস্ত্রীজি : সে তো আসছে নার্স হ'তে। আমি একটি চমৎকার নার্স ট্রেনিং কলেজের মেট্রনের সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়ে সব ব্যবস্থা করেছি।

প্রতিমা : তুমি কার জন্যে না করো বাবা ? কিন্তু এতই যখন করলে তখন যমুনাকে বুঝিয়ে বোলো মুক্তানন্দজির লেকচার শুনতেও যেন না যায়।

শাস্ত্রীজি (একটু পরে) : আমার মনে হয় বারণ করলে হয়ত উল্টো উৎপত্তি হ'তে পারে।

প্রতিমা (একটু পরে) : কিন্তু·· কিন্তু ধরো মুক্তানন্দজিকে কি বলা চলে যমুনার সঙ্গে যেন দেখা না করেন ?

শাস্ত্রীজি : তাতেও সেই একই সংকট ঘনিয়ে আসতে পারে।

প্রতিমা : কেন বাবা ? মুক্তানন্দজি তো মুক্ত পুরুষ।

শাস্ত্রীজি : কিন্তু জীবন্মুক্ত তো নন। শোনো প্রতিমা, এ বড় কঠিন সাধনা, উপনিষদে বলেছে মুক্তির পথ দুর্গম, দুরত্যয়। এ-পথে লক্ষ্যে পৌঁছতে হ'লে খুব সাবধান হওয়া চাই। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রেও মনকে নির্মল রাখা সহজ নয়—তাদের কাছে থেকেও তফাতে রাখা। তোমাকে তো আমি বলেছি মা কতবারই যে এ-সমস্যার কোনো সত্যিকার সমাধান হয় নি। একদিকে হয়েছে পুরুষালি রিক্ততা যার ফলে মনের জমিতে সোনা ফলে নি। অন্যদিকে ইন্দ্রিয়বিলাস যার প্রতিক্রিয়া অবসাদ বা জীবনে বিতৃষ্ণা। কিন্তু টেলিফোনে এ-আলোচনা সম্ভব নয়—পরে আমি চিঠিতে লিখব। (থেমে) উপস্থিত, মুক্তানন্দজিকে বলব যা না বললেই নয়—তিনি বিকেলে আসছেন বেদান্ত আলোচনা করতে যার উপসংহার হবে প্রাণান্তের আলোচনায়। (হেসে) কাল তোমাকে টেলিফোনে জানাব যদি জানাবার মতন কিছু থাকে।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

প্রতিমা শ্রীমন্তকে বলল শাস্ত্রীজি টেলিফোনে কী বলেছেন। শ্রীমন্ত শুনে বিমর্ষ হ'য়ে বলল: "আমার মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে। তোমাকে ব'লে তবে মুক্তানন্দজিকে লেখা উচিত ছিল।"

প্রতিমা (সান্ত্বনার সুরে): মস্ত ভুল নয়, একটু বেতাল মাত্র। মরুক গে, তুমি বাবাকে লিখে দাও যে যমুনা যেন তাঁর কাছেই থাকে—অন্তত যতদিন মুক্তানন্দজি লণ্ডনে লেকচার দেবেন।

* * * *

পরদিন সকালে যমুনা টেলিফোন করল রোম থেকে। বলল: "দাদা, এঞ্জিন একটু বিগড়েছে, মেরামত করতে একদিন লাগবে শুনছি। তাই বোধহয় কাল আমরা ফের উড়ব।"

শ্রীমন্ত: শোনো। প্রতিমা শাস্ত্রীজিকে টেলিফোন করেছিল। তিনি তোমার জন্যে সব বন্দোবস্ত করেছেন। তুমি উপস্থিত তাঁর ওখানে উঠো, আর কোথাও যেও না।

যমুনা: আমি যে ভেবেছিলাম Y. W. C. A.—

শ্রীমন্ত: না। তবে এ বিষয়ে শাস্ত্রীজির উপদেশ শুনে চলাই ভালো—এ-বিষয়ে কেন, সব বিষয়েই। আর একটা কথা: তুমি মুক্তানন্দজির লেকচার শুনতে যেতে পারো, কিন্তু তিনি না ডাকলে তাঁর সঙ্গে দেখা কোরো না।

যমুনা: না দাদা, আমি তাঁর লেকচার শুনতেও যাব না।

শ্রীমন্ত: সে কি! এখানে যে বললে—যাবে?

যমুনা: বিমানে ভেবে দেখেছি। এমন কি, হয়ত লণ্ডনেও না যেতে পারি। আমাদের বিমান প্যারিস হ'য়ে তবে লণ্ডনে যায়—আমি হয়ত প্যারিস থেকেই ফিরতে পারি দমদমে।

শ্রীমন্ত: ব্যাপার কী? হেঁয়ালি?

যমুনা: হেঁয়ালি নয় দাদা। এই সূত্রে যে-দুঃখ পেয়েছি সময়ে সময়ে

মনে হয়েছে যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসছে, কে জানে? বহু কষ্টে তীরে উঠেছি। কেন আর ফের সেই বিড়ম্বনা? যে আমাকে চায় না তাকে ভুলতে চেষ্টা করাই ভালো।

শ্রীমন্ত: ওরকম ধনুর্ভঙ্গ পণ নিও না। আর ঝোঁকের মাথায় কিছু কোরো না। লণ্ডনে গিয়ে শাস্ত্রীজিকে জিজ্ঞাসা কোরো। তিনি তোমাকে যা বলবেন সেই নির্দেশ মেনে চললে ফের দম বন্ধ হবে না।

যমুনা: আচ্ছা··· দাঁড়ান, আর একটা কথা শুধু। আমাকে যদি ফের আপনাদের স্কুলে কাজ করতে বলেন তো আমি প্যারিস কেন, এখান থেকেই কায়রো হ'য়ে দেশে ফিরতে পারি। একথা বলছি শুধু আপনাদের ঋণ শুধতেই নয়—সে অসম্ভব। বিদেশ আমার একটুও ভালো লাগছে না।

শ্রীমন্ত: বিদেশকে না জেনেই স্বদেশবাদী হওয়া কিছু নয়। বিদেশে অনেক কিছুই দেখবার শিখবার জানবার আছে। অবিশ্যি যদি ফিরতে চাও তো আমরা খুশী হয়েই তোমাকে রাখব এখানে। কিন্তু লণ্ডনে নার্স ট্রেনিং কলেজে যখন তোমার ঠাঁই হয়েছে তখন এ-সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না। ওখানকার নার্স ডাক্তার মেট্রনের সাধননিষ্ঠার কিছু পরিচয় পেলে তোমার মনের অনেক সেন্টিমেণ্টাল কুয়াশা দূর হবে। সবচেয়ে বড় কথা ডিসিপ্লিন—সব পথেই। আমাদের বর্তমান দুরবস্থা···

স্বর: Time is up sir!

শ্রীমন্ত: Thanks—one minute please!··· যমুনা

যমুনা: বলুন।

শ্রীমন্ত: মনে রেখো আমরা যা স্থির করেছি তোমার ভালো ভেবেই। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

যমুনা: আপনাদের প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম দাদা!

॥ ছত্রিশ ॥

দিন পনেরো বাদে শাস্ত্রীজি শ্রীমন্তকে লিখলেন: "যমুনার থাকার জন্যে ভেবো না। ওকে আমি Y. W. C. A.-র হস্টেলে পাঠাব না যতদিন ওর বিষণ্ণ ভাব না কাটবে। নার্স ট্রেনিং কলেজে ও ভর্তি হবে বোধহয় দশ বারো দিনের মধ্যেই। তখন হয়ত ওর এ-মনমরা ভাব এখানকার প্রাণশক্তিকে

প্রসাদে প্রফুল্লতার দিকে মোড় নেবে। মুস্কিল হয়েছে প্রধানত এইজন্যে যে, ও মুখে কিছুই বলে না, থিয়েটার সিনেমায়ও যায় না, ঘরেই থাকে। হয়ত পড়ে কিন্তু কী পড়ে জানার উপায় নেই। আমার নিজের মনে হয় ওর মনে একটা রঙিন আশা বাসা বেঁধেছে যে, মুক্তানন্দজির সঙ্গে ওর ফের দেখা হবেই হবে, আর ও তাঁকে টানতে পারবে ওর পরিচর্যায়। পরিচর্যা বলছি, কারণ ও স্বভাবে গম্ভীরাই বলব, তথা সুভদ্রা সুশীলা। কিন্তু হ'লে হবে কি, নর-নারীর দ্বৈতলীলা চ'লে আসছে সৃষ্টির অরুণোদয় থেকে যেদিন প্রথম অদ্বিতীয় একনাথ মিথুন হ'য়ে ব্যোম থেকে ক্ষিতিতে নেমে এলেন। ইতিমধ্যে আমি দু বার মুক্তানন্দজির লেকচার শুনতে গিয়েছিলাম তাঁর মনোরম ডেরায়। তাঁকে আমি ডাকি নি আমার এখানে। কিন্তু দুতিনজন যুবকের কাছে শুনেছি যে, ওঁর কয়েকটি শিষ্য শিষ্যা হয়েছে যাদের উনি মন্ত্র দেন গুরু না হ'য়ে। এখানেও ওঁর ভাবের ঘরে চুরি নেই, কারণ উনি মেয়েদের মন্ত্র দিলেও কারুর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা করেন না, যদিও ভাষণ দেন চমৎকার, টিপ্পনি কাটতেও পটু। এদেশে ভাষণে রসিকতা থাকলে শ্রোতাদের মন পাওয়া সহজ হয়। কিন্তু মুক্তানন্দজি কারুর মন পেতে ব্যগ্র নন, শ্রোতাদের হাসিয়ে চিত্তরঞ্জন ক'রেই ক্ষান্ত। রটনা: ওঁকে এক জমিদার পাঠিয়েছে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে। সুপুরুষ, রসিক, বহুপাঠী—কাজেই ওঁর শিষ্য শিষ্যা না থাকলেও "ফ্যান্" আছে অনেকগুলি। ওঁর ল্যাণ্ডলেডিও ওঁর খুব প্রশংসা করলেন সত্যিকার "জেণ্ট্ল্ম্যান" উপাধি দিয়ে। দুটি ঘরে আছেন, একটি বড়—বৈঠকখানা প্লাস লেকচারকক্ষ, অন্যটি শয়নকক্ষ। বেশ আরামেই আছেন বলব।

"কিন্তু কাল ওঁর এক তরুণী অনুরাগিনীর কাছে শুনলাম যে যমুনা তাঁর কাছ থেকে ওঁর কয়েকটি ভাষণ ও সুভাষিতের অনুলিপি নিয়ে নিজে টাইপ করেছে। তিনি বললেন: ও চমৎকার টাইপ করে, একেবারে নিখুঁৎ। এ খবর পেয়ে আমি একটু ভাবিত হয়েছি বৈ কি, কারণ যমুনা কেমন ক'রে এ-তরুণীর পাত্তা পেলো ভেবে পাচ্ছি না। ও কেবল কিউ গার্ডেনে যায় বিকেলে, ফেরে ঘণ্টা দুই বাদে। তাই কী ক'রে এ-তরুণীটিকে হাত করল ভেবে পাচ্ছি না। এক একবার মনে হয় যমুনাকে এখানে টেনে এনে আমি ভুল করেছি। তবে আমার সাফাই এই যে, আমি ভেবেছিলাম নার্স হ'লে ওর মনঃকষ্টের রাত পোহাবে, এখনি না হোক দুদিন পরে।

"আমার ভাবনা হয়েছে আরো মুক্তানন্দজির জন্যে। কেন—একটু খুলে বললামই বা। একটু হয়ত অবান্তর, হোক না—চিঠি তো আর কোনো পত্রিকার জন্যে লেখা প্রবন্ধ নয় যে বাহুল্য বর্জনীয়।

"আমার মনে হয় না যে, বিবাহ ক'রে আমার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ভাঁটিয়ে এসেছে। শান্তির পূর্ণিমা মনের সব মেঘ কাটিয়ে হেসে ওঠে নি মানি কিন্তু সংসারের হাজারো বন্ধন দায়িত্ব প্রেম প্রীতিকে বরণ ক'রে আমি আপ্তকাম না হ'লেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হই নি তো, ভগবৎ কৃপার নানা আভাষ পেয়েছি তো—যার ফলে এ-যুগে হিংসাবিদ্বেষের জয় জয়কার সত্ত্বেও আমি মানুষ বা সংসারে বিশ্বাস হারাই নি। কিন্তু তবু আমার মনে হয় মুক্তানন্দজির চিত্তসম্পদ আরো বেশি : ওঁর মুখে এমন একটা আভা আছে যে আভা ভাষণ দেবার সময়ে প্রভা হ'য়ে উঠে আমাকে যেন ধমকায় : 'বেদজ্ঞ হ'য়ে কী হবে যদি ভুলে যাও বেদবাক্য যে, অল্পে সুখ নেই—কেবল ভূমার রাজকোষেই নিত্য-সুখের পরশমণি?' আমার মনে হয় না আমি অল্পাশী, কিন্তু মুক্তানন্দজির মতন সন্ন্যাসী যে একটা উচ্চতর থাকের সাধক একথা অস্বীকার করতে পারি না। কিসের থাক? অটুট ব্রহ্মচর্যের ঐকান্তিক সাধনার, ধ্যানপন্থী তপস্যার।

"কিন্তু যমুনার কথায় ফিরি। ও নার্স ট্রেনিং কলেজে দুদিন গিয়েই ক্ষান্ত হ'ল। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বলল : আমি কাজে মন বসাতে পারছি না, কী করব?' কিন্তু আমি জেরা করা সত্ত্বেও কবুল করল না যে, মুক্তানন্দজিকে ও আদৌ ভুলতে চাইছে না।

"আজ আর নয়, একটা জরুরি কাজে ব্রিস্টল যেতে হচ্ছে কাল কি পরশু এ-চিঠির পুনশ্চ লিখে ডাকে দেব। কিছু লিখবার আছে। ইতি।

"পুনশ্চ। ব্রিস্টলে যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম গিয়ে দেখি সে অসুস্থ। তাই ফিরে এলাম। কিন্তু তোমাকে যেকথা লিখতে চেয়েছিলাম সেটা এখন মুলতবি রেখে বলি এক রীতিমত নাটকের কথা—নাটকের মতন নাটক, অভাবনীয়! যাকে বলে বোমা ফাটা।

"হ'ল কি, আমার মনে হ'ল যমুনার সম্বন্ধে মুক্তানন্দজির সঙ্গে একটা খোলাখুলি কথাবার্তা হ'লে হয়ত আমাকে যমুনার কাছে এত আমতা আমতা করতে হবে না। মার্থাও বলল আমাদের জানা দরকার কোথাকার জল কোথায় চলেছে।

"অথ, আমি সোজা মোটর হাঁকিয়ে গেলাম ওঁর ওখানে। উনি দোর খুলে আমাকে দেখে বললেন: 'আপনি এসেছেন, ভালোই হয়েছে, না এলে আমিই আপনার কাছে যেতাম।' আমি বললাম: 'আমার কাছে? কেন?' তিনি বললেন: 'যেজন্যে আপনি আমার কাছে এসেছেন ঠিক সেই জন্যেই। আসবেন ভিতরে, না বাইরে কোনো রেস্তরাঁতে কথাবার্তা হবে?' আমি বললাম: 'বাইরে? রেস্তরাঁতে কথাবার্তা? ব্যাপার কি?' ঠিক এমনি সময়ে ভিতর থেকে যমুনা এসে বলল: 'সব অপরাধ আমার শাস্ত্রীজি। আমিই চড়াও হ'য়ে সাধুজির কাছে এসেছিলাম···কিন্তু · কিন্তু সত্যিই ওঁর শিষ্যা হ'তে চেয়ে।' আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: কিন্তু ওঁর শিষ্যা তো তুমি হয়েছিলে কলকাতাতেই!'

"মুক্তানন্দজি হাত তুলে যমুনাকে নিরস্ত ক'রে বললেন: ভিতরে আসুন শাস্ত্রীজি। না যমুনা, তুমি যেও না। আমি এমন কিছু বলব না যা তোমার সামনে বলতে বাধে।'

"আমরা ভিতরে এসে বসলাম, কিন্তু মুক্তানন্দজির বৈঠকখানায় নয়, পাশে একটি ছোট ঘরে—যে-ঘরে শুধু বই আর বই। আমরা বসলাম দুটি চেয়ারে, যমুনা একটি ডিভানে।

"আমিই প্রথম কথা কইলাম: "যমুনা আপনার কাছে আসে আমাকে তো বলে নি কোনোদিন!' মুক্তানন্দজি বললেন: 'এখানে ও পরশুদিন আসতে চেয়ে টেলিফোন করেছিল। আমি বলেছিলাম—না। ও শোনে নি হয়ত, জানি না। কারণ তখনই একটা শব্দ শুনলাম—মনে হ'ল ওর রিসীভার হাত থেকে প'ড়ে গেছে। একটু উদ্বিগ্ন হ'তে হয়েছিল বৈ কি। ফের মূর্ছা গেল না কি? আধ ঘণ্টা পরে ঘণ্টা বাজতে দোর খুলে দেখি—যমুনা। কী করি? ওকে বসালাম এই ঘরেই। বললাম: 'তুমি কি শাস্ত্রীজিকে ব'লে এসেছ?' ও ভয়ে ভয়ে বলল: 'না।' আমি বললাম: 'তাহ'লে খুব অন্যায় করেছ। তোমার সমস্ত জীবন সামনে প'ড়ে—তুমি এখন ঝোঁকের মাথায় চললে ডুববে যে!' ওর তখন এমন অবস্থা যে, আমি যে আছি একদম ভুলে গিয়ে বলল: 'গুরুদেব, আমি কোনোদিন পুরুষদের সঙ্গে মিশি নি। একলাই আমার দিন কেটেছে।' মুক্তানন্দজি বাধা দিয়ে বললেন: 'আমি জানি। কিন্তু অতীত অতীত। তুমি এখন সামনের দিকে তাকাও।' যমুনা গাঢ়কণ্ঠে বলল অকুণ্ঠেই: আমার অতীত বর্তমান

ভবিষ্যৎ সব অন্ধকার। অশান্তি আর সইতে পারছি না, গুরুদেব। তাই আপনার পায়ে ঠাঁই চাই। আমার কাছে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আছে। আপনাকে প্রণামী দিতে চাই। কেবল আপনি আমাকে দাসী রাখুন এই মিনতি।' মুক্তানন্দজি বললেন: 'তোমাকে অনেকবার বলেছি—বিষাদকে প্রশ্রয় দিলে যেমন সে মনকে তার তাঁবেদার ক'রে রাখে তেমনি উল্টোদিকে তাকে আমল না দিলে সে টিঁকতে পারে না। তাই গীতায় ঠাকুর খুব জোর দিয়েই বলেছেন অবসাদকে লালন করতে নেই—নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ, ভুলে গেছ?' যমুনা বলল: 'ভুলি নি গুরুদেব! কিন্তু গীতা আমার মনে দাগ কাটে না, মনে হয় শুধু কথা কথা কথা। আমি শান্তি পাই কেবল আপনার ছোঁয়াতে।' মুক্তানন্দজি বললেন: 'না, শান্তি প্রত্যেককেই পেতে হবে নিজের অন্তরাত্মার কাছে—সেই কেবল পারে আমাদের উদ্ধার করতে—যমুনা টুকল: উদ্ধরেদাত্মনাত্মান্—' 'জানি গুরুদেব, চেষ্টাও কম করি নি—রাতের পর রাত আপনার দেওয়া মন্ত্র জপ করেছি, কিন্তু বৃথা। এখানে কাল রাতে বুকের মধ্যে···কিন্তু সে ব'লে কী হবে? আমার কাতর প্রার্থনা আপনি আমার গুরু হোন।' তিনি বললেন: 'অসম্ভব।'

"তখন আমি বললাম: 'কিন্তু তাহ'লে ওকে মন্ত্র দিলেন কেন?' তিনি বললেন সে কথা তো বলেছি আপনাদের খোলাখুলিই: মন্ত্রের শক্তি আমি জানি। অনেকে মন্ত্র জপ ক'রে শান্তি পায় একথাও অকাট্য সত্য। তাই একে ওকে তাকে মন্ত্র দিই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে দিই যে এ গুরুমন্ত্র নয়, ইষ্টমন্ত্র। যমুনা প্রথমে রাজী হয়েছিল এ-সর্তে মন্ত্র নিতে। কিন্তু পরে এত···কী বলব··· চঞ্চল হয়ে উঠল যে আমাকে চ'লে আসতে হ'ল। এখানে এসেও আমি আপনাদের কাউকে খবর দিই নি। যেখানে কাছে থেকে সহায় হ'তে পারব না সেখানে বাধা হ'তে না চেয়েই চ'লে এসেছিলাম। নৈলে কলকাতায় আরো কিছুদিন থাকতাম।' আমি ফের টুকলাম: অপরাধ নেবেন না সাধুজি, কিন্তু এভাবে পালিয়ে পালিয়ে কি সত্যিকার আত্মজিৎ হওয়া যেতে পারে? আমরা সবাই জানি আপনি খাঁটি তপস্বী। কিন্তু সংসারের মাটিতেই মানুষ হয়েছেন তো—মাটিছাড়া সিদ্ধি কি সত্যি হয়?' তিনি বললেন: 'এ-প্রশ্নের মামুলি উত্তর দেব না: যে আত্মজিৎ হওয়ার আগে সকলের সঙ্গে দহরম মহরম করলে ইতো ভ্রষ্টঃ ততোনষ্ট হ'তে হয়। আমার বক্তব্য এই যে, আমি মেয়েদের বলি না তফাৎ যাও, কেবল বলি: দয়া ক'রে বেশি কাছ

ঘেঁষে বোসো না। কিন্তু বলি না শুধু এজন্যে নয় যে আমি এখনো খাটি তপস্বী, নিখাদ সোনা, হ'তে পারি নি, সাবধান হই তীর্থলক্ষ্যে একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছতে। এখানে এসে নানা ধর্মার্থিনীর সংস্পর্শে আসি তাদেরকে মেয়ে নাম দিয়ে বয়কট করতে চাই না ব'লে। কিন্তু আমি এখনো সাধক তো, তাই ভরসা পাই না তাদের বেশি কাছে ডাকতে। কিন্তু আরো একটু বলার আছে আপনার জেরার উত্তরে। শুনুন বলি।' ব'লে একটু থেমে সুরু করলেন: "মেয়েদের সাধারণ তপস্বীরা যে-চোখে দেখেন আমার গুরুদেব তাদের সে-চোখে দেখেন না। তিনি সিদ্ধ তান্ত্রিক, প্রায়ই বলেন: গৃহিণ্যঃ গৃহদীপ্তয়ঃ—এ-সংসারে শ্রী লাবণ্য মাধুরী সুষমার গোমুখী। জগদানন্দের আদিম অরুণোদয় থেকে সংসারে প্রাণের খেলা চ'লে এসেছে মেয়েরা ছেলে নয় ব'লে। এজন্যে শিল্পী কবি মনীষী এমন কি মুনি-ঋষিরাও জয়ধ্বনি করেছেন শ্রীমন্তিনীদের। রুক্ষ তপস্বীরা ভয় পান তাদের একটি বিভাব দেখে—কামিনী বা মোহিনী। কিন্তু মহাপুরুষেরা তাদের বরণ করেছেন মাতা ভগ্নী সখী জায়া কন্যা অন্নপূর্ণা আশাপূর্ণা আরো কত রূপে। যমুনার মধ্যে আমি ভালো অনেক কিছু দেখেছিলাম ব'লেই তাকে মন্ত্র দিয়েছিলাম যাতে দৈবী করুণা পেয়ে সে নিজের অন্তর্লীন নানা সুন্দর সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে, নানা রঙ রস লাবণ্যকে রূপ দিতে পারে যাদের গুণগান করেছেন ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস কতরকম চরিত্রের মাধ্যমে। কিন্তু প্রতি মহৎ বিকাশের পথে নানা বাধা ঘুপটি মেরে থাকে in ambush—তাই যমুনার এই দুর্ভোগ। আমার দুঃখ এই যে পাকে চক্রে প'ড়ে আমিই এ-দুর্ভোগের নিমিত্ত হলাম। কিন্তু এ-দুঃখেরও প্রয়োজন ছিল। আমরা চর্মচক্ষে যা দেখতে পাই না তাকে নাস্তি নাম দিয়ে বাতিল করা বোকামি, কারণ আমরা ইতিহাসে পাই যে, আজ যার দেখা পাইনি অনেক সময়েই কাল পরশু তরশু তার অভ্যুদয়ে চমকে উঠেছি। নিবেদিতার কথাই ধরুন না। এমন শ্রদ্ধাবিশ্বাসের জোর কি দুর্লভ নয়? কিন্তু তবু বলব কুমারী জীবনে তাঁর যে সংশয়ী রূপ ফুটেছিল তার দ্বিধাদ্বন্দ্বই তাঁকে বল জুগিয়েছিল, দুর্বল করে নি, নৈলে তিনি কখনই জন্মযোগী বিবেকানন্দের বানীমূর্তি হ'য়ে হাজার হাজার অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসের প্রেরণা দিতে পারতেন না। এত লেখক তো স্বামীজির জীবনী লিখেছেন, কিন্তু কেউ কি নিবেদিতার মতন ছত্রে ছত্রে তাঁর পূর্ণিমাবিকাশের নিটোল ছবি আঁকতে পেরেছে? বলুন তো,

বিবেকানন্দ যদি তাঁকে কামিনী ব'লে খেদিয়ে দিতেন তাহ'লে কি বৃত্ত সম্পূর্ণ হ'ত? না তাঁর ভারতভক্তি অচলা চপলার স্বর্ণপ্রভায় ফুটে উঠতে পারত যদি না নিবেদিতা একা ঝাঁপ দিতেন দেশাত্মবোধের উত্তাল তরঙ্গে? আমি স্বভাবে ব্রহ্মচারী একথা ঠিক। কিন্তু তাই ব'লে কি বলবেন শ্রীঅরবিন্দের মহিমা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় তিনি বিবাহ করেছিলেন বলে, বা রবীন্দ্রনাথের সূর্য-প্রতিভা ম্লান হয় তিনি মেয়েদের নাগমুখী কীর্তির সুষমার লক্ষ্মীশ্রীর জয়গান করেছিলেন বলে? আমার গুরুদেবের মুখেও শুনেছি যে মেয়েদের দিব্য শক্তি আমাদের দেশে ঝিকিয়ে উঠবেই উঠবে, কিন্তু ততদিন নয় যতদিন তাদের কামিনী রূপকেই আমরা বড় ক'রে দেখব। তন্ত্র এই মহাসত্যটির দিশা পেয়েছে নতুন ক'রে, ঘোষণা করেছে: শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি, মুক্তির্হাস্যায় কল্পতে। গুরুদেব বলেন: তিনি একসময়ে নারীকে মোহিনী ব'লে রোষ ক'রে বলতেন ভগবান্ পুরুষকে বীর্যবান করতেই নারীকে দাঁড় করিয়েছিলেন তার দিব্য জীবনের প্রধান অন্তরায় ক'রে। বাইরে থেকে দেখলে এ-থীসিসকে মেনে না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু তপস্যায় গভীর দৃষ্টির বর পেলে দেখা যায় নারীর এক দিব্যরূপ যার হাতে অমৃতের পাত্র, চোখে প্রেমের জ্যোতি, বক্ষে শান্তির শতদল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিদ্যুতের আভা। তাঁর কৃপায়ই আমি এ-সত্যের দেখা পেয়েছি, কিন্তু একটু আভাষ মাত্র। যেদিন পূর্ণ দৃষ্টি পাব সেদিন··· সেদিন কী দেখব জানব কী ক'রে? তবু জানি যদি সত্যনিষ্ঠ আর একান্তী হই তবে সফল সাধন হবই হব।'

"স্বামীজির কণ্ঠে কিসের ঝঙ্কার বেজে উঠেছিল বলতে পারি না। বুকের রক্তে আমার তুলে উঠল এক সম্ভ্রমের স্পন্দন। চোখের জল মুছে উঠে তাঁকে আমি প্রণাম করলাম এই প্রথম। তিনি আমাকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন: "করেন কী শাস্ত্রীজি···!'

'যমুনা চোখের জলের নদী বইয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল, বলল: 'আপনি আমাকে গ্রহণ করুন, গুরুদেব। আর আমাকে ফিরে যেতে বলবেন না আলো ছেড়ে অন্ধকারের রাজ্যে। আমি কথা দিচ্ছি—আপনি না ডাকলে আমি আপনার কাছে আসব না, দূর থেকে আপনাকে প্রণাম করেই চলে যাব।'

"আমি কেমন যেন হতভম্ব হ'য়ে গেলাম। এই কি সেই সুশীলা সুভদ্রা মেয়ে যাকে কলকাতায় দিনের পর দিন দেখতাম সংযমের প্রতিমূর্তি? প্রতিমা একবার আমাকে বলেছিল মৃদু হেসে: না বাবা, ওর মনের মধ্যে নানা ঘূর্ণি

পাক খাচ্ছে। ও নিজেকে এখনো খুঁজে পায়নি।' উত্তরে আমি বলেছিলাম: 'নিজের পরিচয় পাওয়া কি সহজ মা?' যমুনার আত্মহারা ভাব দেখে মনে পড়ল আমার প্রবীণ মন্তব্য। ওর যেন বিশ্ব ভুল হয়ে গিয়েছিল—উচিত অনুচিত, ঠাট ঠমক কে কী ভাববে না ভাববে সব যেন ওর মন থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল; যেমন মশালের আলোয় লুপ্ত হয় প্রদীপের ক্ষীণ শিখা। শুধু এক কান্না ওকে যেন চাবুক মেরে চালাচ্ছিল—যেমন করেই হোক মন্ত্রদাতাকে গুরু ব'লে লুটে নিতে হবে। আমাকে ও সমীহ করত, কিন্তু তখন ওর সমগ্র চেতনা যেন গুরুমুখী হ'যে ওকে পাগল করে তুলেছিল।

"মুক্তানন্দজিও হকচকিয়ে গেলেন—প্রায় কিংকর্তব্য বিমূঢ়। ওকে দুবাহু ধ'রে তুলে ডিভানে বসিয়ে ওর সামনে একটা চেয়ার টেনে ব'সে ওর মাথায় হাত দিয়ে বললেন: 'কাঁদে না মা। আমি ··আমি সত্যি বুঝতে পারি নি। আজ প্রথম আমার চোখ খুলল, দেখতে পেলাম গুরুকে তোমার দরকার যেমন শিশুর দরকার মাকে। তাই তোমার প্রার্থনায় আমি আজ সাড়া দেব—মানে যতটা পারি। তাই উতলা না হ'য়ে শোনো—আমি পরে লিখেও তোমাকে জানাব তুমি তোমার ডায়রিতে লিখে রেখো—কেমন। মনে থাকবে?

"ওর চোখ মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, বলল হেসে: 'থাকবে গুরুদেব। যদি চান আপনি বলুন আমি টুকে নিচ্ছি এখনই।' মুক্তানন্দজি হেসে বললেন: 'না মা, আমি ড্রামার ভক্ত হ'লেও মেলোড্রামায় বিশ্বাস করি না। শাস্ত্রীজি এখানে উপস্থিত আছেন, ভালোই হ'ল। তুমি লিখে তাঁকে দেখিও সাক্ষী মেনে। এবার মন দিয়ে শোনো। গুরুদেব আমাকে হুকুম দিয়েছেন ব'লেই আমি এদেশে এসেছি, সাধ ক'রে আসি নি। এদেশের আবহ আমার ভালো লাগে না। কিন্তু এদেশের নরনারীর প্রাণশক্তিতে আমি সাড়া না দিয়ে পারি না। মরুক গে। গুরুদেব বলেন মেয়েদের অস্পৃশ্যা করে রেখে যে-সিদ্ধি তার চেয়ে বড় সিদ্ধি তাদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে চিত্তশুদ্ধি বজায় রাখা। কিন্তু অনেক উচ্চকোটির সাধকও এ-পরীক্ষা পাশ করতে পারেন নি ব'লে সদ্‌গুরু মেয়েদের তফাতে রাখতে বলেন। আমাকে তিনি প্রত্যাদেশ দিয়েছেন মেয়েদের সঙ্গে মিশতে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা করতে নয়, মন্ত্র দিতে কিন্তু গুরু হ'য়ে উচ্চাসনে বসতে নয়। বলেছেন উপস্থিত আমি যেন এর বেশি অগ্রসর না হই, তবে এমন দিন আসবে—যদি ভাবের ঘরে চুরি না করি—যেদিন শিষ্যাদের সঙ্গেও স্বামী বিবেকানন্দের মতন এক নৌকায় রাত কাটাতে

পারব। তাই তোমাকে আবার বলছি—তোমার সঙ্গে আমার লেনদেন হবে শুধু গুরুশিষ্যার, তার একচুলও বেশি নয়। বুঝেছ?' যমুনার মুখের মেঘ কেটে গেল, ঢিপ ক'রে তাঁকে প্রণাম করল। তারপর উঠে হাতজোড় ক'রে বলল: 'তাহলে আপনাকে গুরু ব'লে বরণ ক'রে ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ গেয়ে চলতে পারি?' তিনি বললেন: 'পারো, যদি আমার কাছে কেবল ধর্মের নির্দেশ চাও, অর্থাৎ কথা দাও—আমাকে শুধু তোমার যোগ সাধনার সহায় ব'লে বরণ করবে।' যমুনা হাসিমুখে বলল: 'দিচ্ছি গুরুদেব, দিচ্ছি দিচ্ছি দিচ্ছি—তিন সত্যি ক'রে। কেবল আপনিও কথা দিন যে, আমাকে পায়ে ঠেলবেন না···আর···আর আমাকে আপনার সেবার অধিকার দেবেন।' তিনি অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন: ''সেবা? আমি কারুর কাছ থেকেই পার্সনাল সেবা গ্রহণ করি না।' যমুনা একটু চুপ ক'রে থেকে ম্লানমুখে বলল: 'কিন্তু ইম্পার্সনাল সেবা কি সোনার পাথরবাটি নয়?' তিনি বললেন: 'কেন? তুমি···তুমি ধরো আমার নানা কথা টুকে রাখতে পারো—মানে যদি চাও কিম্বা···' যমুনা পাদপূরণ করল: 'আপনার নানা ভাষণ টাইপ করা?' তিনি বললেন: 'তুমি কি ভালো টাইপ করতে পারো?' যমুনা হেসে বলল: 'একবার পরখ ক'রে দেখুন না—সন্দেহ ভঞ্জন হবে।' আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: 'টাইপ্ করতে তুমি শিখলে কবে?' যমুনা বলল: 'দিদি আমাকে শিখিয়েছিলেন। তিনি বলতেন প্রতি মেয়েরই টাইপ্ করতে শেখা কর্তব্য।' মুক্তানন্দজি এবার অকুণ্ঠে সায় দিলেন, বললেন: 'বেশ, তুমি আমার বিনি মাইনের টাইপিস্ট পদে বাহাল হ'লে আজ থেকে।' যমুনা ফের প্রণাম ক'রে বলল: 'কেবল আর একটি অনুরোধ: আমার হাতে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আছে, আপনাকে প্রণামী দিতে চাই।' স্বামীজি তার মাথায় হাত রেখে বললেন: 'সে দেখা যাবে। এখন তুমি সেটাকা তোমার নিজের নামেই রাখো কোনো ব্যাঙ্কে, আর ··আর লণ্ডনে উপস্থিত কিছুদিন শাস্ত্রীজির ওখানেই থেকো—অবশ্য যদি তিনি রাজী থাকেন।' আমি তাঁকে নমস্কার করে বললাম: 'সানন্দে, স্বামীজি!'

"বোমা ফাটা আর কার নাম বাবা?" ইতি।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

শ্রীমন্ত প্রতিমার সঙ্গে শাস্ত্রীজির সুদীর্ঘ পত্রটি প'ড়ে বলল: "আনাতোল ফ্রাঁসের একটি উক্তি মনে পড়ল: যে, কোনো শ্রীমন্তিনী যদি কোনো ছুটন্তকেও আঁকড়ে ধরে তবে সে-ভুজবন্ধনের ফল এক ছাড়া দুই হয় না।"

প্রতিমা (সব্যঙ্গে): আহা! আর যদি কোনো শ্রীমন্ত কোনো শ্রীমন্তিনীকে হাতছানি দেয়? বশীকরণ বিদ্যায় কে বেশি পোক্ত?

শ্রীমন্ত: যমুনার মতন চাল দিতে কি পারতাম আমি?

প্রতিমা: মরি মরি! আমি তো গায়েব হয়েছিলাম বিদেশে। আমাকে জেনেভা থেকে টেনে বার ক'রে লণ্ডনেই উলুধ্বনির বন্দোবস্ত করার চাল দিলেন কোন পুরুত শুনি! কিন্তু ঠাট্টা থাক। মা কাল টেলিফোনে বলেছেন লণ্ডনে আসতে অন্তত মাসখানেকের জন্যে। এখন তো পুজোর ছুটি, চলো না ঘুরে আসি।

শ্রীমন্ত: মানে কৌতূহল—এই তো?

প্রতিমা: ফের ঠাট্টা যমুনার জীবনমরণ পণ নিয়ে? না, ওর জন্যে সত্যি আমার মন কেমন করছে।

শ্রীমন্ত: মন কেমন করা নয় দরদিনী। বলো—জানতে ইচ্ছে করছে—কোথাকার জল কোথায় গড়িয়েছে। সত্যি বলো তো?

প্রতিমা: এবার তুমি খাস অন্তর্যামীর ঢঙে টিপ্পনি কেটেছ। কিন্তু হাসিমস্করা থাক, মুক্তানন্দজির "লেটেস্ট" রূপ আমি দেখতে চাই নয়ন ভ'রে।

শ্রীমন্ত: এবার ঠাট্টা করছে কে শুনি?

প্রতিমা: ঠাট্টা নয়। শার্লক হোম্‌সের ভাষায়—"These are deep waters, watson!" না, সত্যি বলছি—আমি ঠাট্টা করতে চাই নি। মুক্তানন্দজি যে শুদ্ধাচারী সাড়ে পনেরো সাধক এ আমিও বিশ্বাস করি।

শ্রীমন্ত: আধ আনা বাদ গেল ওঁর কী অপরাধে?

প্রতিমা: উনি যমুনার প্রণামী নিলেন কেন?

শ্রীমন্ত: এতে দোষের কী আছে? যমুনার যখন সব ভার নিয়েছেন…

প্রতিমা : সব ভার নিয়েছেন মানে? তাকে তো সাফ ব'লে দিয়েছেন শুধু তার সাধনার সহায় হ'তেই তিনি তাকে শিষ্যাবরণ করেছেন। তাহলে বেচারী মেয়ের শেষ সম্বলটুকুও হাতালেন কেন? মনে রেখো—এখানে শুধু কামিনী না, কাঞ্চনও এসে গেল।

শ্রীমন্ত : সন্দেহ তোমাদের বাতিক। কই, একথা আমার তো একবারও মনে হয় নি! তাছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস—যমুনা যদি কাউকে বিবাহ করে তবে ও-গুরুদক্ষিণাটা মুক্তানন্দজি তাকে যৌতুক হিসেবেই ফিরিয়ে দেবেন।

প্রতিমা : শ্রীমন্ত, শ্রীমন্ত, শ্রীমন্ত! তোমার সরলতা দেখে হেসে কুটি কুটি হই বটে, কিন্তু চোখ কপালে তুলে তোমাকে সমীহও করি ঠিক ঐ একই কারণে। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছ, অভাবে কখনো পড়ো নি, যাই চেয়েছ পেয়েছ—এমন কি যাকে চাও নি সেও তোমার গলায় মালা দিয়েছে···

শ্রীমন্ত : অমন কথা ঠাট্টা ক'রেও বলতে নেই। তোমার মালার মার্ফৎ শুধু যে তোমাকে পেয়েছি তাই তো নয়—আরো কত কী পেয়েছি—তুমি কী জানবে?

প্রতিমা (কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে) : জানিয়ে দাও না, লক্ষ্মীটি!

শ্রীমন্ত : ফের সেই দুরন্ত কৌতূহল? মনে রেখো—সাহেব পুরাণে বলে : Curiosity killed a cat!

প্রতিমা (সাভিমানে) : সাহেবপুরাণে মেয়েদের প্রায়ই cat বলা হয়। যাও! (দূরে স'রে বসে)

শ্রীমন্ত (প্রতিমার দুহাত মাথায় ঠেকিয়ে) : খুঁটি ছেড়ে যাব কোথা শুনি?

প্রতিমা : কেন মিসেস Owl-দের কাছে যাদের কোনো কিছুতেই কৌতূহল নেই।

শ্রীমন্ত (হেসে) : Bird of paradise-এর সঙ্গে দুবৎসর ঘর করার পরে কেমন ক'রে মিসেস Owl-এর মুখভার সইব বলো দেখি? কিন্তু ঠাট্টা থাক। তোমার লণ্ডন-প্রয়াণে আমার পুরো সায় আছে—আরো এই জন্যে যে, নিশান্ত লিদিয়ার সঙ্গে আমেরিকা ঘুরে ফিরেছে লণ্ডনে। সেখানে আসর জমবে ভালো।

প্রতিমা : বেশ বেশ। যমুনারও একটু ছুটি চাই তো। কিছুদিন আগে মা ফোনে বলেছিলেন মুক্তানন্দজি পার্টি ডিনার সিনেমা থিয়েটার কোথাও

যান না। যমুনা তাঁর কথামৃত টাইপ ক'রে ক'রে নিশ্চয় হাঁপিয়ে উঠবে আজ না হোক দুদিন বাদে।

শ্রীমন্ত : কী বাজে কথা বলছ? যমুনা তাঁকে সত্যিই ভালোবেসেছে।

প্রতিমা : কিন্তু তিনি তো যমুনাকে ভালোবাসেন না।

শ্রীমন্ত : কেমন ক'রে এ-সিদ্ধান্ত করলে জানতে পারি কি?

প্রতিমা : এ-গুরুটি শিষ্যার সেবা চান কিন্তু প্রেম চান না ব'লে।

শ্রীমন্ত : এ তোমার অন্যায় আবদার প্রতিমা। ধরো, এক গুরুর আটটি শিষ্যা। তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ না হ'লে কি এতগুলি শিষ্যার প্রেমের চাপে মাথা তুলতে পারবেন?

প্রতিমা (রেগে) : তুমি সব কিছুতেই হাসি ঠাট্টা ক'রে হাল্কামির স্রোতে গা ভাসিয়ে চলো।

শ্রীমন্ত : নিবেদিতা কি আদর্শ শিষ্যা ছিলেন না?

প্রতিমা : ছিলেন একশোবার। কিন্তু তিনি আদর্শ শিষ্যা হয়েছিলেন কেমন ক'রে? শুধু স্বামীজির সেবা ক'রে, না সেই সঙ্গে তাঁর ভালোবাসা পেয়ে? কালই আমি স্বামীজির পত্রাবলী পড়ছিলাম। একটি পত্রে তিনি নিবেদিতাকে লিখেছেন : "তোমার প্রত্যেক কথাটি আমার কাছে মূল্যবান, তোমার প্রত্যেক চিঠি একশোবার স্বাগত···যা প্রাণ চায় লিখো, জেনো তোমার কোনো কথারই আমি ভুল ভাষ্য করব না, সব কিছুই সাদরে বরণ করব"—এই দেখ স্বামী নিখিলানন্দের "বিবেকানন্দ"—(উজিয়ে উঠে) Every word you write I value and every letter is welcome a hundred times. Write whenever you have a mind and opportunity, and whatever you like, knowing that nothing will be misinterpreted, nothing unappreciated." একে যদি ভালোবাসা না বলো তবে আমি নাচার···(থেমে) কী দেখছ একদৃষ্টে?

শ্রীমন্ত : তোমাকে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানের শেষে আছে :

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি'···

সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হ'য়ে রবো মরি'।

জানো প্রতিমা, আমার অনেকবারই মনে হয়েছে কবিরা শুধু দেখতেই শেখান না, ভালোবাসতেও শেখান। আমি সত্যি নিজেকে আবিষ্কার করেছি প্রথম তোমার প্রেমে ডুব দিয়ে।

প্রতিমা : আর আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছি প্রথম কবে জানো? যেদিন তোমাকে ভালোবেসে তোমাকে ভালোবাসিয়াছি শুধু আমাকে নয় অভয়কে। আমার মনে হয় সত্যিকার প্রেমের সেরা অভিজ্ঞান অভয়...(ক্রিং ...ক্রিং...ক্রিং...)

শ্রীমন্ত (টেলিফোনে) : কে?

মার্থা (টেলিফোনে) আমি মার্থা। শাস্ত্রীজির চিঠি পেয়েছ তো?

শ্রীমন্ত : পেয়েছি। কী ব্যাপার?

মার্থা : ব্যাপার গুরুতর। মুক্তানন্দজি একমাসের জন্যে আমেরিকা যাচ্ছেন। সেখানে দশবারোটা লেকচার দিয়ে ফিরবেন। যমুনাকে তিনি নিয়ে যেতে চান না, তাই যমুনা বিষম কাঁদছে আর কেবল দিদি দিদি করছে। নিশান্ত ও লিদিয়া গত সপ্তাহে এসেছে এখানে আমেরিকা ঘুরে। তারা ওকে নিয়ে যেতে চায় সুইজর্লণ্ড। কিন্তু ওর কেবল এক ধুয়ো : দিদি।

শ্রীমন্ত : আমরা এমনিই লণ্ডনে যাব ভাবছিলাম···

প্রতিমা (টেলিফোনে) : আমি শুনেছি মা তোমার কথা। পরশু তরশুই রওনা হব। যমুনাকে বোলো ভয় নেই, আমরা এলাম ব'লে। খুব আনন্দ হচ্ছে মা ফের দেখা হবে ভাবতে।

॥ আটত্রিশ ॥

যমুনা বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে ছিল। প্রতিমা ঘরে ঢুকতেই ও "দিদি দিদি গো!" বলে উঠতেই ট'লে পড়ল·· মূর্ছা।

প্রতিমা (মা-কে) : কী ব্যাপার মা? হিস্টিরিয়া?

মার্থা : ওর কান্নাকাটির মধ্যে হিস্টিরিয়ার আমেজ তো আছেই। তবে এবার যেন একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে।···ও কি কিছু লিখেছে তোমাকে?

প্রতিমা : কদিন আগে তার করেছিল—ও ধন্য হয়ে গেছে সাধুজি ওকে শিষ্যার পদে বাহাল করেছেন ব'লে।

মার্থা : তখন বোধহয় মুক্তানন্দজি আমেরিকায় যাওয়া স্থির করেন নি।

শাস্ত্রীজি : আর একটু পুনশ্চ আছে : আমার মনে হয় তিনি ওকে ধম্‌কেছেন।

শ্রীমন্ত (চম্‌কে) : ধম্‌কেছেন! কেন?

শাস্ত্রীজি : তা জানি না। তবে মার্থার কাছে ও বলেছে—তিনি নাকি ওকে মনে করিয়ে দিয়েছেন ও তাঁকে কী কথা দিয়েছিল।

প্রতিমা : অর্থাৎ, ও শুধু তাঁর শিষ্যা, তার বেশি না?

শাস্ত্রীজি : উঁহু : আমার মনে হয় আরো কিছু ঘটেছিল, মানে, ওর ভাবান্তর…কিন্তু খুব সাবধান · বকাঝকা একদম না…

প্রতিমা : জানি বাবা, আর আমি ওকে শাসন করতে আসি নি। তবে বর্তমান পরিস্থিতিটা আমি জানতে চাই। মুক্তানন্দজি কি আমেরিকা চ'লে গেছেন?

শাস্ত্রীজি : জানি না আমরা ওকে নিয়েই ফাঁপরে পড়েছি…পাগল টাগল না হয়ে যায়…

প্রতিমা! না বাবা। ও অনেক দুঃখ পেয়েছে। ওকে যত দুর্বল দেখায় ও তত দুর্বল নয়। কেবল একটা কথা জানতে ইচ্ছা হয় : মুক্তানন্দজি ওকে আমেরিকা নিয়ে গেলেন না কেন—বিশেষ ওর দশ হাজার টাকা প্রণামী নিয়ে?

শাস্ত্রীজি : ওঁর উপর অবিচার কোরো না মা। বলতে কি, যমুনার প্রণামী যে উনি গ্রহণ করেছেন এমন কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত করেন নি। আমাকে বেশ খোলাখুলিই বলেছিলেন আপাতত ওর টাকাটা এখানে ওরই নামে কোনো ব্যাঙ্কে জমা রাখতে।

শ্রীমন্ত (প্রতিমাকে) : দেখলে তো? (শাস্ত্রীজিকে) আমি প্রতিমাকে বলেছিলাম মুক্তানন্দজি সাঁচ্চা সাধু, কামিনী বা কাঞ্চন চান না, কারণ তিনি যা পেয়েছেন তার দাম অনেক বেশি।

প্রতিমা : আমি শ্রীমন্তকে পাল্টে বলেছিলাম বাবা, যে ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে—মানুষ আজ যা চায় না কাল তারই জন্যে লালায়িত হ'য়ে ওঠে।

শ্রীমন্ত : প্রতিমার সব ভালো কেবল সবাইকেই একটু বেশি বাজিয়ে নিতে চায়; আসামীকে বেনিফিট অফ দি ডাউট দিতে চায় না।

শাস্ত্রীজি : তা নয় বাবা, তবে কি জানো? টাকার টান বড় সহজ টান নয়। দান্তে বলেছিলেন : প্রেমই ঘোরায় সূর্য চন্দ্র তারাকে। কিন্তু এ-যুগের দার্শনিকদের রায় এই যে সবাই ঘুরছে টাকার চারদিকে। কত সাধু

সন্ত অর্থকে মুখে অনর্থ ব'লে গাল দিয়ে অন্দরে তাকেই মনে করেন পরমার্থ তার স্ট্যাটিস্‌টিক সংগ্রহ করা যায় না এজন্যে তাঁরা যে মনে মনে ঠাকুরকে ধন্যবাদ দেন এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

প্রতিমা: শ্‌…শ্‌…যমুনার চোখের পাতা নড়ছে।

শাস্ত্রীজি ও কিছু না, মূর্ছার পরে ও ঘুমিয়ে পড়ে। এখন যদি চোখ মেলে তাহ'লেও ওর সম্বিৎ ফিরে আসবে না। তাই (প্রতিমাকে) তোমরা এখন জিরোও। পরে কথা হবে।

শ্রীমন্ত: মুক্তানন্দজির সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

শাস্ত্রীজি: তিনি খুব ব্যস্ত আছেন। তবে টেলিফোন করব। তিনি অতি ভদ্র, হয়ত রাজী হবেন দেখা করতে।

॥ উনচল্লিশ ॥

ডাক্তার এসে যমুনাকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে ব'লে দাওয়াই দিয়ে চ'লে গেলেন। প্রতিমা শ্রীমন্তকে বলল: "ওকে এখন কোনো কিছু না বলাই ভালো। কারণ সান্ত্বনা দিতে গেলেও উল্টো উৎপত্তি হ'তে পারে।"

মার্থাও যমুনার প্রসঙ্গ তুলল না। শাস্ত্রীজিকে যেতে হ'ল এক ছাত্রাবাসে। শ্রীমন্ত দু'তিনবার মুক্তানন্দজির ওখানে টেলিফোন ক'রে জবাব না পেয়ে প্রতিমাকে নিয়ে বেরুল বিলিয়ার্ড ম্যাচ দেখবে। খেলা দেখে ওদের মন একটু একটু ক'রে প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল।

ফিরতে রাত আটটা। মার্থা ওদের সঙ্গে বসল ডিনারে। কিন্তু কথাবার্তা জমল না। শ্রীমন্ত মার্থাকে বলল: "আমি খুব ভুল করেছিলাম ওকে এখানে পাঠিয়ে।"

মার্থা: মোটেই না। তবে জানোই তো man proposes but god disposes.

ক্লান্ত হয়ে ওরা নটার মধ্যেই শুয়ে পড়ল। আর শুয়েই ক্লান্তিহারিণী নিদ্রা…

*   *   *   *

পরদিন সকাল আটটায় প্রতিমা শ্রীমন্তকে নিয়ে যমুনার ঘরের দোরে টক টক টক ক'রে শোনে : "এসো।"

প্রতিমা ঢুকতেই যমুনা ছুটে ওর বাহুবন্ধনে "দিদি দিদি" ব'লে ধরা দেয়। তারপরেই কান্না···

প্রতিমা : ডাক্তার তোমাকে বিশ্রাম নিতে বলেছে···

যমুনা : কিন্তু সাধুজি কাল পরশুই নিউয়র্ক রওনা হচ্ছেন। এ-লেকচার-গুলির কপি আমি রাখতে চাই।

প্রতিমা : আচ্ছা, সে হবে। আমি টাইপ ক'রে দেব। তুমি বিশ্রাম করো ··ডাক্তার ব'লে গেছে···ঘুমোও আরো—যত পারো।

যমুনা : আমি রাতে বেশ ঘুমিয়েছি দিদি···

শ্রীমন্ত : তবে চোখ ফোলা কেন?

যমুনা : এই যে দাদাও···(প্রণাম করে)

শ্রীমন্ত : দাদা যে দিদির শিষ্য জানো না?

যমুনা : শিষ্য শিষ্যা হ'লেই হয় না দাদা, ভাগ্যের সুপারিশ চাই এ-যুগে।

প্রতিমা (শ্রীমন্তকে চোখ টিপে) : ওকে বলো না আমাদের স্কুলে ছেলেমেয়েরা কী বলাবলি করে ওর সম্বন্ধে।

যমুনা : বলে আমার কথা? সত্যি দাদা?

শ্রীমন্ত : শুধু বলে না। ঝগড়াঝাঁটি হ'লে প্রায়ই পরস্পরকে শাসায়। যমুনাদি এলে ব'লে দেব।

যমুনা (বিষণ্ণ) : দিদি, আমি খুব ভুল করেছিলাম তোমাদের ছেড়ে এসে। সেই পাপেরই এই শাস্তি।

শ্রীমন্ত : থাক এ-প্রসঙ্গ···

প্রতিমা : না, থাকবে না। কেবলই কি ভয়ে ভয়ে চুপটি ক'রে থাকতে হবে? যমুনা! তোমাকে শক্ত হ'তেই হবে, নৈলে আমি ছাড়ব না। বলো আমাকে কী ব্যাপার?

শ্রীমন্ত : কেন অনধিকার-চর্চা?

প্রতিমা (আরক্ত মুখে) : অনধিকার-চর্চা? মোটেই নয় বোনের ফাঁড়া সঙিন হ'লে দিদি হাত গুটিয়ে ব'সে থাকতে পারে না। (যমুনাকে) বলো খুলে শান্ত হ'য়ে। মুক্তানন্দজি আমেরিকা যাচ্ছেন এই না? না আরো কিছু আছে?

যমুনা (একটু পরে) : আমেরিকা যাওয়া ওঁর স্থগিত রাখতে হয়েছে, কিছুদিন পরে যাবেন বললেন। কাল গেছেন এডিনবরায় এক সেমিনারে গীতা সম্বন্ধে কিছু বলতে।

প্রতিমা : তা তোমাকে নিলেন না কেন ?

যমুনা : তিনি আর একজন শিষ্যাকে নিয়েছেন—তাঁর সেক্রেটারি।

প্রতিমা : আর তুমি ?

যমুনা (ম্লান হেসে) : শুধু হুকুমবরদার, দিদি।

প্রতিমা : শুনলাম নিশান্ত ও লিদিয়া সুইজর্লণ্ড যাচ্ছে, তোমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তুমি যেতে রাজী হ'লে না কেন ?

যমুনা : গুরুদেবের অনুমতি নিই নি যে।

প্রতিমা (আতপ্ত কণ্ঠে) : এর নাম বুঝি আদর্শ শিষ্যা ? গুরু যেখানে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা যাবেন, আর শিষ্যা খুঁটিতে বাঁধা থাকবে তাঁর পথ চেয়ে ?

শ্রীমন্ত : কী বলছ প্রতিমা ? যমুনা ওঁকে কথা দিয়েছে...

যমুনা : হ্যাঁ দিদি, কথা দিয়ে কথা রাখি নি, অন্যায় আবদার করেছিলাম, শাস্তি হবে না ?

প্রতিমা : মেয়েদের চেনে কেবল মেয়েরাই—**only a hen knows how hens hatch** : তিনি আর এক সেক্রেটারিকে সঙ্গিনী করেছেন···

যমুনা : লক্ষ্মীটি দিদি···(প্রতিমার কোলে ভেঙে পরে কান্নায়)

প্রতিমা : কাঁদে না বোন। (মাথায় হাত বুলিয়ে) তবে **now that you have made your bed you have to lie on it.**

যমুনা (মুখ তুলে চোখ মুছে) : জানি দিদি, তবে অদৃষ্টে তুমি বিশ্বাস না করলেও আমি করি।

প্রতিমা : না, অদৃষ্টবাদ হ'ল হায়-হায়-বাদ। এইজন্যেই আমি সইতে পারি না যখন কেউ গণৎকারের কাছে যায় কাল কী হবে আজই জেনে নিতে। শেক্সপীয়রের দাবড়ি আমার।

The fault, dear Brutus, is not in our stars
But in ourselves that we are underlings.*

* নক্ষত্রেরা নয় বন্ধু, নিয়ন্তা জীবনে আমাদের :
আমরাই গড়ি হায়, আমাদের দাসত্ব-নিগড়।

যমুনা : দিদি, একথা তোমার মুখে মানায়। কেবল দুঃখ এই যে সাড়ে পনেরো আনা মানুষ বাধা হুমকি দিলে এগুতে ভয় পায়। এ আমার কথা নয়, গুরুদেব প্রায়ই বলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এমন কথাও বলেন—এই যে তাঁর পরশুদিনের ভাষণ (টাইপ করা পাতা থেকে পড়ে)

Aye, even if the avalanches come

Hurtling against thee time and again, thou must

Never, O son of strength, admit defeat

মূল সংস্কৃত শ্লোকটি হ'ল :

বিঘ্নৈঃ পুনঃপুনরপি প্রতিহন্যমানা

প্রারব্ধমুত্তমগুণা ন পুনস্ত্যজন্তি।

প্রতিমা (চমকে) : এ তো চমৎকার—to the point! কিন্তু এর পরে তুমি হাল ছেড়ে দিয়ে ভিরমি যাচ্ছ কী দুঃখে ? গুরুসেবা মানে কি বাঁদী হওয়া—না তাঁর নির্দেশে কাঁটাবনে পথ কেটে চলা ? তাছাড়া একটা কথা তোমার মনে রাখতেই হবে : যে, যুগ যুগ ধ'রে আমাদের বলা হয়েছে "অবলা"। এযুগের মেয়েদের সব ভালো বলি না, কিন্তু তাদের অভিধানে যে অবলা বিশেষণটি বাতিল করা হয়েছে তার জন্যে তাদের অভিনন্দন না ক'রে পারি না।

যমুনা : কিন্তু আমরা কি খতিয়ে অবলা নই দিদি ?

প্রতিমা : (ঝোঝালো সুরে) : কক্ষনো না। বাবার মুখে শুনেছি—শক্তির একটি সেরা বিভূতি হচ্ছে সইতে পারা, নুয়ে না পড়া। সহনশক্তিতে কি পুরুষেরা আমাদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে! ধেৎ! পেটে একটা ফোড়া হ'লে ওরা ভয়ে সারা হয়, কিন্তু আমরা যমজ শিশুরও জন্ম দিই হেসে খেলে। গরিবের ঘরে আমরা জন্মাই নি। কিন্তু গরিব গৃহস্থীদের কি দেখি নি উঠতে বসতে ? এ-অনটন অনশনের কষ্ট কি পুরুষেরা সইতে পারত যদি মেয়েরা বারোআনা ভার না বইত ?

যমুনা : দিদি, তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল "অভয়া"। প্রতিমা নরম নাম, তোমাকে মানায় না। কিন্তু আমি জন্মদুঃখিনী দিদি, তাই দিদির মতন দিদি আর গুরুর মতন গুরু পেয়েও কান্নাকাটি করি, গীতার কথা মেনেও বলতে পারি না হার মানব না। তবে দিদি, তুমি যখন এসেছ আমাকে শক্তি দিতে তখন আমি আর অদৃষ্টবাদ মানব না, বলব না : "হালের কাছে

মাঝি আছে করবে তরী পার”—চেষ্টা করব নিয়তিকে দুয়ো দিতে তোমার পায়ের ধুলোর জোরে। (ফের উদ্গত অশ্রু দাবিয়ে) হ্যাঁ, আমি যাব সুইজর্লণ্ডে লিদিয়ার সহচরী হ'য়ে। সে সত্যিই চমৎকার মেয়ে।

প্রতিমা: শুধু চমৎকার নয়, অভয়া নামের যোগ্য—আমার চেয়ে বেশি, কারণ আমার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ পেয়েছে।

যমুনা: সে কি? অমন গোলাপী মেয়ে?

প্রতিমা সংক্ষেপে লিদিয়ার ইতিহাস বলল। শুনে যমুনার ভাবান্তর হ'ল যেমন প্রায়ই হ'ত। হঠাৎ প্রতিমার পায়ে ঢিপ ঢিপ ক'রে মাথা ঠুকে বলল: “না দিদি, প্রণাম আমি করবই করব। প্রণাম ক'রে মানুষ বল পায়। গুরুদেবও প্রায়ই বলেন একথা। এখন থেকে লিদিয়াকেও প্রণাম করব।

টক···টক···টক

যমুনা উঠে দোর খুলতেই মার্থার প্রবেশ। যমুনা অমনি মার্থাকে প্রণাম করে। মার্থা সশব্যস্তে পেছিয়ে বলে: “কী ব্যাপার?”

যমুনা (হাসিমুখে) সে পরে বলব।

মার্থা (হেসে যমুনাকে আলিঙ্গন ক'রে): ব্রেকফাস্টের একটু দেরি হয়ে গেল।

প্রতিমা (মার্থাকে জড়িয়ে ধ'রে): তুমি অন্তর্যামিনী মা, তাই দেরি করেছ ব্রেকফাস্ট দিতে। নৈলে আমাদের কথা শেষ হ'ত না।

মার্থা (চুম্বন ক'রে): তোমার কথা যে শেষ হয় মা, এই প্রথম শুনলাম।

(ত্রয়ীর কোরাসে কলহাস্য)

॥ চল্লিশ ॥

পরদিন সকালে নিশান্ত টেলিফোন করল হ্যাম্পস্টেড থেকে। শাস্ত্রীজি তাকে আর লিদিয়াকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলেন। নিশান্ত সানন্দে বলল: “বহু ধন্যবাদ, শাস্ত্রীজি। কিন্তু আমরা লাঞ্চের ঘণ্টাখানেক আগে যাব, শ্রীমন্তর সঙ্গে আমার একগঙ্গা কথা আছে।”

*　*　*　*

শ্রীমন্ত : এমন ঘরনী পেয়েও ঘরে মন বসছে না কেন? টো টো ক'রে ঘুরবে আর কতকাল?

নিশান্ত : আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের ration সেই থোরবাড়িখাড়া আর খাড়াবড়িথোড় তো। তাই যতটা পারি চুষে নিই বিশ্বমানবিক তরি-তরকারি। মেক্সিকোর রান্না—আহা কী বলব ভাই? "মনে হ'লে প্রেমধারা বহে তুনয়নে"।

প্রতিমার প্রবেশ, সঙ্গে যমুনা। যমুনা এগিয়ে এসে লিদিয়াকে প্রণাম করে ঢিপ ক'রে।

লিদিয়া (সবিস্ময়ে) : এ কী ব্যাপার?

প্রতিমা : সে-ব্যাখ্যা হবে পরিশিষ্টে। উপস্থিত তোমাদের তুই বন্ধুর কথায় গঙ্গা ঝরুক, আমরা পান করি।

শ্রীমন্ত : পারবে না প্রতিমা। আগে আমি সে-গঙ্গা ধরি আমার শিবকল্প শিরে, তারপর চুমুক দিও। (লিদিয়াকে) অথ ভাষ্য : পুরাণে বলে গঙ্গা আকাশ থেকে নামেন এমন মহাবেগে যে, কেবল শিবের মহাজটা তাকে ধারণ করতে পেরেছিলেন।

লিদিয়া : রূপকথা বটে।

প্রতিমা : বাবা বলেন এসব রূপকথারই একটা না একটা নিহিতার্থ থাকে, তাই এ-ধরণের প্রগলভতা ভালো নয়।

শ্রীমন্ত (অপ্রতিভ) : মুখ ফসকে। অনুতপ্ত।

প্রতিমা (হেসে) : নতজানু হ'য়ে ডাকো মা গঙ্গা আর বাবা শিবকে।

শ্রীমন্ত : এবার প্রগল্ভতা করছেন কি নি?

প্রতিমা : তোমার ছোঁয়াছে "মঁশের"! (লিদিয়াকে) শুনলাম তোমরা সুইজর্লণ্ড যাচ্ছ। আমরাও যেতে পারি হয়ত।

লিদিয়া (হাততালি দিয়ে) বেশ বেশ। আমরা যাচ্ছি জুরিখ রোম কায়রো হ'য়ে।

নিশান্ত : ঐ লাঞ্চের ঘণ্টা—চলো।

টেবিলে যমুনা বসল লিদিয়ার পাশে, প্রতিমা নিশান্তের। বাকি তুটি চেয়ারে শাস্ত্রীজি আর মার্থা।

গল্পালাপ সুরু হ'ল—সুভদ্র ভাষণ, যার কিছুই বক্তব্য নেই অথচ আশ্চর্য এই মানুষকে মানুষের কাছে আসার সুযোগ দেয়। যমুনা লিদিয়াকে আগে

একবার মাত্র দেখেছিল কিন্তু সে-দৃষ্টির পিছনে মন ছিল না তাই সে দেখাকে ঠিক "দেখা" বলা চলে না। আজ প্রথম দেখল। যার কী রূপ! আর প্রতি ভঙ্গিতে কী সুষমা! যমুনা বলল লিদিয়াকে: "তোমাদের ভাষায় যেন জলতরঙ্গ বাজে।"

লিদিয়া বলল: "তোমাদের ভাষাও কিছু কম যায় না। নিশান্ত যখন তোমাদের নানা কবিতা আবৃত্তি করে আমার মনে হয় যেন মধু শব্দে গ'লে ঝর ঝর ক'রে ঝরছে।"

॥ একচল্লিশ ॥

নিশান্তর সঙ্গে শ্রীমন্তর নিভৃতে কোনো কথা হ'ল না, কারণ নিশান্ত লাঞ্চের এক ঘণ্টা আগে আসতে পারে নি। লাঞ্চের পরে শ্রীমন্ত নিশান্তকে বলল হেসে: "এক গঙ্গা কথা হ'ল কই?"

নিশান্ত: লিদিয়ার বাজার করতে দেরি হ'য়ে গেল ভাই। কিন্তু তুমি একটু বাইরে চলো—নিরালায় কিছু বলতে চাই।

শ্রীমন্ত: বাইরে কেন? চলো শাস্ত্রীজির লাইব্রেরিতে বসি।

মার্থা কফি পরিবেষণ করার পরে যমুনা প্রস্থান করল নিজের ঘরে টাইপ করতে। শাস্ত্রীজি মার্থাকে নিয়ে গেলেন বৃটিশ ম্যুজিয়মে। নিশান্ত শ্রীমন্তকে বলল: "লিদিয়ার বাজার করা শেষ হয় নি—সে থাক হ্যারডের ওখানে। আমরা তিনজন বসি গিয়ে চলো শাস্ত্রীজির লাইব্রেরিতে।"

কফিতে চুমুক দিয়ে নিশান্ত ব'লে চলল আমেরিকা সম্বন্ধে নানা কথা। শেষে বলল: "কিন্তু ভাই, ওরা আমাদের দেশ সম্বন্ধে কিছুই খবর রাখে না।"

প্রতিমা: ওরা ভাবে খবরের কাগজের বহর বাড়ালে আর খবর রাখার দরকার নেই।

নিশান্ত: বেশ বলেছ। কেবল দুঃখ হয় দেখে যে ওরা ডলারকেই একমাত্র আরাধ্য মনে করে। ভাবে অর্থ কৌলীন্যই এযুগের সব চেয়ে বড় কীর্তি।

শ্রীমন্ত: যার শ্রেষ্ঠ সম্পদ—

প্রতিমা : না, পলিটিক্স যাক। (নিশান্তকে) ওদেশে খাঁটি ধার্মিক কারুর দেখা পেলে ?

নিশান্ত : না। তবে আমরা তো খুঁজি নি ধার্মিকদের। 'যাক গে। শোনো, লিদিয়ার একজন সহচরী মতন চাই। ওর যমুনা দেবীকে ভারি ভালো লেগেছে। সে ওঁকে প্রথম সুইজর্লণ্ডে নিয়ে যেতে চায়। যদি বনিবনাও হয় তবে সে হবে ওর সখী প্লাস সেক্রেটারি। কিন্তু উনি যেতে চান না। পরে শাস্ত্রীজিকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন উনি কে এক স্বামীজির কাছে দীক্ষা নিয়েছেন যাঁর অনুমতি বিনা উনি এক পাও চলতে অক্ষম।

শ্রীমন্ত : যদি ওর মন পেতে চাও তো সাবধান, ওর গুরুদেব সম্বন্ধে কোনো আলোচনা কোরো না।

নিশান্ত : গুরুদেব! স্বামীজি ওঁকে বেশ পোষ মানিয়েছেন দেখছি।

প্রতিমা : না জেনে স্বামীজিকে ভুল বুঝো না। তিনি আমাদের অতিথি ছিলেন, আমার শাশুড়ীকেও মন্ত্র দিয়েছেন যার ফলে তিনি শান্তি পেয়েছেন।

শ্রীমন্ত : তাছাড়া তিনি ওকে মোটেই পোষ মানাতে চান নি। যমুনাই তাঁকে কতকটা বাধ্য করেছে তাকে শিষ্যা করতে। তিনি সত্যিই খাঁটি সাধু, তাঁর 'পরে অবিচার করলে অন্যায় হবে।

প্রতিমা : শ্রীমন্তের কথায় আমি সায় দিই। মুক্তানন্দজি জন্ম-বৈরাগী একথা না মেনেই উপায় নেই।

নিশান্ত : বটে ? তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে সাধ জেগেছে। তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে ?

শ্রীমন্ত : দিতে পারি—যদি এ নিছক কৌতূহল না হয়।

নিশান্ত : হ'লেই বা ক্ষতি কি ?

শ্রীমন্ত : না, তিনি গড়পড়তা কৌতূহলীদের আস্কারা দেন না।

নিশান্ত : হঠাৎ একটা চিন্তাবিদ্যুৎ খেলে গেল—brain-wave—তাঁর একটা বক্তৃতা শুনলামই বা।

শ্রীমন্ত : শাস্ত্রীজি বলছিলেন আজই সন্ধ্যায় তিনি গীতা সম্বন্ধে কিছু বলবেন। যাবে শুনতে ?

নিশান্ত : আমি ভাই পাষণ্ডী, কিন্তু গীতার নানা শ্লোকে কেমন যেন বুকের তার বেজে ওঠে। যেমন ধরো কৃষ্ণের আশ্বাস যে দুরাচারও একান্তী হ'য়ে তাঁকে ডাকলে রাতারাতি ধর্মাত্মা হ'য়ে শান্তি পেতে পারে। কেবল

দুঃখ এই যে, শান্তি দেবীর আসল নাম মরীচিকা দেবী—যতই ধরতে এগোও ততই তিনি পেছিয়ে যান, ধরা দেবার পাত্রী নন।

প্রতিমা : এ-প্রশ্ন তুমি তাঁকে করতে পারো।

নিশান্ত : বেশ, করব। কোথায় বক্তৃতা দেন তিনি? আর ঠিক কখন?

শ্রীমন্ত : তাঁর নিজের ডেরায়—সন্ধ্যা সাতটায়। বক্তৃতা ঠিক নয়—ভাষণ বলাই ভালো। তিনি মামুলি পন্থী নন।

নিশান্ত : তাহ'লে যাবই যাব—যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাব—না না, মা ভৈঃ, ভক্তি ভরেই যাব। বলে না—even a cat can look at a king!

শ্রীমন্ত : কিন্তু গিনিপিগ cannot—অন্তত যে গিনিপিগের চোখ ফোটে নি।

নিশান্ত : শাস্ত্রে তারও ব্যবস্থা আছে। (করজোড়ে)

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া

চক্ষুরুন্মীলিত যেন তস্মৈ শ্রীসাধবে নমঃ।

শ্রীমন্ত : শ্—শ্—যমুনার সামনে এরকম প্রগলভতা করলে সে আর তোমার মুখদর্শনও করবে না।

(ত্রয়ীর কোরাসে কলহাস্য)

॥ বিয়াল্লিশ ॥

শ্রীমন্ত প্রতিমা নিশান্ত ও লিদিয়া যখন মুক্তানন্দজির আবাসে পৌছল তখন ঘর প্রায় ভরতি। যমুনা ওদের জন্যে চারটি চেয়ার প্রথম শ্রেণীতে রেখেছিল কার্ডে নাম লিখে। ওরা বসবার পর মুক্তানন্দজি এসে হাসিমুখে নমস্কার করে প্রতিমাকে বললেন : "খুব খুশী হলাম দর্শন পেয়ে।"

প্রতিমা (উঠে প্রণাম ক'রে) : আমাদের দুই বন্ধু এসেছেন, কিন্তু পরিচয় পরে হবে আপনি আপনার ভাষণ সুরু করুন।

শ্রীমন্ত : বন্ধুর নাম নিশান্ত, বাঙালী। স্ত্রীর নাম লিদিয়া—ফরাসী।

মুক্তানন্দ : ওঁদের কথা শুনেছি শাস্ত্রীজির কাছে।

নিশান্ত : আমাদের পাঁচমিনিট দেরি হয়ে গেছে·

মুক্তানন্দজি : তাতে কিছু যায় আসে না।

লিদিয়া : যায় আসে খুব, রাস্তায় দেরি হ'য়ে গেল ট্র্যাফিক জ্যাম-এর জন্যে।

প্রতিমা : আপনি আর দেরি করবেন না। কথা পরে হবে।

মুক্তানন্দজি অনবদ্য ইংরাজীতে গীতার নানা শ্লোকের ভাষ্য করলেন চমৎকার। সেদিন বলছিলেন ভক্তিযোগের কথা। শেষে বললেন : গীতা যে-ভক্তির কথা বলেছে সে নিছক আবেগ নয়, তার প্রাণের কথা শরণাগতি। মানে ভক্তির উচ্ছ্বাসে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেই চলবে না, ভক্তির ভিৎ আবাহন আর সমাপ্তি প্রপত্তি যার ইংরাজী অনুবাদ surrender : অর্থাৎ ঠাকুরকে সর্বান্তঃকরণে বলা চাই। "তবৈবাহং" অর্থাৎ আমি তোমার। যখন সাধন মন মুখ এক ক'রে এই অঙ্গীকার করেন তখনই কেবল তাঁর ভক্তি ঠিক পথ ধরে। তখন কী হবে ? না, ঠাকুর সাড়া দেবেন "মমৈব ত্বং—তুমিও আমার" ব'লে। নৈলে বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় না। হিন্দিতে মীরার ভাষায় : "মৈ গিরধরকী গিরধর মেরে—আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার।" এই শরণাগতির পাখায় উড়ে তবে তাঁর চরণ বৈকুণ্ঠে পৌছান যায়—শুধু অশ্রুকণ্ঠি আরাধনায় কিছুই তৃপ্তি মেলে না এমন ইঙ্গিত করছি না। শুধু বলতে চাই তাতে আত্মনিবেদন পূর্ণ হয় না। আমরা সবাই স্বভাবে সহজপন্থী, চাই সস্তায় পরশমণি পেতে। কিন্তু এই পাওয়ার আগ্রহও সাধনার অঙ্গ হলেও দেওয়ার আকুলতা বিনা পাওয়ার তৃষ্ণা মেটে না, মিটতে পারে না। তাই চাই সব আগে আত্মদান—নিটোল সর্তহীন প্রশ্নহীন আত্মদান। জ্ঞানমার্গীরা অনেকে ভক্তকে নিম্নাধিকারী ব'লে হেনস্থা করেন। বলেন জ্ঞান দুর্লভ, ভক্তি সুলভ, তাই বেশির ভাগ সাধক ভক্তির দিকে ঝোঁকে। একথা বলা যেতে পারে সাধারণী ভক্তি সম্বন্ধে—অহৈতুকী বা সমর্থা ভক্তির সম্বন্ধে নয় যে-ভক্তির পরম লক্ষ্য সর্বদান, পরিণাম চিন্তা না ক'রে আত্মসমর্পণ। এ-ভক্তি মানে পরাভক্তি জ্ঞানের চেয়ে কিছু কম দুর্লভ নয়।

*　　　*　　　*

ভাষণের শেষে শ্রোতারা সবাই চ'লে গেলে মুক্তানন্দজি ডাকলেন যুগল দম্পতীকে নিজের ছোট ঘরে। যমুনা একটি সতরঞ্চি বিছিয়ে দিল। সবাই

আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসলে নিশান্ত বলল : "আপনি শেষের দিকে যা বললেন শ্রুতিমধুর বৈ কি, কিন্তু সত্যভিত্তি কি না সে-সন্দেহ ঘোচে না যে।"

মুক্তানন্দ (হেসে) : চোখের ডাক্তার যখন এক প্রায়ান্ধকে বলেছিলেন : "তোমার চোখের যে-লেন্স ঝাপসা হয়েছে কেটে ছানি-র নতুন চশমা পরলে পরিষ্কার পড়তে পারবে তখন তার মনেও ঠিক এই সন্দেহ জেগেছিল।

নিশান্ত। আপনি ব্যঙ্গের সুর ধরেছেন। কিন্তু ব্যঙ্গ তো যুক্তি নয়। যুক্তি স্বভাবে রিয়ালিস্ট।

মুক্তানন্দ। ঠিক কথা, কেবল জুড়ে দিন সন্দেহও তত্ত্বদর্শী নয়। শুনুন বলি। সংসারে সব জ্ঞানের পথেই জ্ঞান আহরণ করার পরে জ্ঞানী যা দেখতে পায় যারা সে-জ্ঞানের খবর পায় নি তারা তা দেখতে পায় না। তাই যুগে যুগে বড় আবিষ্কর্তা মনীষী দার্শনিককে নিয়ে জনসাধারণ প্রথমদিকে প্রায়ই হাসাহাসি ক'রে এসেছে। চেতনার পূর্ণিমাবিকাশের পথে একটি মস্ত বাধা অবোধদের এই মারমুখী শ্লেষ অবিশ্বাস। ভাবুন, গ্যালিলিওর মতন মহাবৈজ্ঞানিক যখন বললেন পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে তখন এমন কি ধর্মযাজকেরাও তাঁকে অধার্মিক নাম দিয়ে জেলে দিয়েছিল। সক্রেটিসের মতন মহাজ্ঞানীকেও গ্রীসের দণ্ডধরেরা বিষ খাইয়ে মেরেছিল। প্রেমের ক্ষেত্রেও দেখতে পাবেন প্রেমের জন্যে যারা সব ছাড়ে তাদের সুবুদ্ধিরা পাগল বলেছে, মীরাকে নীতিবাগীশেরা কলঙ্কিনী, গোপীদের দ্বিচারিণী। মহাজনেরা তাঁদের একাগ্র সাধনায় চেতনার যে-শিখরে পৌঁছেছেন অভাজনেরা তার পাত্তা না পেয়ে আবহমানকাল ব'লে এসেছে তাঁরা ছন্নমতি কল্পনাবিলাসী—রিয়ালিস্ট বাস্তববাদী নন। অতদূরে যাওয়ার দরকার কি? যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণকেও বুদ্ধিবাদীরা হিস্টিরিয়া গ্রস্ত ব'লে দোষ দিয়ে বাতিল করেন নি কি? এখনো বহু বাস্তববাদী বলেন না কি—মা-কালী তাঁর তত্ত্ব নিতেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন এ সবাই ভ্রান্তিবিলাস? অথচ এই একটি মহাপুরুষের মাতৃবাণী আজ সমস্ত জগৎ কান পেতে শুনছে, হাজার হাজার সাধক তাঁর কথায় তীর্থলক্ষ্যের পানে চলেছে সব ছেড়ে।

নিশান্ত : কিন্তু তাঁর নির্দেশে কজন চলে আজ?

মুক্তানন্দ : বুদ্ধদেবের খৃষ্টদেবের নির্দেশেই বা ক'জন চলে বলুন? মহাজনদের মহৎ বাণীতে সবাই সাড়া দেয় না এজন্যে নয় যে সে-বাণী মহৎ কি সুন্দর নয়, সাড়া দেয় না এই জন্যে যে, চেতনার একটা তুঙ্গ স্তরে না উঠলে—যারা নাম

ইভল্যুশন—মানুষ সে-চেতনার সালোক্য করতে পারে না। তবু এ-অবিশ্বাসের মেঘ কুয়াশা সত্ত্বেও তারা তাঁদের চেতনায় কিছু না কিছু আভাষ পায়—বিশেষ ক'রে যখন দুঃখ দুর্দৈবের আঘাতে তারা দিশাহারা হয়। তাই দেখবেন মানুষ যুগে যুগে প্রায়ই দুঃখের মধ্যে দিয়েই পেয়েছে আনন্দের মৃদুল অঙ্গীকার, মরণান্তিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই পেয়েছে ভাগবতী করুণার স্পর্শ। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এই যে, যারা পেয়েছে তাদের সাক্ষ্যই অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাস জাগিয়েছে, যারা পায় নি তাদের নাস্তিকতা মানুষকে সর্বহারা করতে পারে নি। নাস্তিক্য মনকে নিরাশ করেছে, কিন্তু হৃদয়কে হতাশ করতে পারে নি।

নিশান্ত: কিন্তু একথা কেমন ক'রে মানব বলুন যখন দেখি জগতের অন্তত বারো আনা আস্তিকের শাঁক ঘণ্টায় শুধু কানই ঝালাপালা হয়ে থাকে, মন কোনো সত্যিকার আশার আশ্রয় পায় নি।

মুক্তানন্দ: আপনি ধর্মের বাহ্য আচারের দিকটাকেই সর্বেসর্বা ব'লে জাহির করতে চাইছেন। এ সব বৈধী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সত্য ঠাঁই পায় না, মিইয়ে পড়ে একথা খাঁটি ধার্মিকেরা আপনাদের চেয়েও তারস্বরে বলেন। কিন্তু সেই মিইয়ে পড়ার মধ্যেও ধর্মের প্রসাদ কণিকা কিছু না কিছু মেলে। আচারের মধ্যে দিয়ে মানুষ দেখতে পায় সংযমের কিছুটা মহিমা, অনুভব করে শান্তির ছিটেফোঁটা। বিলাসীও তাই সময়ে সময়ে মন্দিরে গিয়ে স্তব স্তুতি শোনেন। সংসারে কোনো কিছুই একেবারে ষোলো আনা মিথ্যা নয়। সাহেব পুরাণে তাই বলে: "Even the devil is not as black as he is painted." অনেক সময় শাঁক ঘণ্টা শুনেও নাস্তিক মন চমকে ওঠে। তীর্থযাত্রা তখনি সুরু হয় না মানি, কিন্তু মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা চিমটি কাটে: নাস্তিক হ'য়ে সত্যি কিছু পেলে কি যার পরে নির্ভর করা যায়? স্বামী বিবেকানন্দ একজন মামুলি ভক্তের উচ্ছ্বাস দেখে তাই বলেছিলেন: 'আমি আমার বিদ্যা মনীষা শক্তি সব দিতে পারি যদি বিনিময়ে পাই এমন ভক্তি।'

লিদিয়া: কিন্তু আবার শুচিবাই পাণ্ডাপুরুত এসবের মধ্যে দিয়ে কি কোনো সত্য আলো পাওয়া যায় স্বামীজি? আমি দেখেছি আমাদের গির্জায় সার সার বিশ্বাসীকে হাতজোড় ক'রে বাইবেলের নির্দেশে ভগবানকে ডাকাডাকি করতে প্রতি রবিবারে। কিন্তু তারপরে তারা চলে ঠিক আগের ছন্দে, গায় প্রাণহীন সুরে প্রাণদাতার মহিমা। প্রটেস্টান্টরা কি অকারণ এ-অভিনয়কে নামঞ্জুর ক'রে ভগবানকে গির্জায় একঘরে ক'রে চলেছে দলে দলে জনসেবায়?

এককথায়, রিলিজন, ধর্ম, যে আজ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে তার কারণ কি এই নয় যে, ধূপ দীপ জ্বালিয়ে সবাই মিলে ভগবানকে ritual মেনে খোসামোদ করলেই মেলে না আঁধারে আলো কাঁটাবনে ফুলবাগান ?

মুক্তানন্দ : শিশু হাঁটতে শেখার আগে হামাগুড়ি দেয়, দৌড়তে শেখার আগে চলতে শেখে, লাফ দেবার আগে দৌড়নো অভ্যাস করে। অর্থাৎ একটার পর আর একটার দীক্ষা হয়। তেমনি আনুষ্ঠানিকতার—ritualism-এর বেলায় প্রথমে আচার মেনে যখন দেখে তাতে শান্তি মিলবে না তখন আচারকে ডিঙিয়ে আবৃত্তচক্ষু, অন্তর্মুখী হয় যেখানে শান্তির বসবাস। ডারউইন মূর্খ ছিলেন না, ছিলেন দ্রষ্টা—তাই দেখতে পেয়েছিলেন যে মানুষ প্রথমেই ভুঁই ফুঁড়ে অভ্যুদিত হয় নি, বহু শতাব্দীর সঞ্চিত শক্তির ঠেলায় ধীরে ধীরে উঠেছে। আমিও একসময় ritualism-কে মানতাম। কেন মানতাম ? এইজন্যেই যে মেনে কিছু ফল পেয়েছিলাম—আহরণ করেছিলাম সংযমের শক্তি। পরে দেখলাম এরও পরে আছে—তাই আচারিপনা বর্জন ক'রে আত্মমুখী গীতামুখী গুরুমুখী হয়েছিলাম। (হঠাৎ থেমে) কিন্তু আজ আর সময় নেই।

ওরা সবাই ওঠে দাঁড়ায়। নিশান্ত মুক্তানন্দজিকে নমস্কার ক'রে জিজ্ঞাসা করে : আপনি ভাবিয়ে দিয়েছেন স্বামীজি ! ফের কবে গীতাপাঠ করবেন ?

যমুনা (ডায়ার দেখে) : কাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়।

॥ তেতাল্লিশ ॥

শ্রীমন্ত পরদিন লিদিয়া ও নিশান্তকে প্রাতরাশে নিমন্ত্রণ করল।

নিশান্ত (কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে) : ভাই, সত্যি বলতে কি, সাধু সন্ন্যাসীদের আমি বরাবর এড়িয়েই চ'লে এসেছি, এইজন্যে যে, তারা নিজের নিজের একটা মনগড়া জগতে ধ্যানের জাবর কাটেন—যে-জগতের নাম আইভরি টাওয়ারই দাও বা এারয়াল কাস্‌ল্‌ই দাও। এই প্রথম একটি বিচিত্র সাধু দেখলাম যিনি ভগবানের দোহাই দিয়ে জগতকে বাতিল করেন না। ওঁর সঙ্গে আর একটু আলোচনা করতে চাই, কিন্তু তুমি আমাকে রেকমেণ্ড না করলে তিনি রাজী হবেন ব'লে মনে হয় না।

শ্রীমন্ত (রুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে) : হবেন। উনি মুখে যাই বলুন না কেন, এক জমিদারের অনুরোধে ধর্মপ্রচার করতেই কালাপানি পার হয়েছেন, দুদিন বাদে আমেরিকা যাচ্ছেন যেখানে লোকে লেকচার শোনে তেমনি আগ্রহে যেমন মাছেরা ময়দার গুলি খায়।

লিদিয়া (মুখ ভার ক'রে নিশান্তকে) : কিন্তু কী হবে এসব নিয়ে আলোচনা ক'রে? তোমার ধর্ম সম্বন্ধে তো সত্যিকার ঔৎসুক্য নেই একফোঁটাও।

প্রতিমা (লিদিয়ার পিয়ালায় কফি ঢেলে) : এ তোমার অন্যায় লিদিয়া! ধর্ম সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রথম দিকে অনেকের মনেই কৌতূহলের বীজের মতন ঢাকা থাকে। সাধু সন্তদের সঙ্গে আলোচনার ফলেই সে-বীজ বাইরে এসে উঁকি মারে। (নিশান্তকে) তুমি লিদিয়ার কথায় কান দিও না ভাই। মুক্তানন্দজি সাধনায় উপলব্ধির কোন্ স্তরে পৌঁচেছেন আমি জানি না, কিন্তু উনি কিছুটা সত্যিকার আলো পেয়েছেন নিশ্চয়ই, নৈলে বিদেশে বিভুঁয়ে এসে কোনো সুপারিশ না থাকা সত্বেও এতগুলি ধর্মার্থীর মন টানতে পারতেন না কখনই।

লিদিয়া : মুক্তানন্দজি একজন পেল্লায় সাধক হ'তে পারেন, কিন্তু ওঁর পথ আলাদা, আমাদের পথ-আলাদা। তেলে জলে মিশ খায় কি?

নিশান্ত : আমি ঠিক জলীয় পদার্থ নই লিদিয়া। আমার এক মামা যৌবনেই সন্ন্যাসী হ'য়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন বিশ বৎসর আগে। তিনি আমাকে বিশেষ ভালোবাসতেন, তাই মাঝে মাঝে আমাকে বলতেন গীতার মহিমার কথা—এমনি। প্রায়ই আবৃত্তি করতেন গীতার একটি শ্লোক মনে পড়ে :

যং লব্ধা পরমং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে।

এর মানে : এমন পরম লাভ সাধনায় পাওয়া যায় যা পেলে আর কোনো লাভই মন চায় না কারণ সে এমন আশ্চর্য লাভ যে দারুণ দুঃখেও মন অচল অটল থাকে।

লিদিয়া : শ্রুতিমধুর—মানি। কিন্তু সংসারে কান্নাকাটি হানাহানি দ্বেষাদ্বেষির মধ্যে এ-ধরনের লাভ যে কারুর সত্যিই হয় একথা আমার মন নেয় না…

ক্রিং…ক্রিং…ক্রিং…

শ্রীমন্ত (উঠে টেলিফোনে) : কে ?

মুক্তানন্দ (টেলিফোনে) : আমি—মুক্তানন্দ। শুনুন শ্রীমন্তবাবু। আজ বিকেলে আমার ঘণ্টাখানেক সময় আছে। আপনি প্রতিমা দেবীকে নিয়ে আসতে পারেন ?

শ্রীমন্ত : পারি ব'লে পারি। এখানে আমার সময় অফুরন্ত। কেবল শুনুন : এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল। আপনি কাল যা বললেন আমাদের সকলেরই খুব ভালো লেগেছে। আমার বন্ধু নিশান্তও চায় আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে।

মুক্তানন্দ : আলোচনা, না তর্কাতর্কি ?

শ্রীমন্ত : না, তর্ক ঠিক নয়, তবে···

মুক্তানন্দ : তার কাছাকাছি, এই তো ? শুনুন, বলি খোলাখুলি। তর্কাতর্কি ক'রে কোনো সত্যিকার আলো মেলে না। উপনিষদ তাই ধমকেছে : নৈষা তর্কেণ মতিরাপনীয়া—তর্কের আবাদে সুমতির সোনা ফলে না—যার যা মত তা-ই থাকে অনাহত। তাই আমাদের দেশে কোনো জিজ্ঞাসু কোনো তত্ত্বদর্শীর কাছে গেলে প্রশ্ন করতেন : "আপনি কী জেনেছেন ?"—জানতে চাইতেন না তিনি কী "মনে করেন।" আপনার বন্ধুকে বলবেন—তিনি যদি আমি কী মনে করি তার খবর চান তাহ'লে আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে অনর্থক তাঁর সময় নষ্ট করব না, তবে যদি তাঁর মনে সত্যি আলোর তৃষ্ণা জেগে থাকে তাহ'লে তাঁকে আমি সাদরে নিমন্ত্রণ করছি আপনার সঙ্গে আসতে। কিন্তু চা খেতে নয়—খাওয়া দাওয়া আর তত্ত্বজিজ্ঞাসা মিশ খায় না। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার নিজের একটু আলাদা কথা আছে। তাই আমি বলি—আপনি আসুন সাড়ে চারটেয়, তিনি সাড়ে পাঁচটায়।

টেলিফোন রেখে শ্রীমন্ত নিশান্তকে বলল মুক্তানন্দজির সর্ত। লিদিয়া মাথা নেড়ে বলল : "ও একটা কথাই নয়। সারা জগতে মানুষ মানুষের সঙ্গে আলোচনা তর্কাতর্কি করে এও তা কত কী নিয়ে। সব কিছুরই কিছু না কিছু সার্থকতা থাকে, সব কিছুর মধ্যে দিয়েই কিছু না কিছু জানা যায়।

প্রতিমা (হেসে) : বার্ণার্ড শ-র একটি উক্তি মনে পড়ল। কিছু মনে কোরো না ভাই। তিনি vivisection-এর বিরুদ্ধে লিখেছিলেন : জন্তুদের কেটে অনেক কিছুর খবর পাওয়া যায় ব'লেই বলা চলে না তাদের কাটাকুটি করা সমর্থনীয়। তোমার ঠাকুরমাকে তেলের কড়ায় ভাজলেও জানা যাবে

নানা তথ্য—তিনি কীভাবে চিৎকার করেন, ভাঙতে কতক্ষণ লাগে…ইত্যাদি। কিন্তু এসব খবর পাওয়ার জন্যে তাঁকে ভাজা চলে না। (ত্রয়ীর কলহাস্য)

লিদিয়া (আতপ্ত): বার্ণার্ড শ একজন সত্যিকার ভাবুক নন। তিনি এমন কথাও বলেছেন যা…যা…থাক এ তর্কাতর্কি, তোমরা যেতে চাও যাও, আমি যাব না।

প্রতিমা: মুক্তানন্দজির দু একটা ফালতো কথা শুনে রাগ করলে তাঁর উপর অবিচার হবে। তোমাকে তো বলেছি তিনি আমাদের অতিথি ছিলেন কলকাতায়। অনেকে তাঁর মালাতিলক দেখে ভেবে বসেছিল তিনি মামুলি গোঁড়া হিন্দু—কিন্তু তাঁরাও পরে একবাক্যে স্বীকার করেছেন তিনি চিন্তাশীল, সত্যনিষ্ঠ, খাঁটি সাধু। তাঁর একটি কথা আমাকে চমকে দিয়েছিল: সংসারে পাপিষ্ঠ ব'লে কেউ নেই, কারণ মানুষ যত পাপই করুক না কেন তার অন্তরে একটি অনির্বাণ বাতি জ্বলে যার আলোয় সে দেখতে পায়—সে পা পিছলে পড়েছে। তাই—বলেছিলেন তিনি—যেমন সব পাপীর মধ্যেই পুণ্যাত্মা লুকিয়ে আছে তেমনি সব পুণ্যাত্মার মধ্যে পাপী ঘুপটি মেরে অপেক্ষা করে কখন পুণ্যাত্মা ঘুমিয়ে পড়বেন আর সে সব তছনছ ক'রে দেবে।

লিদিয়া (প্রসন্ন): চমৎকার কথা। আমিও যাব। মার্গারেটও আমাকে বলত প্রায়ই মানুষকে বিচার করতে নেই বাইবেলের এই কথাটি একটি মস্ত বাণী। তোমরা ঠিক কখন যাবে বলো, নিশান্ত এবার তার মোটরে' নিয়ে যাবে তোমাদের।

শ্রীমন্ত: আমাদের একটু আগে যেতে হবে—সাড়ে চারটেয়। তোমরা সাড়ে পাঁচটায় এসো মুক্তানন্দজি বলেছেন।

নিশান্ত: বেশ। কেন জানি না আনন্দ হচ্ছে তাঁর সঙ্গে ফের কথাবার্তা হবে ব'লে।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

প্রতিমাকে নিয়ে শ্রীমন্ত মুক্তানন্দজির আবাসে পৌছতেই তিনি তাদের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন। "যমুনা বড় ঘরে রইল, টেলিফোন ধরবে। এখানে হয়েছে এক জালা—এই টেলিফোন। অথচ না হ'লেও চলে কই বলুন? কিন্তু মরুক গে, আমার কথাটা আগে সেরে নিই।

"প্রথম কথা বলেছি কিন্তু আবার বলি: যমুনাকে আমি মন্ত্র দিয়ে গুরু হ'য়ে বসতে চাইনি। কিন্তু তার পরে একটি বিশেষ উপলব্ধি হ'ল যার আলোয় দেখতে পেলাম—ওর গুরু দরকার। কাজেই রাজী হ'তে হ'ল। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে ও আমাকে গুরুবরণ ক'রে মনে শান্তি পাচ্ছে না। এ-এক সমস্যা, কারণ আমি কারুরই গুরু ছাড়া আর কিছু হ'তে পারি না—অর্থাৎ বন্ধু সখা অন্তরঙ্গ প্রতিপদে প্রত্যক্ষ সহায়। যাঁরা পারেন তাঁরা মহাযোগী, কিন্তু আমি এখনো ধর্মার্থী মাত্র, ধর্মপাল নই। আমাকে আরো একটি কারণে সাবধান হ'তে হচ্ছে: আমি আমার সাধনায় এমন একটা মোড়ে পৌঁছেছি যেখানে সহজেই ভুল হ'তে পারে। আর কেন জানেন? গুরুদেব আমাকে জানিয়েছেন যে, বিদেশে আমাকে তিনি চিঠিপত্র লিখবেন না, আমাকে চলতে হবে তাঁর নীরব নির্দেশে।

শ্রীমন্ত: কেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

মুক্তানন্দ: সাধনার একটা 'স্টেজ'-এ বাইরের নির্দেশ স্তব্ধ না হ'লে আন্তর নির্দেশের খবর মেলে না—যেমন চিন্তা ঘুমিয়ে পড়লে ধ্যান জাগে না।

প্রতিমা: চমৎকার কথা।

মুক্তানন্দ: কিন্তু যমুনা যে বুঝেও বুঝতে চাইছে না। বলে: আমার কাছ থেকে বাইরের নির্দেশই সে চায়—নীরব নির্দেশ ওর কাছে মনে হয় একটা কথার কথা, হেঁয়ালি।

শ্রীমন্ত: বলেন কি? গুরুবরণ করেছে অথচ গুরুবাক্যে বিশ্বাস নেই?

মুক্তানন্দ (হেসে): গুরুবাক্যে বিশ্বাস—মানে সত্যিকার বিশ্বাস—কি চাট্টিখানি কথা শ্রীমন্তবাবু? যে-আমি আজ গুরুকে সত্যিই জেনেছি পরম দিশারী সেই আমার কতবারই তো তাঁকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল, মনে হয়েছিল—গুরু শিষ্যের মনের খবর রাখেন না ব'লেই তার ব্যথার ব্যথী হ'তে পারেন না. পারলে কি তাঁর এত ভুল হ'ত? সে অনেক কথা, বললে হয়ত আপনাদের মন আরো ঘুলিয়ে যাবে। যমুনার জন্যে আজ আমাকে ভেবে সারা হ'তে হচ্ছে বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে ওর মনে এই সন্দেহ ঢুকেছে যে, আমি কোনো রূপসী গুণবতীকে সেক্রেটারি করতে চাচ্ছি ওকে ডিঙিয়ে। এ-ভাব আরো ঘনিয়ে উঠলে বিপদ আছে, হয়ত এমন কি ওর মাথা খারাপও হ'তে পারে।

প্রতিমা: ওকে বুঝিয়ে বললে··

মুক্তানন্দ (মৃদু হেসে): আপনি তো ফরাসী ভাষা জানেন। Idée fix-কে নির্মূল করা যায় কি? তাই আমি বলি: আপনারা এ-যাত্রা ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান। নার্স হ'তে শুধু যে ও পারবে না তাই নয় চাইবেও না।

শ্রীমন্ত: কেন স্বামীজি? যদি সত্যি চেষ্টা করে…

মুক্তানন্দ: আমাকে বারবার ইংলণ্ডে আসতে হবে—গুরুদেবের আদেশে। আর আমি এলেই ওর মন বিক্ষিপ্ত হবে—কাজে মন বসাবে কেমন ক'রে?

শ্রীমন্ত: আচ্ছা স্বামীজি…কিন্তু ওর টাকাটা…

মুক্তানন্দ: আমি ওকে বলেছিলাম ব্যাঙ্কে ওর নিজের নামেই জমা রাখতে। সে-টাকা ওর কাজে আসবে যদি আপনাদের সহযোগিতা করতে ওর ভালো না লাগে।

প্রতিমা (ঢিপ ক'রে প্রণাম ক'রে): আপনি সাঁচ্চা সাধু স্বামীজি। কেবল আমাদেরও ত্যাগ করবেন না এই অনুরোধ…

মুক্তানন্দ: ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব যেন এই শ্রদ্ধালু মনকে লালন করতে পারেন।…আর আমারও একটি অনুরোধ আছে। আপনারা যমুনার সঙ্গে এই নিয়ে কথাবার্তা কইলে ভালো হয়।

প্রতিমা শ্রীমন্তের মুখের দিকে তাকায়।

শ্রীমন্ত: বেশ। (দোর খুলে যমুনাকে) যমুনা। একবার আসবে?

যমুনা (এসে পাণ্ডুর মুখে): কী ব্যাপার দাদা?

শ্রীমন্ত (হাসতে চেষ্টা ক'রে): মা ভৈঃ। আমাদের মনে হয় তুমি এ-যাত্রা আমাদের সঙ্গে ফিরে চলো।

যমুনা: গুরুদেবও কি তাই চান?

প্রতিমা: হ্যাঁ। একটা কারণ—তুমিও তো বলছিলে—নার্সের কাজ তোমার একঘেয়ে মনে হয়—নার্স-ট্রেনিং সেণ্টারে থাকতেও তোমার ভালো লাগবে না।

যমুনা: দিদি, আমি অপয়া হ'লেও বোকা মেয়ে নই। আমি…আমি… বেশ, আমি ফিরে যাব…

(দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না)

প্রতিমা: শোনো যমুনা লক্ষ্মীটি! যদি চাও…

যমুনা (মুখ তুলে চোখ মুছে): ভয় নেই দিদি, পোড় খেয়ে আমি বেশ

শক্ত হয়েছি—মূর্ছা যাব না আর। কেবল আমি জানি না…আমি কী অপরাধ করেছি যে…

মুক্তানন্দ : অপরাধ কিছু করো নি মা। কিন্তু আমি যে-সাধনা নিয়েছি সে বড় কঠিন সাধনা। তুমি যখন আমার কাছে মন্ত্র নিয়েছ…

যমুনা : শুধু মন্ত্র নেওয়া বলছেন কেন গুরুদেব? আপনি কি রাজী হন নি আমার গুরু হ'তে?

মুক্তানন্দ : গুরু হওয়ার অন্যদিকে আছে শিষ্যা হওয়া—মানো তো?

যমুনা : একশোবার।

মুক্তানন্দ : তাহ'লে তোমাকে মানতেই হবে যে শিষ্যার কর্তব্য গুরুবাক্য মেনে চলা।

যমুনা : আমি…আমি…

মুক্তানন্দ : (স্নিগ্ধ কণ্ঠে): বলো মা! আমি তোমাকে শাসন করতে চেয়ে গুরু হ'য়ে বসি নি, গুরুশক্তি একটা সত্যিকার মঙ্গলশক্তি ব'লেই তোমাকে শিষ্যা বরণ করেছিলাম। কিন্তু এ-শক্তি ব্যর্থ হয় যদি শিষ্যা গুরুর অবাধ্য হয়।

যমুনা : আচ্ছা গুরুদেব, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব কথা দিচ্ছি…

(ক্রিং…ক্রিং…ক্রিং দোরের ঘণ্টা বাজে)

মুক্তানন্দ (শ্রীমন্তকে): আপনার বন্ধু ও বান্ধবী। যাও যমুনা, ওঁদের নিয়ে পাশের ঘরে বসাও।

যমুনা বেরিয়ে যায়। মুক্তানন্দ হেসে বলেন: "দেখছেন তো, গুরু হবার ফ্যাশাদ?"

শ্রীমন্ত : এক্ষেত্রে গুরু না হ'য়েও তো আপনাকে কিছু কম ফ্যাসাদে পড়তে হয়নি স্বামীজি? কতকটা দিল্লিকা লাড্ডুর মতন, জো খায়া বহ ভি পস্তায়া, জো নহি খায়া বহ ভি পস্তায়া…(ত্রয়ীর কল-হাস্য)

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

মুক্তানন্দজি ঢুকতেই নিশান্ত ও লিদিয়া উঠে দাঁড়ান।

মুক্তানন্দ : নমস্কার, দুরন্তবাবু! বসুন বসুন।

নিশান্ত : দুরন্ত আমার উপাধি হ'তে পারে স্বামীজি, কিন্তু পিতৃদত্ত নাম নিশান্ত যদিও সময়ে সময়ে আমার মনে হয় আমার নিশা নিরন্ত।

মুক্তানন্দ (হেসে): কিন্তু নিশার বুকেই যে উষা লুকিয়ে। মনে নেই রবীন্দ্রনাথের সেই অপরূপ উপমা:

মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে,
উতরিবে যবে নব প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

লিদিয়া: আপনি সাধু হ'য়েও যে কবিতা পড়েন এতে আমি সত্যিই আশ্বস্ত হয়েছি।

মুক্তানন্দ (হেসে): কেন বলুন তো? সাধু হ'লে কি জটাধারী আর মহাদাড়ি হ'তেই হবে? আমার গুরুদেবকে দেখলে শুধু আশ্বস্ত না, নিশ্চিন্ত হ'তে পারতেন। সন্ন্যাস নেবার সময়ে সেই যে মাথা মুড়িয়েছিলেন তারপর আর কেশবিলাসী হন নি। না দাড়ি-গোঁফ বিকাশী। টকটকে রাঙা মুখ— একেবারে পাকা আমটি।

নিশান্ত: আপনার সময় কম শুনেছি, তাই এসব হাল্কা রসিকতা থাক। আমার কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে।

মুক্তানন্দ: বলুন, মানে শর-বর্ষণ করুন।

নিশান্ত: না, আমি মারতে চাই না, চাই সেরে উঠতে, বিশ্বাস করুন।

মুক্তানন্দ (হেসে): আমি আপনাকে সহজেই বিশ্বাস করতে পারি নিশান্তবাবু, কারণ বিশ্বাস আমাদের স্বধর্ম। কেবল মুস্কিল এই যে, আপনারা আমাদের বিশ্বাস করতে পারবেন না।

নিশান্ত: আমরা যোগবিভূতি বর্গীয় গুজব সম্বন্ধে জানতে আপনার উপর চড়াও হইনি। আমার প্রশ্ন জীবনের অর্থ বা কদর্থ নিয়ে। এককথায়, জগতের আজ কেন এ-দুরবস্থা?

মুক্তানন্দ: আপনি বলেন কি নিশান্তবাবু? কালই পড়ছিলাম একটি বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকায়: আমরা আমেরিকানেরা ধন্য যেহেতু আমরা দুঃস্থ এশিয়াকে তুলতে চাই কুসংস্কারের কালো গহ্বর থেকে স্বাস্থ্য শিক্ষা শক্তির আলোকশিখরে। ফরাসীরা চেয়েছিল liberty, equality, fraternity: আমরা চাই একাকার শ্রীক্ষেত্র—one world-এর প্রতিষ্ঠা, যেখানে প্রতি মানুষ হবে বিশ্বের নাগরিক, দৈন্য অভাব মনস্তাপ হবে লুপ্ত, থাকবে কেবল

ভোগ, কিছু শোক থাকলেও রোগ হবে নির্বাসিত। এককথায়, জীবনের ঝঙ্কার, বিজ্ঞানের টঙ্কার, স্বাধীন চিন্তার জয়জয়কার।

নিশান্ত: আমরা আমেরিকা চক্র দিয়ে এসেছি এখানে ফিরে। আর বললে বিশ্বাস করবেন না—চার পাঁচটি শিক্ষাসদনে হু-হুঙ্কারে দিয়ে এসেছি যে, নবযুগ সৌভ্রাত্রের যুগ—এলো ব'লে যখন শিক্ষার ইন্দ্রজালে সব ভয়-ভাবনা দুর্ভাবনা দুর্গতির অবসান হবে। এজন্যে চাই শুধু শিক্ষা, মনকে মুক্ত করা—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। মাপ করবেন আমার নাস্তিক জিভে আপনাদের বেদবাণী উচ্চারণ করলাম ব'লে।

মুক্তানন্দ: কিন্তু কেন করলেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

নিশান্ত (থম্‌কে): কেন করলাম? করলাম কারণ…কারণ সংস্কৃত শ্লোকের একটা ধ্বনি-সম্পদ, বোলন্দ্ আওয়াজ আছে। তাছাড়া আর কি?

মুক্তানন্দ: না নিশান্তবাবু। বেদবাক্য উদ্ধৃত করলেন কারণ বেদের নানা বাণীই আপনার মগ্ন-চেতনায় উপ্ত আছে যেমন রেডিয়ম আলকাতরার মধ্যে উপ্ত থাকে। আপনি সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন সানন্দেই একথা আমি শ্রীমন্ত বাবুর কাছে শুনেছি। কিন্তু দেব ভাষায় আনন্দ পেয়েছিলেন ঠিক কী জন্যে তলিয়ে ভেবে দেখেছেন কি?

নিশান্ত: হয়ত…হয়ত সংস্কার বশে। এছাড়া কী বলব?

মুক্তানন্দ: কিন্তু সে-সংস্কার গ'ড়ে উঠল কেমন ক'রে? শুনুন বলি। সংস্কার শব্দটির কোনো প্রতিশব্দ নেই ইংরাজীতে। কিন্তু যেমন space বললে তার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে আমরা বেগ পাই—অথচ বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না space মানে কী—তেমনি সংস্কারের বেলায়।

নিশান্ত (ভাবিত): এমন কথাও বলা চলে না কি যে, ছেলেবেলা থেকে যা শুনে এসেছি তারি তাল পাকিয়ে সংস্কার গ'ড়ে ওঠে?'

মুক্তানন্দ: আমাদের বাড়ীতে মাছ মাংস চলত প্রতিদিন দুবেলা। কিন্তু আমার এক বোন আজন্ম মাছের গন্ধও সইতে পারত না খাওয়া তো দূরের কথা। ভূতের গল্প আশৈশব শুনেও আমার মনে ভূতের ভয় ঠাঁই পায় নি। আত্মা বা অন্তরাত্মা বলতে কী বোঝায় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, অথচ এমন অনেক অনুভূতিই আমাদের হয় মন দিয়ে যার নাগাল পাই না, অথচ অন্তর্যামী শব্দটি উচ্চারণ করতে না করতে প্রাণ ভ'রে ওঠে।

নিশান্ত : কিন্তু এদেশে বুদ্ধিবাদীরা তো স্বীকার করেন না মনের অতীত কোনো সত্য বা সত্তা আছে, যেমন আত্মা অন্তর বা ভূমা।

মুক্তানন্দ : অথচ উচ্চ গণিতের দৈনন্দিন কারবার একদিকে ভূমা—infinity-কে নিয়ে, অন্যদিকে পরমাণু—infinitesimal-কে নিয়ে। দুই-ই মনের অতীত পরিকল্পনা। $\sqrt{-১}$ স্কোয়ার রুট অফ মাইনাস ওয়ান্ কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য সত্তা নয়, অথচ উচ্চ-গণিতে তাকে বরখাস্ত করা অসম্ভব ব'লে মন-বুদ্ধিকে মানতেই হ'ল ওকে বাহাল না করলেই নয়। কিন্তু এসব কথা কাটাকাটি থাকুক। আপনি এসেছেন কি জন্যে আমি জানি। ধনসম্পদ, স্বাস্থ্য, রূপসী স্ত্রী, অবাধ স্বেচ্ছায় রঙিন সমুদ্রে গা ভাসিয়ে চ'লেও মনে স্থায়ী কোনো শান্তি পাচ্ছেন না ব'লে। তাই আপনার মনে—বিশেষ ক'রে সম্প্রতি—এক দুরন্ত প্রশ্ন জেগেছে তাদের বাড়ীকে যোগবলে অটল আনন্দধাম ক'রে তোলা যায় কি না। এ শুধু আপনার প্রশ্ন নয়—বিশ্বমানবের প্রশ্ন—এ অনিত্য জগতে দেহ মনের হুকুমবরদার হয়ে নিত্য শান্তির কোনো সুলভ টোটকার হদিশ পাওয়া যায় কি না। কিন্তু এ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারে না আমাদের দেহ মন বুদ্ধির ক্ষণিক সুখ, চিন্তার চমক বা ঐহিক বিলাস। অচলপ্রতিষ্ঠ শান্তি পেতে হ'লে হাত পাততেই হবে তাঁর কাছে যিনি সবার মাঝে থেকেও কোথাও বাঁধা পড়েন নি, যিনি অণু হ'য়েও মহীয়ান, বাধা হ'য়ে সহায়, অদৃশ্য হ'য়েও অন্তর্যামী, দেহের আধার হ'য়েও যিনি দেহাতীত, ইন্দ্রিয় যাঁর হ'লেও ইন্দ্রিয়লোকে যাঁর নাগাল পাওয়া যায় না, নেত্রপথে যিনি সব কিছু দেখলেও নেত্র যাঁর দর্শন পায় না—তার জন্যে চাই দিব্যদৃষ্টি—কানের মধ্যে দিয়ে সব কিছু শুনলেও কানে যাঁর অস্তিবাণী শোনা যায় না- তার জন্যে চাই দিব্যশ্রুতি। আমাদের এই উপনিষদে ক্রমাগত তাঁর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাঁর ছবি এঁকে নয়—তিনি কী নন তারই বর্ণপরিচয় দিয়ে। এর নাম নেতি-বাদ। ইতির পথে পৌছতে হ'লে নেতি—অর্থাৎ elimination-এর আশ্রয় নিতে হবে। অর্থাৎ তিনি এ নন ও নন তা নন···ইত্যাদি। বিচিত্র লীলা বৈ কি : রূপে তাঁকে মেলে না অথচ প্রতি রূপ আভাষ দেয় তাঁর অলক্ষ্য রূপের, বর্ণে তিনি নেই অথচ প্রতি বর্ণে রাঙিয়ে ওঠে তাঁর অদৃশ্য রঙ, গন্ধে তিনি নেই অথচ গন্ধ উদাস করে তাঁর অধরা সুবাসে। এই যে থাকা ও না-থাকা, চলা ও না-চলা, দেখা ও না-দেখা ছোঁওয়া ও না-ছোঁওয়া শাদা কালোর মিলন এরি নাম আশ্চর্য যার কথা গীতায় ঠাকুর বলেছেন : তাঁকে দেখলেও মন আশ্চর্য

হয়, শুনলেও আশ্চর্য হয়, বলতেও আশ্চর্য লাগে অথচ যতই তাঁকে দেখ না কেন, যতই তাঁর কথা শোনো না কেন, যতই তাঁর কথা বলো না কেন তিনি খতিয়ে জ্ঞেয় হ'য়েও অজ্ঞেয় থাকেন, দৃষ্ট হ'য়েও অদৃশ্য, শ্রুত হ'য়েও অশ্রুত। এ-রহস্যের চাবিকাঠি চায় সবাই, কিন্তু পায় কি কেউ কখনো?

নিশান্ত : সবই তো বুঝলাম স্বামীজি, কিন্তু তিনি নিজেকে ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চাইলেন কেন? তাঁকে হাজার ধরতে চাইলেও যদি ধরা না যায় তবে তাঁকে ধরার এ-তৃষ্ণায় কেন আমাদের নাকাল করেন? আপনারা বলেন—এ রহস্যের ডাক নাম লীলা। কিন্তু এমন নিষ্ঠুর লীলাকে করুণা নাম দেওয়া যায় কি?

মুক্তানন্দ : নিষ্ঠুর কেন? তাঁর কোল না পেয়ে এ-ও-তাকে কোলে ক'রে বেশ তর তর করেই চলেছেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়। রোগ-শোক তাপের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি চাওয়ার নাম কি সত্যি ভগবানকে চাওয়া? আমার এক বিধবা আত্মীয়া মাসিমা ছিলেন। অঢেল টাকা। তাঁর মেয়েটি যখন হঠাৎ গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে গেল তিনি মা গঙ্গাকে শাপ দিয়ে শান্তি পেতে বিশ্ব-ভ্রমণে বেরুলেন। বললেন : ঈশ্বর ফীশ্বর সব জলে আল্পনা। অথচ দুদিন আগে তাঁর চমৎকার গৃহ-বিগ্রহকে ফুলমালা দিয়ে মেয়েকে গাইতে শিখিয়েছিলেন :

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্বং মম দেবদেবঃ॥

(সুর ক'রে)

তুমি পিতা মাতা বান্ধব সখা স্বামী,
বিদ্যাও তুমি সম্পদও তুমি জানি,
তোমার মাঝারে সকলি পেয়েছি আমি,
তাই দেবদেব প্রাণেশ তোমায় মানি।

কিন্তু যে-ভক্তিমতী দিনের পর দিন এই গান গেয়ে এসেছেন তিনি সে শোকে শান্তি পেতে তাঁর সর্বস্ব দেব-দেবের দরবারে গেলেন না, উধাও হ'লেন আমোদ-প্রমোদের আরামবাগে বিশ্ব-ভ্রমণের বৈচিত্র্যের মধ্যে সান্ত্বনা পেতে।

নিশান্ত : কিন্তু যে-ভক্তের ভক্তি অচলা, তাঁকেও কি দুঃসহ দুঃখ সইতে হয় না?

মুক্তানন্দ : হয়, কিন্তু সে-দুঃখও তাঁকে আরো ভগবৎমুখীই করে আমোদ-প্রমোদের রংমহলের দিকে টানতে পারে না। চৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ যবন হরিদাসকে যখন মুসলমান পুলিশ হরিনাম করার অপরাধে মেরে আধমরা ক'রে রাস্তায় ফেলে যায়, তিনি খানিক পরে উঠে রক্তাক্ত দেহে ফের নামগানই সুরু করলেন, বৈদ্যের শরণ নিলেন না। (থেমে) আসল কথা কী জানেন? সংসারে সাড়ে পনের আনা মানুষ ভগবানকে ডাকাডাকি করে জিজ্ঞাসু হ'য়ে নয়, আর্ত বা অর্থার্থী হ'য়ে। অর্থাৎ quid pro quo : তুমি আমাকে সুখ আরাম ধনমানের বকশিশ দাও, আমি তোমাকে স্তব-স্তুতি নামগানের ফুলমালা দেব। কিন্তু তবু, নিশান্তবাবু, যারা তাঁকে আকাশকুসুম নাম দিয়ে হাসাহাসি করে তাদের সে-বিদ্রূপের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে এই প্রাণ-প্রশ্নের রেশ : "ত্বমেব সর্বং মম দেব-দেবঃ।" অর্থাৎ তাঁকে না হ'লে আমাদের দিন কাটে না, রাত পোহায় না। সকলের মর্মকোষে এ-প্রণতি এক জন্মে বেজে ওঠে না, ঠাকুর গীতায় বলেছেন : বহু-জন্মের পরে মাত্র দু'চারজন ধন্য-জন্মা জ্ঞানী দেখতে পান—এ-বিশাল বিশ্বের প্রতি অণুতে তিনি অনুস্যূত। কিন্তু পূর্ণ দর্শন না পেলেও মানুষ হ'য়ে জন্মাবামাত্র জীব অন্তরে তাঁর চকিত আভাষ পায়। নাস্তিক তাঁকে নাস্তি বললে হবে কি? কোথায় পড়েছিলাম : "বিদ্যুতের অঙ্গীকার বজ্র মেঘ অস্বীকারে বাজে।" (হেসে) নিশান্তবাবু, আমি আজ ত্রিশবৎসর ধ'রে তাঁকে খুঁজছি। বহু ঘা খেয়েছি আমিও। কিন্তু প্রতি আঘাত আমাকে তাঁর কাছেই টেনে এনেছে, দূরে ঠেলে নি। একটি মীরাভজন আমার বড় প্রিয় :

এ কেমন লীলা বন্ধু তোমার, কে পেয়েছে দিশা তার?
বিরহের ছলে দূরে ঠেলে এ কী কাছে ডাকা বারবার!

নিশান্ত : সবই তো বুঝি স্বামীজি!···কেবল যখন তিনি দূরে ঠেলেন তখন···তখন ··কী বলব···মনে হয় যদি এমন কোনো দেবদেব সত্যিই থাকেন যিনি একাধারে পিতা মাতা বন্ধু সখা বিদ্যা সম্পদ তবে তাঁর কাছে-ডাকার দৃষ্টান্তটি একটু বেশি দেখালে তাঁর বিশেষ ক্ষতি হ'ত না, কিন্তু আমাদের লাভ হ'ত সমূহ।

মুক্তানন্দ : নিশান্তবাবু, সৃষ্টির উৎস কোথায় আর সমাপ্তি কোন্‌খানে কেউ জানে না। কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি—তৃষ্ণা বিনা যেমন জল আনন্দ

দেয় না, তেমনি তাঁর অভাববোধ না হ'লে তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেও হয়ত আমরা তেমন পুলকিত হ'তাম না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ-চমকপ্রদ সত্যটির এজাহার পাওয়া গেছে বারবার। মাদাম কুরির বিশ বৎসর ধ'রে আলকাতরা ছানিয়ে রেডিয়ম আবিষ্কারের কথা ভাবুন। একাকিনী চলেছিলেন তিনি এই অটল বিশ্বাসে যে, রেডিয়ম মিলবেই এই উপায়ে। কিন্তু কত বৎসর লেগে নি ভাবুন তো। আর পরে যখন মিলল তখনকার মহানন্দের কথাও কল্পনা করুন একবার। জগতে লীলাবাদের একটি গোড়াকার সূত্র এই যে, বাধা মানুষের পরম বন্ধু, কেন না তারি প্রসাদে আমাদের সমস্ত নিহিত শক্তি জেগে ওঠে। মানুষ আজ ভুল ক'রে আত্মস্ফীতির পথে চাইছে যে মিথ্যা আনন্দ—গর্বের আনন্দ—নিরহঙ্কার হ'তে পারলে তার শতগুণ আনন্দ পাওয়া যায় পদে পদে আমরা এ-সত্যের পরিচয় পাই যেমনি ভুল ক'রে অনুতপ্ত হ'য়ে ক্ষমা চাইতে ছুটি। অথচ "এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কী কুহক ক'রে—গতায়াতের পথ আছে তবু জীব পলাতে নারে।"

নিশান্ত : মাছ জালে বাঁধা পড়লে পালাতে চায় না এটুকু বুঝতে পারি, কারণ মাছেরা মাছ, সাঁতার দিতেই শিখেছে মাত্র, ভাবতে শেখে নি। কিন্তু মানুষ কেন মুক্তির পথ আছে জেনেও বদ্ধই থাকতে চায় বলতে পারেন ?

মুক্তানন্দ : কারণ বদ্ধ থাকার মধ্যে একধরণের স্বস্তি আছে, দায়িত্ব দুর্ভাবনা আনে। আইনষ্টাইন অকারণ বলেন নি : সেনাপতির হুকুমে যখন দলে দলে এ-দেশের মানুষ ওদেশের মানুষকে মারতে ছোটে তখন আমার মনে হয় মেরুদণ্ড পেয়েই যারা তুষ্ট তাদের বিধাতা মগজ দিলেন কেন ? হয় কি জানেন ? মানুষ চলাফেরা মারামারি করতে শেখে সহজেই, কিন্তু ভাবতে গেলেই তাদের সব ঘুলিয়ে যায়। বিবর্তন—evolution—এই ভাবেই হয় ধীরে ধীরে। চিন্তার বেলা, প্রথমে মানুষ ভাবে দেহ সুখের উপকরণ কী ভাবে জোগাড় করবে। কে কতটা রসদ পেল তাই নিয়েই লড়াই করে। পরে যখন দেখে দেহসুখে শান্তি নেই ব'লে মন ভরে না তখন খোঁজে প্রথম মনের সুখ, তারপর যখন দেখে তাতেও তৃপ্তি হচ্ছে না তখনই খোঁজে আত্মার তাজমহলের খবর—অর্থাৎ মুক্তির আনন্দ। আমরা তখন একটু একটু ক'রে আবিষ্কার করি যে প্রতিপদেই অহংকারের জাল কেটে বেরিয়ে এলে মুক্তির কিছু না কিছু স্বাদ পেতে পারি। কিন্তু পারলে হবে কি, অভিমান আমাদের অন্ধ ক'রে চোখ বাঁধা বলদের মতন ঘুরিয়ে মারে, ফলে

পরমানন্দ থেকে যায় আমাদের নাগালের বাইরে। যেদিন প্রথম আমি এ-আনন্দের সুধাস্বাদ পেয়েছিলাম, নিশান্তবাবু, সেদিনকার অসহ পুলকের কথা ভুলতে পারব না। মনে হ'ল যেন আকাশে বাতাসে মুক্তির বীণা বাজছে, গাছের প্রতি মর্মর তাল দিচ্ছে, ফুলেরা হাসছে সে কী হাসি! সেইদিন আমাকে গুরুদেব নাম দেন মুক্তানন্দ—যদিও এ-আনন্দের আমি আভাস পেয়েছি মাত্র। পূর্ণস্বাদ পেতে এখনো অনেক দেরি আছে···কিন্তু আজ আর আমার সময় নেই।

সবাই তাঁকে পরপর প্রণাম করে। যমুনা তাঁর পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে বলে চোখের জলে: "আর অভিমান করব না গুরুদেব, কথা দিচ্ছি।"

॥ ছেচল্লিশ ॥

পরদিন সকালে লিদিয়া টেলিফোনে শ্রীমন্ত, প্রতিমা ও যমুনাকে নিমন্ত্রণ করল লাঞ্চে। প্রতিমা বলল টেলিফোনে: "আমার একটু কাজ আছে ভাই।"

লিদিয়া (টেলিফোনে): অন্তত একঘণ্টার জন্যে এসো—লাঞ্চ খাওয়া কাল হবে। কেবল যমুনাকে নিয়ে এস।

প্রতিমা: যমুনা যেতে পারবে কি না···

লিদিয়া: পারবে ভাই পারবে। ওকে যখন ওর গুরু চান না তখন পারবে না কেন শুনি?

প্রতিমা: দাঁড়াও, ওকে জিজ্ঞাসা করি·· আচ্ছা ও যাবে। বলল তোমাকে ওর খুব মনে ধরেছে।

লিদিয়া (হেসে): কেবল দেখো ভাই, নিশান্তকে যেন না বেশি মনে ধরে। আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করব। এখন নটা তোমরা দশটায় এসো।

* * *

নিশান্তর সুন্দর ফ্ল্যাটে গিয়ে যমুনা বলল: বাঃ, কী চমৎকার ফ্ল্যাট!

লিদিয়া: ফ্ল্যাটের আসবাব পত্র আমিই সাজিয়েছি। তোমার ভালো লেগেছে শুনে খুব খুশী হয়েছি।

যমুনা: আমার ভালো লাগা না লাগা···

প্রতিমা (বাধা দিয়ে) : যাক যমুনা। সেল্ফ-পিটি আর নয়। তোমাকে সবাই ভালোবাসে।

লিদিয়া : সত্যি কথা। তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছে...কিন্তু থাক সেকথা পরে বলব। উপস্থিত আমি তোমাদের ডেকেছি তোমার কাছে একটা প্রস্তাব করতে : আমরা এখান থেকে সুইজর্লণ্ড রোম হ'য়ে কায়রো যাচ্ছি। তুমি যাবে আমার সহচরী হ'য়ে ?

প্রতিমা : আমরা ঠিক করেছি ও আমাদের সঙ্গে ফিরে গিয়ে আমাদের স্কুলের কাজে যোগ দেবে।

লিদিয়া : যমুনা কী করবে না করবে ওরই ঠিক করা ভালো।

শ্রীমন্ত : মুক্তানন্দজিকে আজ সকালে টেলিফোন করেছিলাম, তিনি বললেন : ও এ-যাত্রা আমাদের সঙ্গে ফিরলেই, ভালো হয়।

লিদিয়া : এর মধ্যে মুক্তানন্দজিকে টানছ কেন ?

প্রতিমা : তিনি ওর গুরু বলে।

লিদিয়া : ফুঃ। গুরু ফুরুর দিন ফুরিয়েছে।

যমুনা : কী বলছেন আপনি ?

লিদিয়া : তিনি তো তোমাকে চান না ভাই।

যমুনা : তবু তিনি যা বলবেন—জানি না কী করা উচিত। মাথার মধ্যে কেমন যেন ফাঁকা লাগছে।

নিশান্ত : তুমি এখানে এসেছিলে নার্স হ'তে কি তাঁর কথায় ?

যমুনা : সে সব ভেস্তে গেছে (চোখের জল মোছে)

লিদিয়া : তাহ'লে আমাদের সঙ্গে যাবে না কেন ?

শ্রীমন্ত : আমি তাঁকে আজ সকালে টেলিফোন করেছিলাম, তিনি বললেন ওর পক্ষে এখন কলকাতা ফেরাই সবচেয়ে নিরাপদ।

লিদিয়া (আতপ্ত কণ্ঠে) : আচ্ছা আমিও তাঁকে টেলিফোন করছি। আমার মনে হয় উপস্থিত ওর একটু ছুটিই বেশি দরকার। কী বলো যমুনা ? তাঁকে জিজ্ঞাসা করব (সব্যঙ্গে) তাঁর কী হুকুম ?

যমুনা (সাভিমানে) : না, তিনি যখন আমাকে কলকাতায় ফিরতে বলেছেন তখন আমি তোমাদের সঙ্গেই যাব সুইজর্লণ্ড।

লিদিয়া (খুশী হ'য়ে) : এই-ই তো চাই। তিনি যখন তোমার ভার নিতে নারাজ তখন তুমি কেন তাঁর মুখ চেয়ে থাকবে ? তাই আমি বলি—

তুমি কলকাতায় ফিরতে চাও যদি তো যেয়ো—কেবল দুদিন পরে। আমি তোমার মতন একটি সহচরী খুঁজছিলাম, সত্যি বলছি। এ-জগতে কত কী দেখবার শুনবার জানবার আছে, কেন তুমি মনমরা হ'য়ে থাকবে ভাই? আমরাও কলকাতা যাব—সাত আটমাস বাদে। ইতিমধ্যে তোমার টাকাটা কোনো ব্যাঙ্কে বা অন্যত্র সুদে খাটিয়ে ডবল করতেও পারো। মেয়েদের স্বাধীন হবার পথে সব চেয়ে বড় বাধা এই যে. তাদের ভরণ-পোষণ করেন দয়াময় ভর্তা। দয়া চমৎকার জিনিস, কিন্তু ভর্তার বাঁদী হওয়ার যুগ গত। না ভাই, এ মিথ্যে ঝাঁঝের নয়। তুমি দেখতে পাবে তুমি নিজেই নিজের মতিগতির লাগাম ধরতে না ধরতে কী ভাবে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাচ্ছে। সম্প্রতি আমার এক মামার কিছু টাকা পেয়ে আমি চাক্ষুষ করেছি নিজের রূপান্তর, তাই একথা বলছি এত জোর ক'রে। নিশান্তর মুখে শুনেছি—বর যখন বৌকে প্রথম ঘরে আনে তখন সে না কি মা-কে বলে: "মা, তোমার জন্যে এক দাসী এনেছি।" শুনে আমার গার মধ্যে রি-রি ক'রে ওঠে। এই অপমান তোমরা মেনে নাও সগৌরবে? বাধ্য হ'য়ে যদি মানতে হয় সে বুঝি—বেঁধে মারলে সব সয়, বলে না? কিন্তু একে আদর্শ পুত্রবধূর পদবী বললে শুধু বধূর অপমান নয়, বরেরও মানহানি হয় না কি?

প্রতিমা (বিরক্তি চেপে): কিন্তু কী সব অবান্তর…

লিদিয়া: অবান্তর? মোটেই না। চোখের সামনে দেখছ না যমুনার কী হাল হয়েছে আর একজনের পায়ে ভর ক'রে দাঁড়াতে চেয়ে? নানা মিষ্টি নাম দিয়ে পুরুষ মেয়েদের ভুলিয়েছে কবে থেকে! মেয়েরা এ-বঞ্চনার কথা আজ টের পেয়েছে—সবাই নয়, কিন্তু অনেকেই। আর তাদের ছোঁয়াচে বাকি মেয়েদের মনেও প্রশ্ন উঠেছে স্ত্রী কি দাসী বা তৈজস মাত্র, তার বেশি নয়? মেয়েদের কোনো কোনো রঙ্গিনী ছলা-কলা আমারো ভালো লাগে না। কিন্তু তারা যে পুরুষের সেবিকা নয়—সঙ্গিনী, এ-কথার মার নেই! তোমার নিজের দৃষ্টান্তই নাও না কেন। তোমার শাশুড়ী তোমাকে বরণ ক'রে এমন কি দাসী ব'লেও ঘরে তুলতে না-চাওয়ার দরুণ তোমাকে কী বিষম ভুগতে হয়েছিল বলো তো। রুষদেশের অনেক হাঁকডাকেই আমার মন সাড়া দেয় না। কিন্তু তারা যে সব মানুষকেই 'কমরেড' সহযাত্রীর পদবী দিয়েছে এজন্যে তাদের আমি বলবই 'ধন্য ধন্য।'

যমুনা: তোমার কথায় উদ্দীপনা আছে দিদি। বেশ আমি কিছুদিন

তোমার সঙ্গিনী হ'য়ে ঘুরব যদি (প্রতিমাকে দেখিয়ে) দিদি অনুমতি দেন।

প্রতিমা (অপ্রসন্ন): অনুমতি আবার কি? লিদিয়া তো ব'লেই দিয়েছে তুমি দাসীও নও সেবিকাও নও—যা ভালো বুঝবে করবে, আমি টুকব কেন?

যমুনা: রাগ কোরো না দিদি। তোমার ঋণ কি আমি কোনোদিন শুধতে পারব? আমি তোমার সঙ্গেই ফিরে যাব কলকাতায়। যতদিন তোমার স্কুলে আমি কাজে লাগব···

প্রতিমা (বাধা দিয়ে): স্কুলের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি লিদিয়ার কাজে লাগলে আমি অখুশী হ'তেই পারি না। তবে মেয়েরাও কমরেড উপাধি দাবি করতে পারে শুনে একটু হাসি পায় বৈ কি। কারণ মেয়েরা মেয়ে, ছেলেরা ছেলে—তাদের দেহের গড়ন আলাদা, মনের গড়ন আলাদা। কমরেড? অবাক কাণ্ড! ছেলেরা কি মা হ'তে পারে, না মেয়েরা বাপ হ'তে পারে? তফাৎ থাকলে তবেই মিলন হয়। জলের সঙ্গে জলের মিলন কি জলের সঙ্গে চিনির মিলনের জুড়ি? লিদিয়ার অনেক গুণ আছে, কিন্তু এই গাজোয়ারি সবজান্তা ঢঙে কথা বলা—এও চলে না এ-যুগে। কারণ সত্য কারুর একচেটে সম্পত্তি নয়।

লিদিয়া (রুষ্ট): তা না হ'তে পারে, কিন্তু সত্যকে যে চোখ মেলে দেখতে চায় না সে সত্য কী বস্তু জানতে পারে না। আর যে দেখতে চায় না তার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সে দেখতে পায় তার সিদ্ধান্ত মেলে না। যেখানেই একটু একটু ক'রে মানুষের চোখ খুলেছে সে দেখেছে একই সত্য, যথা সূর্য জ্বলে, চাঁদ হাসে, ফুল ফোটে, লতা দোলে, উৎসাহ জাগায়, ক্লান্তি ঘুম পাড়ায়, নীলাকাশ সুন্দর, কঙ্কাল কুশ্রী ··কত বলব। তোমারো অনেক গুণ আছে, কেবল যার সঙ্গেই মতভেদ হয় তাকে আসামী কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়ে ব্যঙ্গের বান হানো। কিন্তু ব্যঙ্গ কিছু যুক্তি নয়। আমি···

প্রতিমা: রোসো রোসো, ব্যঙ্গ করলাম আমি কখন? কথা হচ্ছিল যমুনার এখন কী করা উচিত তাই নিয়ে। আমি শুধু বলেছিলাম ও কলকাতায় ফিরে গিয়ে কাজে মন দিলে ওর মন ভালো হবে, বিদেশে ঘোরাঘুরি ক'রে মন আরো অস্থিরই হয়—এক কাজের মধ্যে দিয়েই মানুষ শান্তি পায়।

লিদিয়া: কে বলল? যমুনা নার্সদের জিজ্ঞাসা করুক তো রাতদিন

ছোটাছুটি ক'রে তারা কী শান্তি পেয়েছে? যাও কোনো মিলে বা ফ্যাক্টরিতে: অমুক অষ্টপ্রহর পেরেক ঠুকেই চলেছে, তমুক হিসেব ক'রে ক'রে থ'কে গেল। লক্ষ লক্ষ হোটেলের দারোয়ানরা পায়চারি করছে কেবল এদিক থেকে ওদিক আর ওদিক থেকে এদিক। এদের মধ্যে কে সত্যিকার শান্তি পেয়েছে শুনি? কিন্তু তর্কাতর্কি থাক, যমুনা যা ভালো বোঝে করুক, আমি কেন মিথ্যে পরের কথা ভেবে মরি?

শ্রীমন্ত: না লিদিয়া তুমি প্রতিমাকে ভুল বুঝেছ। সে বিশ্বাস করে যে আমাদের মতন তুমিও যমুনার মঙ্গলই চাও। ওর বলবার কথা এই যে, কলকাতায় যমুনা ছেলেমেয়েদের ভালোবেসেই তাদের কাছে টানত, শিক্ষা দিত, খেলাধুলোয় তাদের সঙ্গিনী হ'ত। এসব কিছু কঠিন বা একঘেয়ে কাজ নয়, পরিবেশও সুন্দর। কোনো কাজের ম'ত কাজ না থাকলে শুধু ঘুরে ঘুরে সাইট-সীইংও হ'য়ে ওঠে ক্লান্তিকর—বিশেষ ক'রে যমুনার বর্তমান মনের অবস্থায়! কিন্তু তোমাদের সঙ্গে নানা দেশের নানা দৃশ্য দেখে ও যদি ওর অবসাদ কাটিয়ে উঠতে পারে তো প্রতিমাও তোমার মতনই খুশী হবে। আমার মনে হয় কী জানো? যখন তোমরা দুজনেই ওর মঙ্গল চাও তখন বোঝাপড়াটা আগে তোমাদের মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া তোমাদের মতান্তরের ফলে যদি মনান্তর হয় তাহ'লে নিশান্তও দুঃখ পাবে, আমিও সুখী হব না। সংসারে অমিলের কালো নিশান উড়ছে চারদিকেই অষ্টপ্রহর। তাই আরো মনের মিলকে লালন করা চাই, কারণ মিল হ'ল বিরল চারাগাছ, অমিল হ'ল নিরস্ত আগাছা যাকে নির্মূল না করলেই নয়। অনেক সময়েই মানুষ ওজন ক'রে কথা কয় না। প্রতিমা যদি একটা বেফাঁশ কথা ব'লেই থাকে…

প্রতিমা: হ্যাঁ দিদি, আমার অপরাধ নিও না, আমি মাপ চাচ্ছি।

লিদিয়া (উঠে ওকে আলিঙ্গন ক'রে): আমার মন্তব্যই বেশি শ্রুতিকটু হয়েছে, কাজেই আমারি অপরাধ বেশি। যমুনা যা ভালো বোঝে করুক।

যমুনা: আমি কলকাতায়ই ফিরে যাব দিদি, রাগ কোরো না!

লিদিয়া: বেশ কথা। আমরাও সাত আট মাস বাদে কলকাতায় যাব, তখন ফের দহরম মহরম করা যাবে।

॥ সাতচল্লিশ ॥

মুক্তানন্দজির পায়ে হঠাৎ একটা বিষফোড়ার আবির্ভাবের দরুণ তাঁকে কানাডায় যাওয়া স্থগিত রাখতে হ'ল এক সপ্তাহ। ডাক্তার এসে অপারেশন করার ফলে ব্যথার উপশম হ'ল বটে, কিন্তু চলাফেরা প্রায় বন্ধ। যমুনা কোনো নার্স আনতে দিল না, রাতেও তাঁর ঘরের মেঝেতে এক তোষক বিছিয়ে শুত।

নিশান্ত সুবিধা পেয়ে প্রত্যহ সাঁঝ সকালে এসে মুক্তানন্দজিকে এ ও তা নানা প্রশ্ন করা সুরু করল। লিদিয়া বলল সাভিমানে: "তুমি ওঁর সঙ্গে যে-ভাবে প্রেমে পড়লে আমার সঙ্গেও সে-ভাবে পড়ো নি।"

প্রতিমা: অমন কথা বলে না। নিশান্তর মধ্যে একটা পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে ওঁরই পুণ্য সংস্পর্শে।

শ্রীমন্ত (হেসে): কী পরিবর্তন? বিড়াল রাতারাতি বাঘ ব'নে গেল? তবে তাও হয়ত হয়। কেবল নাস্তিক আস্তিক হয় না প্রতিমা!

মুক্তানন্দজির শয্যার পাশেই ওদের কথালাপ চলছিল। তিনি টুকলেন: "বিল্বমঙ্গলের কাহিনী পড়েছেন কি?

শ্রীমন্ত: পড়ি নি, তবে বাবার মুখে শুনেছিলাম তিনি চিন্তামণি নামে এক রক্ষিতার তিরস্কারে হঠাৎ বিলাসী বন্ধুদের ছেড়ে উদাসী সম্প্রদায়ের দিকে ঝুঁকেছিলেন, আর পরে অন্ধ হ'য়ে কৃষ্ণের দেখা পেয়েছিলেন। তাই না?

নিশান্ত: কিন্তু এ-কাহিনী কি ইতিহাস, না রূপকথা?

মুক্তানন্দ: গবেষকরা একে ইতিহাস ব'লে মেনে নেন তা নয়, কিন্তু যাঁরা ধ্যানী সাধু তাঁরা সবাই বলেন বিল্বমঙ্গল গীতার মহাবাক্যের একটি চমৎকার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত যে, অতি সুরাচারও যদি সর্বান্তঃকরণে ঠাকুরের দিকে ফেরে তবে সে সত্যিকার সাধু ব'নে যায় আর রাতারাতি ধর্মাত্মা হ'য়ে চিরশান্তি পায়।

লিদিয়া: স্বামীজি, আপনারা জ্ঞানী বাগ্মী দার্শনিক। কিন্তু কল্পনার মানুষকে সত্যের ধ্রুবতারা মনে করতে বড় বেশি ভালোবাসেন মনে হয়।

এখানে বোধহয় আপনাদের সঙ্গে আমাদের মনের একটা গভীর অমিল আছে। কারণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক উল্টো। আমরা বলি: বাস্তবের ধুলোবালিকে অস্বীকার করা সম্ভব নয় কারণ কল্পনাকে নিয়ে কবিত্ব করা যেতে পারে, কিন্তু ঘরকন্না করা যায় না। হয়ত সেইজন্যই কিপ্লিং সাহেব বলেছেন প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের মিলন হবে না কোনোদিনই বা: "The East is East, the west is west—never the twain shall meet."

মুক্তানন্দ: এ আপনার রাগের কথা। নিশান্তবাবুর সঙ্গে আপনার মিলন কি কল্পনা বলবেন?

লিদিয়া (থতমত খেয়ে): না···কিন্তু···মানে, এ তো প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার মিলন। কিপ্লিং সাহেব বলেছেন দুই দেশের কথা—ভাবের, প্রেমের নয়।

মুক্তানন্দ: কিন্তু সব ভাবেরই অন্তিম পরিণতি কি প্রেমে নয়। এই যে প্রতিমা দেবী আর শ্রীমন্তবাবু এঁরা গ'ড়ে উঠেছেন কি উল্টো নীতি আচার ভাবের পরিবেশে নয়? কিন্তু এঁদের সঙ্গে আমি ঘর ক'রে দেখেছি যে, এই দুটি মানুষের মধ্যে একটি সুন্দর সহজ সমন্বয় হয়েছে যার ইমারতে অমিলও হয়েছে মিলের সহায়।

লিদিয়া: আমি ভারতবর্ষকে হিন্দুধর্মকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি স্বামীজি। কেবল.. কেবল···কী বলব বলুন···আমি ঠিক আপনার প্রতিমা দেবী নই, আমার রক্তে ক্যাথলিক সংস্কার চারিয়ে আছে। তাদের সব ভাব বা সূত্র আমার ভালো লাগে না, লাগতে পারে না—বলাই বাহুল্য। কিন্তু বংশগত ভয় ভাবনা রীতি নীতি কী ভাবে মানুষকে নাকাল করে আমার এক সখীকে দেখে টের পেয়েছি, বা ঠেকে শিখেছি বলাই ভালো। নিশান্ত আপনাকে নানা প্রশ্ন করেছে, আরো করতে চায়। ওর এই এক বদভ্যাস—প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা—কিসে কী হয়, কেমন ক'রে হয়, এমন না হয়ে অমন হ'ল না কেন ইত্যাদি। কিন্তু হাতে-কলমে কিছু না করলে শুধু প্রশ্ন ক'রে কি কোনো তল পাওয়া যায়?

মুক্তানন্দ: আপনার মুখে একথা শুনে আমি সত্যি ভারি খুশী হয়েছি। জলে ঝাঁপ না দিয়ে তীরে ব'সে ঢেউ গুণলে উপরভাসা ঝিকিমিকির খবর মিলতে পারে কিন্তু অতলতলের রত্নমণির সন্ধান পাওয়া যায় না। এই জন্যেই—সেদিন যা বলছিলাম—what do you think এ-প্রশ্ন না ক'রে প্রশ্ন

করা চাই—what do you know? কিন্তু সেখানেও ফ্যাশাদ কম নয়, কারণ সত্যিকার জ্ঞানের—জানার মতন জানার—আভাস দেওয়া গেলেও তার আনন্দ শান্তি সার্থকতার সংবাদ ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

নিশান্ত: ঠিক কী বলতে চাইছেন স্বামীজি? একটু ঝাপসা লাগছে…

মুক্তানন্দ: ধরুন গীতার স্থত্র সমত্বং যোগ উচ্যতে—কিনা সমতাকেই যোগ বলে। দৃষ্টান্ত দিতে ঠাকুর বললেন: পণ্ডিত গরু হাতী গরু কুকুর চণ্ডাল সবাইয়ের মধ্যেই নারায়ণ আসীন চাক্ষুষ করা চাই। কিন্তু করলে কী হয় ভাষায় তার খবর দেবে কে? শুধু বলা যায়—হয় এক অনির্বচনীয় প্রাপ্তির অনুভূতি। ঈশ উপনিষদে আরো বলেছে—সব জীবকে যিনি নিজের আত্মার সঙ্গে এক ব'লে জেনেছেন তিনি সেই একত্ব অনুভব করার ফলে সব শোক মোহের পারে চ'লে যান। (শিউরে উঠে) একবার এই উপলব্ধির আভাষ আমি পেয়েছিলাম। সে যে কী দরদ-এর অনুভূতি কী অনির্বচনীয় শান্তি ভাষায় কেমন ক'রে প্রকাশ করব বলুন? বিশ্বাত্মবোধ শব্দটি শুনতে গালভরা হ'লেও হাজার আবৃত্তি করলেও সে-দরদ বুকের মধ্যে জেগে ওঠে না যার সংজ্ঞা দিতে ভাগবত জগৎ-প্রণামের মতন একটি অপরূপ শব্দ চয়ন করেছে। ভাবটা বোঝা শক্ত নয় নিশান্ত বাবু। জগত যখন নারায়ণে বিধৃত তখন জগতকে প্রণাম না করবে কে? কিন্তু শব্দের আভিধানিক অর্থ বুঝে প্রণাম আর রক্তের মধ্যে তার জীবন্ত প্রবাহকে অনুভব ক'রে প্রণাম—এ-দুয়ের মধ্যে তফাৎ আকাশ পাতাল। এত তফাৎ যে যত গুছিয়েই বলি না কেন, যে অনুভব করে নি সে বুঝবে না বা ভুল বুঝবে। ঠিক যেমন দাতাকে প্রাচ্যবিৎ ভুল বোঝেন পদে পদে।

লিদিয়া: কিরকম বোঝা ঠিক বোঝা একটু ব্যাখ্যা করবে?

মুক্তানন্দ: ধরুন, যখন ঠাকুর অর্জুনকে বললেন: "তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ"—এর শব্দার্থ: অতএব সব সময়ে আমাকে মনে রেখে যুদ্ধ করো। প্রাচ্যবিৎরা বললেন মাথা নেড়ে: "ছি ছি, এরই তো নাম মিলিটারিস্‌ম্—সর্বদা যুদ্ধ ক'রে চলো।" কিন্তু কীভাবে যুদ্ধ করতে হবে সে-সম্বন্ধে ঠাকুর যা বলেছেন তাকে আমলই দিলেন না—অর্থাৎ "আমাকে মনে রেখে যুদ্ধ করো।" কিন্তু এই মনে রাখা—remember verb-টি—শুনতে সংক্ষিপ্ত হ'লেও তার ভাষা বিশাল। সব সময়েই তাঁকে উৎসর্গ করবে তোমার খাওয়া দাওয়া খেলাধুলো দান ধ্যান যাগ-যজ্ঞ স—ব, এমন কি

যুদ্ধও করবে নিজে জয়ী যশস্বী হ'তে নয় ভগবৎ-ইচ্ছার জয়কে বরণ করতে। অর্থাৎ সব জয়ের গৌরব ভগবানকে দিয়ে নিজেকে শুধু "নিমিত্তমাত্র" বলে সনাক্ত করতে।

লিদিয়া: যদি সে মনে করত ভগবানের ইচ্ছায়ই তারা যুদ্ধ করছে তাহ'লে কীএমন আসত যেত বলতে পারেন। যাদের বধ করা হ'ল তারা তো আর প্রাণ ফিরে পাবে না।

মুক্তানন্দ: না, কিন্তু যারা তাদের বধ করল জেনে যে যারা মরল তারা ভগবানের ইচ্ছায়ই মরেছে তারা কেবল তাঁর হুকুম মেনে চলেছে, তাদের মধ্যে এমন এক দৈবী শক্তি নামবে যার অবতরণে জগতে এক নব ধর্মরাজ্যের সূচনা হবেই হবে।

নিশান্ত (দীর্ঘশ্বাস ফেলে): চমৎকার, কিন্তু খতিয়ে এ-সবই তো রঙিন স্বপ্ন, কল্পনার ঝিকিমিকি স্বামীজি! মানুষ আবহমানকাল রূপকথার দরবারে ধর্না দিয়েছে এই সান্ত্বনা চেয়ে যে তৃষ্ণার জল আজ না পেলেও কাল পাবই পাব। কিন্তু সৃষ্টির প্রথম অরুণোদয় থেকে আজ পর্যন্ত হয়েছে কি মানুষের দুঃখনিবৃত্তি যার জন্যে বুদ্ধ রাজ্য ছেড়ে ভিক্ষু হয়েছিলেন?

মুক্তানন্দ: শিশু একদিনে চলতে শেখে না নিশান্তবাবু। বিজ্ঞানী যে-প্রবুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে বস্তুবিচার করেন তারও বর পান নি তিনি চাইতে না চাইতে। নানা জটিল গোনাগুন্তি পরীক্ষার পরে তবে তাঁদের ধ্যান চিন্তা পাখা মেলে পৃথিবীর নানা টান থেকে মুক্তি পেয়েছে। এর মধ্যে একটি মহামুক্তি এই আবিষ্কার যে, চর্মচক্ষে যা দেখছি তাই সব নয়, আর আজ যা দেখতে পাচ্ছি না তা দেখতে পেলে তবেই যা দেখছি তার সদর্থ করতে পারব, নৈলে নয়। মানুষের দুঃখ অগুন্তি ও অভাবনীয়। এক দুঃখ জয় করতে না করতে আর এক দুঃখ গজায় যেমন রক্তবীজ দৈত্যের প্রতি রক্তবিন্দুতে এক এক নতুন দৈত্য গজাত। তাই দেখতে পাবেন—এ-যুগের বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছেন মানুষের দুঃখনিবৃত্তির নয়—নব নব জ্ঞানের প্রসাদে দৃষ্টির দিগন্তকে প্রসারিত করতে। ফলে কোনো কোনো দুঃখের উপশম হয়েছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞান আজও সেই প্রজ্ঞানের খবর পায় নি যার আলোকপাতে শুধু বিশ্বের নয় দুঃখের চেহারা বদলে যায়! মহাভাগ মহাত্মাদের সাধনায় এ-আলো অল্প স্বল্প নেমেছে বটে কিন্তু পুরোপুরি নামে নি, কারণ বিশ্বলীলা চলেছে কোন মোহানায় আমরা আজও জানতে পারি নি; যেদিন পারব কেবল সেই দিনই আমরা

দেখার ম'ত দেখতে শিখব। কিন্তু তা হ'লেও ইতিমধ্যেই মহাপুরুষেরা অন্তরে পেয়েছেন এক মহাশক্তির আভাষ যে-শক্তি বাইরেও লক্ষ লক্ষ গ্রহতারা নীহারিকাকে উধাও ছুটিয়ে চলেছে, গায়ত্রী যার স্তবগান করেছে এই ব'লে যে যে-মহাশক্তি সূর্যের তেজ জোগায় সেই দৈবী শক্তি যেন আমারও বুদ্ধির নিয়ন্ত্রী হয়। একটি ভক্ত কবির গানে এই সত্যের অপরূপ ঝঙ্কার পাই :

আনন্দে অনন্ত প্রাণ করিছে বন্দনা গান
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো।
সকলি কি অর্থহীন? শূন্য— শূন্যে হবে লীন?
তবে কেন সে-গীতি সৃজিলে গো?

না, নিশান্তবাবু। অনন্ত প্রাণ মহানন্দে যুগ যুগ ধ'রে যাঁর বন্দনাগান গেয়ে এসেছে তাঁকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে শুধু চান্স বা অ্যাক্সিডেন্টকে এ-বিশ্বলীলার বীজ ব'লে সনাক্ত করার নাম বৈজ্ঞানিক গবেষণা নয়—গাজোয়ারি বাতুলতা।

ক্রিং…ক্রিং…ক্রিং…

ডাক্তার সেনের প্রবেশ

মুক্তানন্দজিকে প্রণাম করার পরে ডাক্তার সেন বসলেন তাঁর পাশের একটি চেয়ারে। তারপর পায়ের পট্টি খুলে দিয়ে বললেন : "প্রায় সেরে গেছে—আশ্চর্য। প্রায় অঘটন বলা চলে।"

মুক্তানন্দ (হেসে) : বৈজ্ঞানিক অন্তরে "শক্"-টা কি একটু বেশি লেগেছে?

ডাক্তার সেন (হেসে) : তা বলতে পারেন। কারণ কার্বাংক্ল সারতে সময় নেয়। তবে আপনার মতন এক মিসটিকের Parkinson's disease গঙ্গাস্নানে একদিনে সারতে দেখেছি—যাকে বলা চলে অভাবনীয়। আমরা, ডাক্তারেরা, দেহের 'তথ্য' জড়ো করি, কিন্তু 'তত্ত্বের' বেশি কিছু জানি না। আমি নিজে আগে আগে পাশকরা ডাক্তারের রায়কেই বেশি মান দিতাম। এখন আর দিই না কারণ to live is to learn; কিন্তু হ'লে হবে কি, হার্লি স্ট্রীটের বিশেষজ্ঞরা দারুণ রোখালো—তাঁরা মিসটিক শক্তি ফক্তিকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেন। আমি আজ আর তাঁদের হাসাহাসিতে সাড়া দিই না স্বামীজি, সত্যি বলছি, তবু—

মুক্তানন্দ : অত ভনিতায় প্রয়োজন নেই ডাক্তার সেন। আমি মিসটিক

হ'লেও না আছে আমার বর দেওয়ার শক্তি, না শাপ দেওয়ার ক্ষমতা। আপনাকে আজ ডেকেছি শুধু একটি কথা জানতে: আমি কাল পরশু কিম্বা তরশু কানাডা রওনা হ'তে পারি কি?

ডাক্তার সেন: না স্বামীজি, আমার মনে হয় আপনার আরো অন্তত এক সপ্তাহ থাকা উচিত আমাদের ডাক্তারি গণ্ডীর মধ্যে। জানেন তো গণ্ডী পেরিয়ে সীতা দেবীর কী দুর্দশা হয়েছিল।

মুক্তানন্দ: অভিনন্দন ডাক্তার সেন! (লিদিয়াকে) পড়েছেন কি রামায়ণ? মানে অনুবাদে?

লিদিয়া: না, তবে নিশান্তের কাছে গল্প শুনে খুব উপভোগ করেছি। (হেসে) আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল—কুম্ভকর্ণের ছমাস ধ'রে ঘুমোনো আর ছমাস ধ'রে খাওয়া। মাইথলজি বটে with a vengeance!

মুক্তানন্দ: মাইথলজিরও রকমফের আছে। কুম্ভকর্ণের ঘুম ও অতিভোজন হ'ল তামসিকতা with a vengeance; কিন্তু সীতাহরণ শুধু গল্প নয়—সীতার মধ্যে দিয়ে ফুটেছে তাঁর অতুলনীয় চরিত্র—জগতের সতীদের ইতিহাসে যার জুড়ি নেই।

প্রতিমা: কেন সাবিত্রী?

মুক্তানন্দ: তিনি আর একটি···কী বলব···শিখরিণী। দুজনেই বরেণ্যা তথা অনন্যা। তবে দুজনের মহত্ত্বের ছন্দ আলাদা—এত আলাদা যে, তুলনা করা চলে না যেমন চলে না ভীষ্মের সঙ্গে অর্জুনের তুলনা। (লিদিয়াকে) আপনি মাইথলজিকে অবজ্ঞা করবেন না কল্পনা ব'লে। গুরুদেব মাঝে মাঝে রামায়ণ মহাভারত ও নানা পুরাণের পাঠ দিতেন, তা থেকে আমি শিখেছি এই একটি গভীর তত্ত্ব যে, পড়তে জানলে মাইথলজির মধ্যে দিয়ে আমাদের মুনি ঋষিদের হৃৎস্পন্দন তথা গভীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

ডাক্তার সেন: আপনি এই পাঠের একটি বৈঠক বসান না কেন স্বামীজি। প্রাজ্ঞদের তো এই-ই কাজ সাধুজি আমাদের মতন অজ্ঞদের দেখতে বুঝতে চিনতে শেখানো।

মুক্তানন্দ: শ্—শ্। এমন কথা বলতে আছে! এখানকার মেডিকাল বোর্ড টের পেলে আপনার নাম কেটে দিয়ে আপনাকে একঘরে করবে।

ডাক্তার সেন: না, দেহতথ্যের চৌহদ্দির বাইরে আমি যা ইচ্ছে বলতে পারি, যা ইচ্ছে শুনতে পারি, যা ইচ্ছে গাইতে পারি।

মুক্তানন্দ : বলেন কি! বেসুর বেতালও?

ডাক্তার সেন : হ্যাঁ, তবে বাথরুমে। (সকলের কলহাস্য)

ডাক্তার সেন (হাসি থামলে) : কি? আমি বলি প্রথমে মহাভারতের পাঠ দিন, পরে রামায়ণের তার পরে নানা পুরাণের।

মুক্তানন্দ। প্রথমে মহাভারত কেন? রামায়ণ থেকেই তো সুরু হওয়া উচিত।

ডাক্তার সেন : মহাভারতের নানা ড্রামাটিক রস এখনো মনে হয় না সেকেলে। জানেন কি—রুষভাষায় ওরা মহাভারতের অনুবাদ করেছে?

মুক্তানন্দ : শুনেছি। তবে ওদের কি সত্যি মনে ধরবে, ধরুন দ্রৌপদীর ভক্তি, ভীষ্মের ব্রহ্মচর্য, যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্য, কৃষ্ণের অবতার-বাদ, বিদুরের ধর্মভীরুতা, গান্ধারীর চোখে পট্টি বেঁধে অন্ধ হ'য়ে থাকতে চাওয়া?

ডাক্তার সেন : সেই জন্যেই তো চাই মডার্ন ভাষ্য। যেমন বিবেকানন্দ করেছেন বেদান্তের, শ্রীঅরবিন্দ অতিমানবতার, শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃপূজার মধ্যে দিয়ে ভক্ত ও ভগবানের আত্মীয়তার।

মুক্তানন্দ : আপনার কথা শুনে চমকে গেছি সত্যিই। যদি আমার এখানে কিছুদিন থাকা হয় তবে আপনার অনুরোধ মনে রাখব—মহাভারত রামায়ণ সম্বন্ধে বলব যা পারি। তবে এ-যাত্রা যদি না হয় তো আমেরিকা থেকে ফিরে দেখা যাবে।

(সকলে একে একে তাঁকে প্রণাম ক'রে নিষ্ক্রান্ত)

॥ আটচল্লিশ ॥

দুদিন পরে শ্রীমন্ত মুক্তানন্দজির একটি চিঠি পেল। সাগ্রহে প্রতিমাকে ডেকে পড়াল : "আপনাদের সঙ্গে আর একবার আলাপ ক'রে আমেরিকা পানে পাখা মেলব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু যমুনাকে আর আমার সুশ্রূষা করতে দেওয়া চলে না। ওকে অবশ্য বলবেন না, কিন্তু আপনাদের জানা দরকার—হাজার দীক্ষা মন্ত্র নিলেও অন্তরাত্মা যতদিন ভগবৎমিলনের জন্যে ব্যাকুল না হয় ততদিন তাঁর কৃপাকিরণ নেমে আঁধারের হাজারো বাধাকে

সরিয়ে দেয় না, দেখতে শিখিয়ে কোথায় কোন দুর্বলতা গাঢাকা হ'য়ে আছে। নিশান্তবাবু আমাকে কাল একটি পত্রে লিখেছেন—ভগবানের কৃপা কি কেবলমাত্র কয়েকটি ভাগ্যবানের জন্যে? এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে একটি পুস্তক না হোক পুস্তিকা লিখতে হয়। তার সময় নেই কারণ কালই আমি আকাশে উড্ডীয়মান হব, নানা টুকিটাকি কাজ হাতে, আপনাদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেকও নিরিবিলি ব'সে তত্ত্বকথা আলোচনা করবার সময় নেই, আর সময় না থাকলে নিয়তির নানা খামখেয়ালিয়ানার মর্মবাণী বোঝানো যায় না। কেবল একটি কথা নিশান্তবাবুকে বলবেন: মানুষ যতদিন সংসারে হেসে-খেলে কাটায় ততদিন কৃপার পাসপোর্ট পাওয়া অসম্ভব। তার জন্যে চাই ব্যাকুলতা যার যথার্থ নাম বৈরাগ্য। দেহের তৃষ্ণা না জাগলেও জলের সন্ধান মিলতে পারে (যদিও তৃষ্ণা বিনা জলপানে তৃপ্তি নেই) কিন্তু পিপাসা গভীর না হ'লে কৃপার সুধাধার নিজে থেকে এগিয়ে আসেন না। উপমাসম্রাট শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: যতদিন শিশু চুষিকাঠি নিয়ে খুশী থাকে ততদিন মা তার তল্লাটে আসেন না, যখন সে চুষিকাঠি ফেলে দিয়ে "মা-মা" ব'লে কান্না জুড়ে দেয় তখন মা সব কাজ ফেলে দৌড়ে এসে তাকে কোল দেন। সংসারে সাড়ে পনেরো আনা মানুষ কোনো-না-কোনো রঙিন চুষিকাঠি নিয়ে খুশী থাকে। রোগ শোক তাপ আশাভঙ্গের ফলে কখনো কখনো এক ধরণের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়) মর্কট বৈরাগ্য আসে বটে, কিন্তু সে ধোপে টেঁকে না। জানেন তো, এক প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্ত্রীবিয়োগের পরে চোখের জলের নদী বইয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বছর না ঘুরতেই ফের বিবাহ করেছিলেন। তাঁর দোষ নেই। এরি নাম লীলাময়ের ভুবন-মোহিনী মায়া। সাধু সন্তরা আসেন একথা মনে করিয়ে দিতে, কিন্তু ক-জন তাঁদের ভাগবতী কথায় কান দেয়? এই যে আমি চলেছি আবার উড়ে আর এক দেশে—কেন? এও এক মায়া বৈকি। লেকচার দিয়ে, গীতার ভাষ্য ক'রে আত্মপ্রসাদে প্রফুল্ল হ'য়ে উঠি। কিন্তু ক-জনের কানের মধ্যে দিয়ে মরমে পৌঁছয় এসব বাণী? আমাকে ভুল বুঝবেন না। সৎকথায় একেবারে কোনো কাজই হয় না বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে। দু'চারজন একটু মন দিয়ে শোনে হরিকথা, ফলে রোগ শোক তাপে কিছুটা সত্যিকার সান্ত্বনা পায় বৈকি। কিন্তু সান্ত্বনা শান্তির ছোঁয়াচ পেলেও বর পায় না। বর পায় খতিয়ে তারাই যারা প্রাণকে বাজি রেখে এ-দুর্গম পথের পথিক হয়, যাদের তিনি এগিয়ে এসে

কাছে টেনে নেন: উপনিষদের ভাষায়—যম্ এব এষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—কেবল তারাই তাঁকে পায় যাদের তিনি বরণ করেন কৃপা ক'রে। যুগে যুগে এমনিই হ'য়ে এসেছে, ঠাকুরের লীলা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ওঠা-পড়া হাসি-অশ্রু, আশা নিরাশার ঢেউয়ে ঢেউয়ে। চলুক না। মোটের উপর যখন সাড়ে পনেরো আনা লোক অল্পেতেই খুশী কেন তাদের মিথ্যে অগল্লের—ভুমার—ধমক দেওয়া? কিন্তু এসব কথা নিশান্তবাবু যেন ভুলেও না লিদিয়া দেবীর কানে তোলেন, তুললে ফল ভালো হবে না। তাঁর অনেক পোড় খেতে হবে। প্রতিমা দেবীর কথা আলাদা। তিনি সত্যিই বড় আধার। আপনি ভাগ্যবান্ যে এমন সহধর্মিনী পেয়েছেন।

"যমুনাকে এ-চিঠি দেখাতে পারেন, কেবল বলবেন যে, তাকে আমি ত্যাগ করব না যদি না সে আমাকে ত্যাগ করে। সে সত্যি ভালো মেয়ে—সুশীলা, সুভদ্রা—কিন্তু বড় বেশি সেণ্টিমেণ্টাল। ধর্মের পথে শক্তি আর আনন্দের স্থান পাশাপাশি হ'লেও আবেগ আর উচ্ছ্বাসের মধ্যে তফাৎ আসমান জমিন। ভক্তির আবেগ এ-পথে সহায় হ'লেও উচ্ছ্বাসের লাগাম ক'যে না ধরলে পদে পদে ঠাকুরের 'পরে অভিমান আসবে—নিবেদিতার ভাষায় lion in the path—দুস্তর বাধা। প্রতিমা দেবীকে সে সত্যিই ভালোবাসে, সমীহও করে। খুব ভালো। কারণ তাঁর কথা শুনে চললে সে বিপথে পা দেবে না।

"শেষে আপনাকে বলি—নাম জপটি ছাড়বেন না—গুরুবরণ করুন বা না করুন। গীতায় জপ-যজ্ঞকে প্রাধান্য দিয়েছে কারণ সাধনায় নাম জপে সত্যিই নানা বাধা দূর হয়, নানা বোঝা হাল্কা হ'য়ে আসে। কবে আপনাদের সঙ্গে ফের দেখা হবে বলতে পারি না। তবে এটুকু বলতে পারি যে, আপনাদের সঙ্গে আমার যে-মিতালি গ'ড়ে উঠেছে তার ভিত্তি আত্মিক, যে-রাজ্যে দূরত্বই কাল্পনিক, সামীপ্যই বাস্তব।

আমার জন্যে ভাববেন না। তাঁকে যে চায় সে নিঃস্ব হ'লেও—অনশনে থাকে না ঠাকুরের এ-আশ্বাসও যেমন সত্য তেমনি সত্য তাঁর আশীর্বাণী নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি—যে আন্তরিক মানুষের কল্যাণ চায় তার দুর্গতি হ'তে পারে না। জয় গুরু!

ইতি। আপনাদের স্নেহ-ঋণী মুক্তানন্দ।

॥ উনপঞ্চাশ ॥

মুক্তানন্দজির প্রস্থানের পরে শাস্ত্রীজির ওখানে আলোচনার বৈঠক বসল। প্রতিমা বলল যমুনাকে : "আমাদের কলকাতায় ফিরে যাবার সময় হ'ল। তুমি নার্স-ট্রেনিং সেণ্টারে যখন মন বসাতে পারছ না তখন আমাদের সঙ্গে ফিরে চলো। স্কুলে পড়ুয়া এখন প্রায় পঞ্চাশটি। তুমি গেলে তারা সবাই খুব খুশী হবে।"

লিদিয়া : আমার মনে হয় যমুনার এখনকার মনের অবস্থায় ওর বিষাদ কাটবে বেশি তাড়াতাড়ি যদি ও আমাদের সঙ্গে স্বইজর্লণ্ড ইতালি কায়রো যায়।

প্রতিমা : আমার মনে হয় কেবল ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে কোনো কাজে মন দেওয়া ভালো।

লিদিয়া : এ তো ভাই কোনো সত্যিকার কাজ নয়—শিশু নিয়ে শৌখিন খেলা।

প্রতিমা (আতপ্ত) : খেলা! তুমি আমাদের স্কুল সম্বন্ধে কিছুই না জেনে সরাসর আমাদের কাজকে নামঞ্জুর করছ। এ ভারি অন্যায়।

যমুনা : দিদি, আপনি কেন রাগ করছেন? আমি তো বলেছি আমি আপনার সঙ্গেই ফিরব। গুরুদেবেরও তাই মত।

লিদিয়া (রুষ্ট) : গুরুদেব বোলো না যমুনা। গুরু কাকে বলে আমি জানি। প্যারিসে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনি রীতিমত দীক্ষা নিয়েছিলেন। আমাকে বলেছিলেন যখনই ভেবেচিন্তে কূলকিনারা না পেতেন স্বপ্নে তাঁর গুরু মহারাজ এসে তাঁকে নির্দেশ দিতেন কী করতে হবে। মার্গারিটও প্রায়ই বলত : গুরুবরণ করলে জীবনের ছন্দই বদলে যায়। যমুনাই গুরু গুরু করছে। তিনি ওকে কবে আমল দিয়েছেন শুনি? (নিশান্তকে) তুমি কী বলো? হঠাৎ এমন বোবা হ'য়ে গেলে কী দুঃখে?

নিশান্ত : আমি তো যমুনাকে বলেছি আমার যা মনে হয়। আমি গুরু ফুরু বুঝি না। সাধুকে মানি, কিন্তু গুরু আবার কী বস্তু? আমার পথ

আমাকেই কেটে চলতে হবে। সাধুরা এ-পথের নির্দেশ দিতে পারেন, কিন্তু সে-পথ কাটতেও হবে আমাকে, চলতেও হবে পদব্রজে টলতে টলতে বা হোঁচট খেতে খেতে।

যমুনা (উদ্দীপ্ত) : নিশান্তদা, এ আপনার মত হ'তে পারে, কিন্তু আমার মতন গুরুবাদীদের মত নয়। আমরা বলি—গুরুই চালান আমরা চলি, তিনি যন্ত্রী আমরা শুধু যন্ত্র।

লিদিয়া (তীব্র কণ্ঠে) : তোমার কথা শুনে গা জ্বালা করে যমুনা। তোমার গুরু তো শুনছি আর একটি মহিলাকে সেক্রেটারি ক'রে তোমাকে পথে বসিয়ে প্রস্থান করেছেন। তাঁর কাছে কিছু না পেয়েও তোমার গুরু গুরু ক'রে উজিয়ে উঠতে আত্মসম্মানে বাধে না ?

শ্রীমন্ত : তোমাকে আমি বুদ্ধিমতী মেয়ে ব'লেই এত প্রশংসা ক'রে এসেছি, কিন্তু এ কি সুবুদ্ধির কথা ? মুক্তানন্দজির কাছ থেকে যমুনা কি পেয়েছে না পেয়েছে—পথের নির্দেশ না তীর্থের উদ্দেশ—জানতে পারে কেবল ওর অন্তর, আর জানেন ওর অন্তর্যামী। নিজের পরিচয় পেতেই আমরা পড়ি অথৈ জলে, অথচ পরের স্বরূপের ছক কেটে জ্ঞানী নাম কিনতে চাই।

লিদিয়া : আমরা অসহায় অজ্ঞান অবোধ এই কাঁদুনি গেয়েই ডুবেছে তোমাদের দেশ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—নিজের পায়ে দাঁড়াতে না চেয়ে, আত্মপ্রত্যয় বরণ না ক'রে কি কেউ কখনো বড় হয়েছে ? অথৈ জলের উপমা দিলে। কিন্তু অথৈ জলে প'ড়ে কেউ কি শুধু আর্তনাদ ক'রে কূলের দিশা পেয়েছে ? God helps those who help themselves এ কি একটা কথার কথা মাত্র ?

প্রতিমা : কোন্ দেশ কী অপরাধে ডোবে আর কোন দেশ কী গুণে সরাসর স্বর্গের বন্দরে পৌঁছে যায় এসব অবান্তর প্রসঙ্গ তুলছ কেন লিদিয়া ? প্রশ্ন হচ্ছে এখন যমুনার কী কর্তব্য ? মুক্তানন্দজি বলেন নি কি ওকে কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমাদের স্কুলের কাজে মন বসাতে।

লিদিয়া : তিনি বিচক্ষণ লোক, হাওয়া কোন্ দিকে বইছে খবর নিয়ে তবে রায় দেন। যমুনা যদি আমাদের সঙ্গে যেতে চাইত তাহ'লে তিনি ওকে কলকাতায় ফিরে যেতে বলতেন না এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

প্রতিমা : তুমি ভাই অনেক কিছুই বাজি রেখে বলতে পারো যা আমরা চিঁ চিঁ ক'রে বলতেও ভরসা পাই না। কেবল একটা কথা আমায় বুঝিয়ে

বলবে কি? সাত আট মাস তোমাদের সঙ্গে দেশে দেশে উড়ুক্কু হ'য়ে বড় বড় হোটেলে বিলাসে কাটালে ও কী এমন আশ্চর্য god's help লাভ করবে যা ওকে self-help-এর উদ্দীপনা দেবে? আমার মনে হয়—হোটেল এদেশে যে ভাবে হু হু ক'রে অতিকায় হ'য়ে উঠছে তাতে লোকের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে—আরো এইজন্যে যে, এতে দেহ-সুখের বিলাস যদি থাকে চার আনা, জাঁক-জমকের দেখানেপনা ফেঁপে ওঠে বারো আনা।

লিদিয়া: কিছু মনে করো না ভাই, আমার মনে হয় you have bitten more than you can chew—একসঙ্গে এদেশ ওদেশের সমজদার হ'তে গিয়ে কোনো দেশকেই চিনতে পারো নি। মানুষ যে জগতকে এত কাছে টেনে রাখতে পারছে তার একটি কারণ tourism-এর মানবৃদ্ধি। সেদিন পড়ছিলাম একটি বইয়ে যে, ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক 'টুরিস্‌মে' ২১৭০ কোটি ডলার খরচ হয়েছে সব জড়িয়ে। লক্ষ লক্ষ পর্যটকের চলাচলের জন্যেই একদেশের ভাবধারার সঙ্গে আজ অন্য দেশের ভাবধারা গলাগলি করতে পারছে। অগুন্তি হোটেলের প্রতিষ্ঠা না হ'লে এঁরা থাকতেন কোথায় শুনি? নিশান্তর কাছে শুনেছি ভারতবর্ষে হাজার হাজার পর্যটক এখানে ওখানে গাছতলায় কোনোমতে রাত কাটান। একি একটা সুভদ্র জীবন বলো তুমি? নানা হোটেলে বিলাসের বাড়াবাড়ি হয় এ আমিও মানি। কিন্তু যে-কোনো প্রচেষ্টার অপব্যবহার হ'তে পারে। ডাক্তার বা সার্জনদের আশ্চর্য কৃতিত্বের কথা আজ সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন। কোনো কোনো সার্জন ভুল ক'রে বেশি কাটাকুটি ক'রে রোগীর দেহদুঃখ না কমিয়ে বাড়িয়ে দেন। কিন্তু তাই ব'লে কি বলবে সার্জারি-প্রতিভা একটি আশ্চর্য প্রতিভা নয়, বা ডাক্তারেরা ভুল করেন ব'লে বলবে তাঁরা মানুষের দেহ দুঃখ কমান নি লক্ষ লক্ষ হাসপাতালে নার্সিং হোমে?

শ্রীমন্ত: কিছু মনে কোরো না লিদিয়া, কিন্তু তুমি কী সব অবান্তর প্রসঙ্গ টেনে আনলে? সাধুরাও স্বীকার করেন যে ধন্বন্তরি দেবভিষক আর মানুষ ডাক্তার তাঁর প্রতিনিধি। কিন্তু কথা হচ্ছিল যমুনার পক্ষে এখন দেশে ফিরে শুভ কর্মে যোগ দেওয়া ভালো, না দেশে দেশে হৈ হৈ ক'রে 'সাইট-সীইং' করা ভালো। তুমি টিপ্পনী কাটলে—শিশুদের শিক্ষা দেওয়া কোনো সীরিয়স কাজ নয়, শৌখিন খেলা মাত্র। কিন্তু মনে রেখো—মুক্তানন্দজি ওকে এই পথের পথিক হ'তেই বলেছিলেন।

লিদিয়া : কিন্তু নানাদেশে যায় কি মানুষ শুধু সাইট-সীইং-এর সস্তা প্রসাদ পেতে ?

শ্রীমন্ত : বেশির ভাগ টুরিস্ট কি এই প্রসাদের লোভেই চরকিবাজির মতন ঘুরে মরেন না ? তাঁরা এখানে একদিন ওখানে দুদিন সেখানে তিন্‌দিন্‌ এইভাবে প্রোগ্রাম ক'রে নানা ঐতিহাসিক কীর্তিস্তম্ভ দেখে কতটা সত্যিকার ঐতিহাসিক জ্ঞানার্জন করেন বলতে পারো ? এই মুক্তানন্দজির দৃষ্টান্তই নেও না কেন। লণ্ডনে এসে দুচারদিন মাত্র তাঁর সঙ্গে এ ও তা আলোচনা ক'রে তাঁর মহত্ত্বের, বৈরাগ্যের, সত্যনিষ্ঠার, জীবন সাধনার কতটুকু পরিচয় তুমি পেয়েছো ? অথচ একটু আগে বাঁকা হেসে বললে তিনি বিচক্ষণ সুবিধাবাদী—opportunist—হাওয়া কোন্ দিকে বইছে খবর নিয়ে তবে রায় দেন।

লিদিয়া : আমি হয়ত তাঁকে একটু ভুল বুঝেছি। কিন্তু মন আমার কেমন যেন বেঁকে বসে যখন তোমরা কথায় কথায় তাঁর প্রতি মতকে অকাট্য নজির হিসেবে মেনে নাও।

শ্রীমন্ত : কিন্তু যে অজ্ঞ তার পক্ষে নিজের কুবুদ্ধিকে মেনে কুযুক্তি দিয়ে দাঁড় করাতে চাওয়ার চেয়ে যাঁরা প্রাজ্ঞ তাঁদের সুবুদ্ধিকে মেনে চলা, কি বেশি নিরাপদ নয় ? তাছাড়া নজিরে এত আপত্তিই বা কেন ? আমরা যা কিছু শিখি তার বেশির ভাগ কি জ্ঞানীদের বিধান মেনেই শিখি না ? একই উকিল যে-কোনো বিধানকে শুভ বা অশুভ ব'লে প্রমাণ করতে পারেন একথা কি প্রতি জজসাহেব জানেন না ? কিন্তু আমরা কথার ঢেউয়ে ঢেউয়ে এসে পড়েছি বাগাড়ম্বরেরি আথান্তরে। তাই এই সহজ কথাটা যমুনা বুঝলেও তোমাকে বোঝাতে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে যে, ওর এখন সব আগে দরকার সুস্থির হওয়া, আর মনের স্থৈর্যের একটি মস্ত সহায় শুভকর্ম, হৈ চৈ নয়। তাই—ফের নজির দিচ্ছি, অপরাধ নিও না—ঠাকুর গীতায় কর্মযোগের গুণগানে তানালাপ করেছেন ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কারে।

নিশান্ত : রোসো রোসো তিনি জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগেরও গুণগান কিছু কম করেন নি।

শ্রীমন্ত : কিন্তু সর্বত্রই ফিরে এসেছেন কর্মযোগেই যেমন ওস্তাদের কোনো রাগের আলাপে ফিরে ফিরে আসেন তার বাদী সুরে। শাস্ত্রীজি তাই বলেন যে গীতায় নানাযোগের ব্যাখ্যা থাকলেও তাকে কর্মযোগেরই ব্যাকরণ বলা চলে।

প্রতিমা : শুধু তাই নয়, কর্মযোগ একটি মহৎ আদর্শ। এ-জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কীর্তিকলাপ, যশমান, বিলাস-বিশ্রাম এসবেরি স্থান আছে, কিন্তু কোনো আদর্শ সামনে না থাকলে এসবের মধ্যে দিয়ে এমন কিছু পাওয়া যায় না যাতে মন পুরোপুরি ভরে ওঠে।

লিদিয়া : আমি কি এই সস্তা বিলাস সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ধনমানেরি পসারী বলতে চাও? আমাকে যে অসহ্য দুঃখ দৈন্যদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তোমাদের মধ্যে কে তার খবর রাখে? "আদর্শ আদর্শ" ব'লে টঙ্কার দিয়ে তোমরা আমাকে দাঁড় করালে বিলাসিনী! (দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে)

প্রতিমা : কাঁদে না বোন। বিশ্বাস করো—তোমাকে নিশানা ক'রে আমি কিছু বলি নি, সত্যি বলছি। (লিদিয়াকে আলিঙ্গন ক'রে) তবু যখন তোমার মনে অজান্তে আঘাত দিয়েছি তখন তোমার কাছে ঘাট মানছি। যমুনা যদি তোমাদের সঙ্গিনী হয়ে কয়েক মাস য়ুরোপে ঘুরতে চায় যাক—আমি কিছু মনে করব না কথা দিচ্ছি। যমুনা! নির্ভয়ে বলো।

যমুনা (অনিশ্চিত স্বরে) : কী বলব দিদি! আমার মাথার মধ্যে কেমন যেন ফাঁকা লাগছে। (সবাই নিশ্চুপ) আচ্ছা, আমি·· আমি ওদের সঙ্গেই যাব, কলকাতায় ফিরে আপনার সঙ্গে কাজ করব।

শ্রীমন্ত (জোর ক'রে হেসে) : All's well that ends well.

॥ পঞ্চাশ ॥

নিশান্তর আরো এক সপ্তাহ লণ্ডনে থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু লিদিয়া বায়না ধরল স্বইজর্লণ্ড-প্রয়াণের। নিশান্ত জনান্তিকে বলল শ্রীমন্তকে : "নিরুপায় ভাই। লিদিয়ার সব ভালো, কেবল এই এক মহাদোষ যা একবার ধরে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না, কচ্ছপের কামড়ের ম'ত।" যমুনা যাবার আগে প্রতিমাকে প্রণাম ক'রে বলল : "মনে রাখবেন দিদি।"

প্রতিমা জবাব দিল না। শ্রীমন্ত বলল : আমরাও দুচারদিনের মধ্যে রওনা হব, তুমি মুক্তানন্দজির যদি কোনো খবর না পাও তো লিখে জানিও।"

লিদিয়া বলল : "নিশ্চয় জানাবে।"

মার্থা সব শুনে হেসে বলল : "লিদিয়া চালাক মেয়ে শুধু চলতে নয় চালাতেও জানে। যমুনাকে কেমন হাত করেছে!

প্রতিমা : আমি অবাক হ'য়ে গিয়েছি মা! যমুনা কিনা শেষে আমাদের ছেড়ে—কিন্তু থাক এ-আলোচনা।

শ্রীমন্ত : থাকবে কেন? প্রতিমা না থাকলে যমুনাকে দেখত কে?

শাস্ত্রীজি : অমন কথা বলে না। দেখেন সেই একজনই—যাঁকে কেউ দেখতে পায় না। মানুষ যতই বড়াই করুক না কেন, আসলে আমরা সবাই তাঁর হুকুম বরদার।

শ্রীমন্ত : মানি। কিন্তু প্রতিমার দাবিও না মেনে পারি না: যে, তিনি ওকেই হুকুম দিয়েছিলেন যমুনার ভার নিতে।

শাস্ত্রীজি : এ অনিত্য সংসারে কে কার ভার নেয় শ্রীমন্ত? তোমরা দুজনেই সব আগে ধর্মার্থী, তাই তোমাদের মনে রাখাই চাই একটি কথা : যে আমরা নিমিত্তমাত্র। কেবল অহঙ্কারে অন্ধ মানুষই দেখতে পায় না—সেই কবি নিশিকান্তের গানে আছে না :

আমি বাজাই না বীণা
আমি বাজাই না বাঁশি,
তারি রাগিনীর দোলায়
দোলে মোর সুরের রাশি।
সে চলে, তাই তো চলি,
সে বলে, তাইতো বলি,
অমরার বিকাশবাণী
মরণের মঞ্জরীতে।

প্রতিমা (উদ্দীপ্ত): বাবা, তুমি ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া সুরু করলে! তোমার কাছেই গীতার পাঠ নিয়ে শিখেছি যে, "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মাই" নিজেকে কর্তা মনে করে। কিন্তু এ-ধরণের মহাকাব্য থেকে যতই কেন না জ্ঞানের আলো পাই, চোখের সামনে যা ঘ'টে গেল তা এতই অদ্ভুত (জোর ক'রে হেসে)—ভাবো তো বাবা, যমুনা বরাবর আমাদের সঙ্গেই তো যেতে চেয়েছিল, হঠাৎ মত বদলালো কেন?

শাস্ত্রীজি (প্রতিমার পিঠে হাত বুলিয়ে): ঠিক কী কারণে যে কে কবে কোন্ দিকে মোড় নেয় কেমন ক'রে বলব মা? তবে এক্ষেত্রে

হয়ত এইটুকু বলা যায় যে, তোমার ওখানে ও তোমার হুকুমে চলে মাত্র, লিদিয়ার কৃপায় ওর পদবৃদ্ধি হ'ল—ও রাতারাতি হ'য়ে দাঁড়াল তার সখীসহচরী।

প্রতিমা: কিন্তু মুক্তানন্দজি কি ওকে আমাদের জিম্মায় রেখে যান নি? বলেন নি কলকাতায় গিয়ে কাজে মন বসাতে?

শাস্ত্রীজি: মা, মানুষের মন বিচিত্র। যমুনা মুক্তানন্দজির সঙ্গেই যেতে চেয়েছিল শুধু তাঁর শিষ্যা হ'য়ে না, সেক্রেটারি হ'য়ে। তিনি ওকে আদৌ আমলই দিলেন না। কে বলবে যে ওর এজন্যে কোনো ক্ষোভ জ'মে ওঠেনি?

শ্রীমন্ত: সবই বুঝলাম। কিন্তু ও তো তাঁকেই গুরুবরণ করেছিল?

শাস্ত্রীজি: এ-বিষয়ে আমার কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। তবে দুতিনজন গুরুবাদী সাধকের মুখে শুনেছি যে, গুরুকে বরণ করার আনন্দ গভীর হ'লেও সময়ে সময়ে তাঁকে অমান্য করবার রোখ ধর্মার্থীকে বিপথে চালায় কুযুক্তিতে কালোকেই শাদা বুঝিয়ে। তাই যমুনার মনে এমন বিদ্রোহও মাথা চাড়া দিয়ে উঠে থাকতে পারে যে, গুরু যখন নির্মম তখন আমিও শোধ তুলব পতাকা উড়িয়ে যে, আমি স্বাধীন। এ-বিদ্রোহ স্থায়ী হয় না তাদের ক্ষেত্রে যারা নির্ভেজাল গুরুবাদী। কিন্তু যারা স্বভাবে গুরুবাদী নয় তাদের মনে অভিমানের কুয়াশা জমাট হ'য়ে উঠতে পারে। আমার এক বন্ধু এই ধরণের ক্ষোভকে আমল দিয়ে গুরুর কথা না শুনে যোগ ছেড়ে দেশোদ্ধার করতে ছুটেছিলেন, ফলে তাঁর কর্মযোগ হয়েছিল শুধু কর্মভোগ। কেবল ভগবানের চালচলনই দুর্বোধ্য নয় বাবা, মানুষের চরিত্রও অসঙ্গতিতে ভরা। (প্রতিমাকে) তাই আমি উপনিষদের একটি প্রার্থনায় মনে প্রাণে সাড়া দিই মা: "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"—তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির আজ্ঞাবাহী করুন—যে-শুভবুদ্ধি ঈশ্বরমুখী, মুক্তিমুখী, ভক্তিমুখী, প্রণতিমুখী,—অহংমুখী স্বার্থমুখী লোভমুখী নয়।

প্রতিমা: কিন্তু বাবা, লিদিয়া বিলাসিনী—আদর্শ বোঝে না।

শাস্ত্রীজি: মা, দোষে গুণে মানুষ। তোমারি মুখে শুনেছি—লিদিয়া ধর্মশীলা মার্গারিটের প্রিয়সখী। যে কোনো আদর্শেরই ধার ধারে না সে এমন পুণ্যবতীর অন্তরঙ্গ হ'তে পারে না। তবে আমার মনে হয় অভাব অনটন থেকে অঢেল সুখসম্পদের কোলে এসে-পড়ার দরুণ ওর অসহিষ্ণুতা ও আত্মাভিমান হয়ত একটু বেশি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে থাকবে। আর শুধু

ধনসম্পদই তো নয়, ও অসামান্য সুন্দরী। মা, বিশেষ ক'রে রূপসী মেয়েরা হাজার সজাগ থাকলেও রূপগর্বকে নামঞ্জুর ক'রে গুণ বা কৃতিত্বের কাছে মাথা নোয়াতে পারো না। পুরুষের আত্মবোধের পথে ঠিক এমনিই বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় প্রতিষ্ঠার অভিমান, যশের তৃষ্ণা, কীর্তির গর্ব। দেবদ্রোহী অহং শুধু পরাক্রান্ত নয়—সুচতুর, তাই জানে কাকে কোন্ বাঁকে বিপথে চালানো যায়। আবার মনে হয় লিদিয়া ধ'রে নিয়েছিল যে, বিলাসের হাতছানিতে যমুনা ওরই তাঁবে থাকবে। কিন্তু পরে যখন দেখল তুমিই ওকে পটালে, তখন চেয়ে-না-পাওয়ার ক্ষোভ ওকে পেয়ে বসল, ঈর্ষা ওকে অশান্ত ক'রে তুলল। নিষিদ্ধ ফলের লোভ দমন করা সহজ নয়—লিদিয়াকে বিচার করার সময় এই কথাটি মনে রেখো।

প্রতিমা (হঠাৎ): বাবা, আমি তোমার নির্বোধ মেয়ে তাই চেয়েছিলাম নিবেদিতার পতাকা উড়িয়ে চলতে। কলকাতায় গিয়ে স্কুল তুলে দেব। কেন মিথ্যে এ-বিড়ম্বনা?

মার্থা (মেয়ের মাথা বুকে টেনে নিয়ে): তোমার মতন মেয়ের মুখে মা এমন কথা মানায় না। আর কেউ জানুক বা না জানুক আমি তো জানি এক ডজন লিদিয়ার রূপ হাবভাব অর্থ জুড়লেও তুমি থাকবে অনন্যা। শোনো মাণিক, ওঁর বিজ্ঞ কথায় কান দিও না। উনি কেবলই বেশি দূর দেখতে চেয়ে যা সকলেরই চোখে পড়ে দেখতে পান না। লিদিয়া কী এমন ক্লিওপেট্রা শুনি? আর মেয়েদের রূপ তো গোলাপ ফুলের লালিমা—কদিন থাকে? একটু অসুখ, একটু দুশ্চিন্তা, একটু অনটন—বাস্ অমনি সব ফর্সা। মনে হয় কে যেন মুখ থেকে রূপের মুখোস ছিনিয়ে নিল। গুণ ধৈর্য বুদ্ধি চরিত্র সাহস পবিত্রতা—কী নেই তোমার? আর রূপেও তোমার লিদিয়ার সস্তা চটক না থাকতে পারে কিন্তু এমন লাবণ্য আছে যা শুধু বিরল নয়··· (আর্দ্র কণ্ঠে) তোমার মতন মেয়ের মা হ'য়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি, সত্যি বলছি মা। তুমি যে বড় সেই বড়ই থাকবে। ওঁর কথায় তুমি কান দিও না, আর ঐ লিদিয়াকে আমল দিও না, দিও না, দিও না।

প্রতিমা মার্থার কোলে মুখ ডুবিয়ে নীরব কান্না কাঁদে। শাস্ত্রীজি পাশে ব'সে তার মাথায় হাত রেখে বললেন: "আমিও এখানে তোমার মা-র সঙ্গে একমত মা। তোমার মতন মেয়ে পাওয়ার সৌভাগ্য ক-জন বাপের হয় বলো তো? বলতে কি মা, বিলেতে যখন প্রথম আসি তখন আমি মেয়েদের

রূপলাবণ্যকেই সবচেয়ে বড় মনে ক'রে ভাবতাম তারা রূপবতী গুণবতী হ'তে পারে কিন্তু শক্তিময়ী নয়। যেদিন তোমার মা আমাকে বিবাহ করলেন আত্মীয় স্বজনের নিষ্ঠুর বয়কট উপেক্ষা ক'রে সেদিন আমি প্রথম চম্‌কে উঠে টের পেয়েছিলাম যে আমাদের অনেক বিজ্ঞতাই অজ্ঞতার পোষাকী নাম, আর সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলাম যে, পৌরুষের মানে আত্মম্ভরী মর্দানির চলতি জাঁকজমক নয়, ধীর স্থির অকুতোভয় হ'তে পারে। তোমায় মা-ই প্রথম আমার চোখ খুলে দেন। তারপর এলে তুমি—বিলাসের পরিবেশে প্রায় সন্ন্যাসিনীর আদর্শকে বরণ ক'রে। নিবেদিতা তোমার মন টেনেছিলেন এইজন্যেই যে তাঁর সন্ন্যাসিনী হওয়ার মূলে যে-অটল দুরাশার আলো জ্বলেছিল তোমার নিবেদিতার প্রতি ভক্তির অন্তরেও সেই দুরাশাই তোমাকে ভারতবর্ষের দিকে টেনেছিল। নৈলে কি তুমি আমাদের বাহ্য তামসিকতাকে পাস কাটিয়ে সাত্ত্বিকতাকে লালন করতে পারতে? আমি শুধু তোমাকে শান্ত করতে চেয়েই লিদিয়ার ওকালতি করেছিলাম—যাতে ক'রে তুমি ক্ষোভের গ্লানিকে বরখাস্ত করতে পারো। তাই আমি তোমার মা-র কন্যাস্তবের দোয়ার দিয়ে গাইতে চাই: পুরুষ যে-শক্তির রাজপ্রাসাদ গড়ে তার ভিত্তি গড়ে মেয়েদেরই অভয় প্রেম ও ধারণশক্তি।

॥ একান্ন ॥

প্রতিমাকে শান্ত ক'রে দিনকয়েক বাদে শ্রীমন্ত কলকাতায় ফিরল। স্কুলে শিশুরাও ফের এসে পড়াশুনো খেলাধুলোয় যোগ দিল। লীলাবতী নামে একটি তরুণী গ্রাজুয়েট শিক্ষয়িত্রীর কাজে বহাল হ'তে প্রতিমা একটু নামজপের দিকে মন দেবার ফুর্সৎ পেল। কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও তার মনে সময়ে সময়ে একটা আবছা ক্ষোভ গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠে: দুদিনে লিদিয়া যমুনাকে হাত করল কী গুণে? রূপে নয়, কারণ মেয়েরা মেয়েদের রূপে মজে না সবাই জানে। তবে?...

প্রতিমা অশান্ত হ'য়ে মার্থাকে সব কথা খুলে লিখল। মার্থা আদরিনী মেয়ের চিঠি পেয়েই উড়ে এসে স্কুলের কাজে যোগ দিলেন। বললেন শাস্ত্রীজি মাস দুই বাদে অবসর গ্রহণ ক'রে কলকাতায়ই কায়েম হ'য়ে বসবেন। প্রতিমা

উত্তরে লিখল : "না বাবা, গ্রীষ্মকালে তুমি এসো না। বেশি গরম তোমার সয় না—নিতে হবে হিমালয়ের আশ্রয়। তুমি শীতকালেই এসো। মা এসেছেন তাতে আমার বোঝা অনেকটা হাল্কা হয়েছে বলাই বাহুল্য। এই ঝোঁকানো রোখানো মেয়েটার জন্যে তোমাদের কতই না ভুগতে হ'ল। কিন্তু দেখো, আমি ক্রমে এমন শান্ত সমাহিত হব যে তোমাদের চম্‌কে উঠে বলতে হবে, এ কী! এ যে প্রায় স্থিতপ্রজ্ঞের কাছাকাছি! তবে বাবা, তোমার কাছে গীতা ফের পড়ব ভাবতে আমার মনের সব গুমট কেটে যায়।"

শাস্ত্রীজি উত্তরে লিখলেন ; "মা, জানি—মন যাকে স্নেহ ক'রে এসেছে তার কাছ থেকে যখন বড়রকম ঘা খায় তখন তাকে বোঝাতে বেগ পেতে হয় যে, কালাতিপাতে দুঃখের কান্নালোকে ফের সুখের আসর বসবে। তোমাকে তো বলেছি : 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।' তবু যতদিন মানুষ নিয়তিচক্রের নিচে থেকে দুঃখ পাবে ততদিন সুখকে তার মনে হবেই হবে হয় আকাশকুসুম নয় এতই সুদূর যে নাগালের বাইরে' অর্থাৎ থেকেও নেই। আর এইখানেই আসে সাধনার কথা। কোনো একটা পরীক্ষিত সাধনার পথ না ধরলে দুঃখ-নিবৃত্তি হ'তেই পারে না। কিন্তু মা, যে তোমার মতন স্বভাবে ধর্মশীলা পুণ্যবতী তার মনে শান্তি নামবেই নামবে কর্মযোগের সঙ্গে কোনো সাধনায় মন বসালে। তাই তুমি মুক্তানন্দজিকে লেখো সানফ্রান্সিকোতে। তিনি জীবন্মুক্ত কি না জানি না, তবে উচ্চকোটির সাধক এ নিশ্চয়। (কেবল তাঁর বেলায়ও মনে রেখো, তাকে অনেক পোড় খেয়ে তবে জীবনের কাঁটাবনে এগুতে হয়েছে।) তিনি আমাকে লিখেছেন একটি জর্মন যুবকের কথা যে অশান্ত হ'য়ে তাঁর কাছে মন্ত্র নিয়ে শুধু যে অকূলপাথারে কূলের দিশা পেয়েছে তাই নয়, গভীর শান্তির আভাষ পেয়েছে। আমিও মা, একদা পেয়েছিলাম এ-শান্তির সুধাস্বাদ। কিন্তু আমার মন কর্মযোগকেই বরণ করল শান্তির লোককে বরখাস্ত ক'রে। এ-দ্বন্দ্বও অনেকেরই জীবনে আসে। হয়ত তোমার এক নবজন্মের লগ্ন আসন্ন, কে বলতে পারে? তাই তুমি পত্রপাঠ মুক্তানন্দজিকে সব কথা খুলে লেখো। চাও তো উড়ে যাও না সানফ্রান্সিস্কো—আজকাল তো মাত্র দুদিন লাগে আমেরিকায় পৌঁছতে। তাছাড়া এই সূত্রে আমেরিকার বৈশ্য সভ্যতার সঙ্গেও একটু সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়া মন্দ কি? বৈশ্য সভ্যতার মধ্যে ভালোও কিছু আছেই আছে নৈলে সে-সভ্যতা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ত না মুখ্যত আমেরিকান ছন্দে সুরে। যমুনা হয়ত একটা উপলক্ষ মাত্র, নৈলে

সে তোমার মতন সাত্ত্বিক মেয়েকে এতটা বিচলিত করতে পারত না। জানি না আমার নিদান নির্ভুল কি না। তবে ভুল হ'লে মুক্তানন্দজি বলতে পারবেন মনে হয়। ইতি।"

॥ বাহান্ন ॥

শ্রীমন্ত উল্লসিত হয়ে উঠল, বলল: "এই এই এই পন্থা। চলো, ফের উড়ন্ত হওয়া যাক।"

প্রতিমা: কিন্তু আমি মুক্তানন্দজিকে গুরুবরণ করতে চাই না—বিশেষ যমুনার দশা দেখার পর।

শ্রীমন্ত: কী পাগলামি করছ? গুরুবরণের কথা কে বলেছে? আর কোথায় যমুনা—এক সেন্টিমেন্টাল স্থূললিতা, আর কোথায় তুমি, সাক্ষাৎ—

প্রতিমা: রাখো রাখো, ঢের হয়েছে। আমার সব অহঙ্কার চুরমার হ'য়ে গেছে, আমি নিজেকে আর খুঁজে পাচ্ছি না।

শ্রীমন্ত: ঐ ঐ, সামাল! যমুনার ছোঁয়াচ লেগেছে। সাধে কি ঠাকুর তাকে সরিয়ে দিয়েছেন। মহীয়সী, ধন্যবাদ দাও, ধন্যবাদ দাও লিদিয়াকে।

প্রতিমা: কী বলছ? স্কুল তুলে দিতে চাও নাকি?

শ্রীমন্ত: স্কুল তুলে দেবে কী দুঃখে? তোমার মা এসে পড়েছেন, লীলাও শিখেছে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি। আমরা মাসখানেক বাদে ফিরে এসে ফের খেই ধরব। সব তর তর ক'রে চলবে।

প্রতিমা মার্থাকে জিজ্ঞাসা করল: কী করা উচিত। মার্থা সব শুনে বললেন: "আমার দুটি বক্তব্য আছে মা। স্কুলের জন্যে ভাবতে হবে না তোমাদের। কিন্তু আমি যে ভাবনায় পড়েছি তোমার জন্যে। মুক্তানন্দজিকে নিয়ে ফের টানাটানি করা কেন?

প্রতিমা (মার্থার বুকে মাথা রেখে): মা ভৈঃ, মা। আমি কোনো আনন্দজির পায়েই দাসখৎ লিখে দেব না। তবে তাঁর উপদেশ থেকে হয়ত কিছু আলো পাব। তিনি বিবক্ষা লোক তো।

মার্থা: আচ্ছা যাও। কিন্তু (তর্জনী নেড়ে) মনে রেখো আমাকে কথা দিয়েছ।

॥ তিপান্ন ॥

কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর : আকাশ পথের পথিক হওয়ার দুদিন আগে প্রতিমার বুকে এমন অস্বস্তি জেগে উঠল যে শয্যা নিতে হ'ল।

মুখে ওর কালো ছায়া। আহারে অরুচি। অথচ দুজন হার্ট-স্পেশালিস্ট ইলেকট্রো-কার্ডিয়োগ্রাফাদি নানাবিধ পরীক্ষা ক'রেও কোনো কূল-কিনারা পেলেন না। প্রতিমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল এক নার্সিং-হোম-এ। কিন্তু তারাও কোনো হদিশ পেল না এ-অজানা ব্যাধির। দুদিন বাদে প্রতিমা ধরল নার্সিং হোমে আর থাকবে না—বিশেষ যখন তিন চার জন ডাক্তার মাথা নেড়ে কবুল 'করছেন : কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। হাঁপানি অথচ হাঁপানি নয়!

স্বগৃহে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তানন্দজির এক চিঠি শ্রীমন্তকে লেখা। খামটা হাতে ক'রেই প্রতিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : "বুকের কষ্ট যেন একটু কমেছে।" তারপর সবাই মিলে পড়ে সাগ্রহে :

"প্রিয়বরেষু

স্টুয়ার্ট হোটেল
সানফ্রান্সিস্কো

লণ্ডন থেকে আমি হঠাৎ চ'লে এলাম কারণ···কিন্তু থাক সে-অবান্তরের অবতারণা। শুধু জেনে রাখুন : আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম—যেন দিব্য-নেত্রে—যে, আমিই আপনাদের শান্তিঘেরা পরিবারে অশান্তির ধূমকেতু হ'য়ে এসেছি—যমুনা উপলক্ষ মাত্র। ব'লে ক'য়ে প্রস্থান করলে ও হয়ত ফের কান্নাকাটি জুড়ে দিত বা মূর্ছা যেত, ফলে আপনাদের অশান্তি বেড়েই চলত। ইতিপূর্বে গুরুদেব আমাকে একটি পত্রে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন—যদিও কারুর নাম না ক'রে। কিন্তু লণ্ডনে নানা সভায় তথা আমার ডেরায় বাগাড়ম্বর ক'রে আত্মপ্রসাদের কুয়াশায় আমার দৃষ্টি কিছুটা ঝাপসা হ'য়ে এসেছিল ব'লে আমি দেখতে পাই নি—বা দেখেও দেখতে চাইনি, যা হয়ত আপনাদেরও চোখে প'ড়ে থাকবে—যে, আমি সম্প্রতি কর্ম-সাধনায় যতটা মন দিয়েছিলাম ধ্যান-সাধনায় ততটা একাগ্র হ'তে পারি নি। যাদের ঠাকুর বাঁশির সুরে ডাকেন নি তাদের নানা ছোটখাটো ভুলভ্রান্তির ফল নিদারুণ হ'য়ে দাঁড়ায় না

যেমন দাঁড়ায় তাদের পদস্খলন যারা তাঁর ডাক শুনেও সাবধানে চলে না বিবেকপন্থী হ'য়ে। বাঁশির ডাক শোনে তারাই যাদের তিনি করুণা করেন। কিন্তু করুণা পাওয়ার দায়িত্ব আছে। তাই করুণা পেয়েও চ্যুতি হ'লে তার কর্মফলও ভুগতেই হবে—যার একটা প্রকাশ দেহে নানা ব্যাধির উৎপাত। এ-ধরণের পৌরানিক (?) কথা শুনে আপনি হয়ত মৃদু হেসে বলবেন: দি ওল্ড্ স্টোরি—দৈত্য দানা ভূত প্রেতের ছায়াবিভীষিকা জমিয়ে আতঙ্কের মেঘ গ'ড়ে তোলা, যোগ ধর্ম তন্ত্র-মন্ত্র তো মানুষকে এইভাবে ভয় দেখিয়েই এসেছে আবহমানকাল, এ আর নতুন কথা কি? কিন্তু সনাতন ব'লে একটা বিশেষণ আছে যে সদাসত্য—সার্বজনীন, সার্বকালিক। অন্য ভাষায়, সত্যকে মঞ্জুর করতে হ'লে যে তার মধ্যে বিদ্যুদ্দামের আমদানি করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমার বক্তব্যটিকে সুবোধ্য করার জন্যে একটা দৃষ্টান্ত দেব। বস্তুত সেই উদ্দেশ্যেই এ-পত্র লিখছি। তবে বলা রইল: আপনার মনে আমার কথা দাগ না কাটলে প্রতিমা দেবীকে বলবেন না। আমি ভেবেছিলাম লণ্ডনে আপনাকে চুপি চুপি ব'লে আসব যা লিখতে যাচ্ছি। কিন্তু দুতিনবার টেলিফোন ক'রেও আপনাকে ধরতে পারলাম না, আমার হাতে সময়ও ছিল অল্প। সর্বোপরি, বাঁশি তো শুধু ডাকে না, মুখ ফিরিয়েও দেয়—যেমন আমার দিয়েছিল। তাই ক্রমাগত বলা সুরু করল: "চম্পট দাও—এক্ষনি।"

ব্যাপারটা কী একটু খুলে বলি।

আমি লণ্ডনে প্রতিমা দেবীর মাথার উপরে একটা কালো ছায়া দেখেছিলাম। ভাগবতে বলেছে: "ছায়া স্থ মৃত্যুঃ" ছায়াই মরণের নকিব, warning—আর এ-ছায়া জমাট বেঁধেছিল যমুনারই দৌলতে, যদিও তার অজান্তে।

আপনারা পুরোপুরি না হ'লেও মুখ্যত বুদ্ধিবাদীই বলব, এদেশের বিজ্ঞান যার নিশান উড়িয়েছে সবজান্তা ঢঙে। তাই হয়ত বলবেন: "ধেৎ! এক অতি ঘরোয়া নগণ্যার মাধ্যমে কেমন ক'রে এতবড় তোলপাড় ফুলে উঠতে পারে?' আপনার মুখে শুনেছি—আপনার পিতৃদেব ভাগবতের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাই সম্ভবত তাঁর মুখে শুনেছেন যোগারূঢ় রাজা ভরত একটি হরিণশিশুর মায়ায় প'ড়ে যোগভ্রষ্ট হয়েছিলেন যার ফলে তাঁকে আবার জন্মাতে হয়। আমার কাছে এ-কাহিনীটি কোনোদিনই রূপকথা মনে নি, কারণ আমি

বারবার দেখেছি—যাঁরা দুর্গম তীর্থপথের পথিক সামান্য চ্যুতিও তাঁদের পথচলায় ঘোর বিপর্যয় আনে। যদুবাবু বিষয়ী, দোষেগুণে মানুষ, চলেন আত্মাদরের খুশখেয়ালে। তিনি একটি রক্ষিতাকে আমল দিলে তাঁর হাজারো চ্যুতির মধ্যে একটি বাড়ে মাত্র—বোঝার উপর শাকের আঁটি, কিন্তু যোগপন্থী মধুবাবু লায়েক যদুবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করলে যোগভ্রষ্ট হবেনই হবেন—যতই কেন না তাঁর যোগবিভূতির ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স থাকুক। আমার গুরুদেব একদা এই মধুবাবুকে নিশানা ক'রে আবৃত্তি করেছিলেন একটি শ্লোক :

কাঁদি সংসারপথে পদস্খলনে ক্ষণিক নয়নজলে,
সেই একই চ্যুতি হায় যোগপথে হয় পর্বতবাধা পলে।

এ যে থিওরি নয়, অতি প্রত্যক্ষ সত্য তা কি সঘনে ঘোষণা করার দরকার আছে ? ভেবে দেখুন, যমুনার প্রতি প্রতিমা দেবীর আসক্তির মাধ্যমে কতরকম অশান্তি মনকষাকষি সংঘর্ষ হানা দিয়েছে দিনের পর দিন—যেমন নৌকোর ফাটল দিয়ে দুর্নিরোধ্য জল হানা দেয়। সবচেয়ে আফশোষের বিষয়—আপনাদের মতন দুই স্নেহময় স্নেহময়ীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের ভিৎ টলমল ক'রে উঠেছে দুই প্রিয় সখীর মধ্যে রেষারেষি ফেঁপে ওঠার ফলে। বলেছি, যমুনা মন্দমতি মেয়ে নয়, গড়পড়তা সেন্টিমেন্টাল মেয়ে, যেমন সাড়ে পনেরো আনা কুমারীরা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি কথা ভুললে চলবে না : এক যমুনা স্বভাবে ষোলো আনা গৃহিনী ; দুই, প্রতিমাদেবী স্বভাবে যোগিনী, তাঁর আদর্শবাদের উৎস তাঁর অন্তরের যোগানি—তাই তিনি কৈশোরেই শুনেছিলেন নিবেদিতার বহ্নি-বাঁশি। যে-মেয়ে জেগে উঠেছে তার পথ স্বপ্নচারণীর পথ নয়। কিন্তু অত্যধিক স্নেহ স্বভাবে ভ্রান্তিবিলাসী, তাই প্রতিমাদেবী চাইলেন সামান্যাকে বরেণ্যার স্তরে টেনে তুলতে, ইংরাজী উপমায়—রাউণ্ড পেগকে জোর ক'রে বসাতে চাইলেন স্কোয়্যার হোলে। ফল যা হবার—দুই আর দুয়ে চার : অমিল, দুর্ঘটনা, আধি ব্যাধি···

আমি প্রার্থনা করব যাতে যমুনা নিশান্তবাবুর housekeeper হয় লিদিয়া দেবীর সহকর্মিনী হ'য়ে। লিদিয়া দেবীর নানা গুণ আছে—কিন্তু তিনি শুধু সংসারিণী নন তার উপরে বিলাসিনী সহজ পথের পথিক। তাই তাঁর সংসারের লাগাম দেখতে দেখতে যমুনারই হাতে আসবে। সেই ওর যথার্থ

পরিবেশ। আশা ক'র এরপর আপনারা ওকে আর আপনাদের আদর্শে উদ্বোধিত করবার পণ্ডশ্রম করবেন না।

পরিশেষে ভেবেচিন্তে বলাই স্থির করলাম—আরো খোলাখুলি, যদিও কিছু আভাষ দিয়েছি প্রথমেই।

কথাটা এই যে, প্রতিমাদেবীর পথ তাঁকে নিজেই কেটে চলতে হবে। সে-পথ বনবাসিনী বা মঠবাসিনীর না হ'লেও মূলত যোগিনীর পথ একথা অসংশয়ে বলা যেতে পারে। কাজেই (ফের দুই আর দুয়ে চারের লজিক) তাঁর পথ বৈষয়িকতার নয়। যমুনার অভ্যাগমের পরে তিনি একটু বেশি গা ভাসিয়ে চলেছিলেন সামাজিক লেনদেন হাসিখুশির পথে। সামাজিক লেনদেন হাসি-খুশি নিন্দনীয় এমন ইঙ্গিত করছি না। কিন্তু যাদের কানে বাজে তাঁর বাঁশির ডাক তাদের স্বধর্ম হ'তেই হবে "গ্রামছাড়া রাঙামাটির" পথে চলা। সুতরাং সে-পথে না চললে স্বধর্মলংঘনের প্রত্যবায়কে ঠেকানো যাবে না। যে-ছন্দে ফুল ফোটে, লতা দোলে, সে ছন্দে নির্ঝরিণী উধাও হয় না অচিন পথে, সমুদ্রে বাজে না রুদ্রের ডমরু।

একদিন আসবেই আসবে যেদিন মানুষের প্রবুদ্ধ চেতনার উল্টোপাল্টামি সুষমায়—হার্মনিতে গ'লে গিয়ে নিটোল আনন্দী হবে। কিন্তু সেদিনের আবাহনযজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না য'দি একদল শিবসাধক "জ্যোতিষাং জ্যোতি"-কে না ডাকেন হৃদয়তলে শুধু বীর্যবলে নয়—চোখের জলে। প্রতিমাদেবীকেও তাই এদিক ওদিক না চেয়ে তাঁর স্বধর্ম মেনে বিবেকের পথেই চলতে হবে। ভবিষ্যতে উনি গুরুবরণ করবেন কি না জানি না—গুরুদেব আমাকে দেখিয়ে দেন নি এখন পর্যন্ত—কিন্তু উনি যে নিবেদিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেয়েছেন ষোলো আনা স্বভাবেরি নির্দেশে এ-বিষয়ে আমার নিজের তিলার্ধও সংশয় নেই। কাজেই ফের বলি—পুনরুক্তি মার্জনীয়—এ সাধনার অন্তরায়দের পাশ কাটিয়ে না গেলে ওঁকে ভুগতে হবেই হবে, যার কিছুটা আভাষ আপনারা পাবেন সম্ভবত মাসখানেকের মধ্যেই। আর তখন আমার এ-অনুরোধ তথা অভিনন্দন স্মরণ করবেন : যে-পতাকা ঠাকুর ওঁর হাতে দিয়েছেন ওঁকে বইতেই হবে গীতার এই আশ্বাস-জয়ধ্বনিতে দোয়ার দিয়ে : "নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়োন ন বিদ্যতে।" রবীন্দ্রনাথ এই আত্মিক প্রত্যয়ের ঝঙ্কার রণিয়ে তুলেছেন তাঁর একটি অপরূপ গানে :

জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা, জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
যে-ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে, যে-নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

কেবল মনে রাখা চাই—প্রত্যবায় আসে মূলত দুটি ফাটল দিয়ে: একটি, ঐকান্তিকতার অভাব, অন্যটি—স্বধর্ম নির্দিষ্ট পথকে নিজের একমাত্র পথ ব'লে অঙ্গীকার করতে না-চাওয়া। কলির অভ্যুদয় হয় এই দুটি রন্ধ্র দিয়েই। স্বধর্মে অবস্থিত থেকে প্রেমকে আত্মার উপজীব্য ব'লে বরণ করলে ক্লৈব্য ঘুচবেই ঘুচবে, অভয়ার অভয় মিলবেই মিলবে। মৃত্যুসঙ্কুল জীবনে এ-অভয়ের নিশান ওড়ানোর মতন কীর্তি আর কী হ'তে পারে? ঠাকুরও ভাগবতের শেষে এই দীপ্ত আশ্বাসই দিয়েছেন:

আমাকে ভালোবেসে আমার পূর্ণশরণ নিলে হবেই হবে অকুতোভয়—"ময়া স্যা অকুতোভয়ঃ।" আপনাদের তাই, আবার জানাচ্ছি আমার উল্লসিত অভিনন্দন। ইতি।

আপনাদের স্নেহাধীন—মুক্তানন্দ

সমাপ্ত